মাঠ ফসল উৎপাদনের কৌশল

TECHNIQUES OF FIELD CROP PRODUCTION

BAE 2301

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্স ডেভেলপমেন্ট টিম

লেখক
ড. মোঃ সদরুল আমিন
হাজী মো: দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. এম.এ. খালেক মিয়া
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক
মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রচনাশৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়কারী
ড. মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক (দ্বিতীয় সংস্করণ)
ড. মোঃ সফিউল আলম
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এ কোর্স বইটি রেফারি কর্তৃক নিরীক্ষণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল এর ছাত্রদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে।

Mahbubul Alam

University of Rajshahi

মাঠ ফসল উৎপাদনের কৌশল
TECHNIQUES OF FIELD CROP PRODUCTION

BAE 2301

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মাঠ ফসল উৎপাদনের কৌশল
(MAATH FASAL UTPADANER KOUSHAL)
TECHNIQUES OF FIELD CROP PRODUCTION

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি ঃ **ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক**
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য ঃ **মোঃ তোফাজ্জল হোসেন**
কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর
ড. মোঃ মতিয়ার রহমান
কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর
ড. মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোঃ শাহ আলম সরকার
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আ ন ম আমিনুর রহমান
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোঃ মোর্শেদুর রহমান
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন মিয়া
ইপসা (IPSA)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডীন
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Maath Fasal Utpadaner Koushal (Techniques of Field Crop Production), a 3-Credit Course book for the Bachelor of Agricultural Education Programme, **Written by:** Dr. Md. Sadrul Amin, Dr. M.A. Khaleque miah & Dr. Nazrul Islam. **Edited by:** Dr. Md. Shafiul Alam (2nd edition), Md. Sorowar Hossain Chowdhury (1st edition), **Style Edited:** by Dr. Md. Tofazzal Islam, **Published by:** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1705. © School of Agriculture and Rural Development, Bangladesh Open University. **First edition:** June, 1997, **Second edition:** Semtember 2005; **Printing Time:** 2013, **Computer Compose & D.T.P:** Md. Al Amin (2nd editon), S. M. Mizanur Rahman & Md. Abdur Rahman (1st edition), **Cover Design:** Md. Monirul Islam. **Cover Photography:** Dr. A N M Aminoor Rahman. **Illustration & Inside Photography:** Provided by the authors. **Printed by:** Al-Kader Offset Printers, 57 Rishikash Das Road, Dhaka-1100.

ISBN 984-34-5010-8

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any means without prior permission of the copyright holder.

BAE 2301

সূচিপত্র

ইউনিট ১	**দানা ফসলের চাষ-১**	**১-৪৩**
পাঠ ১.১	দানা ফসলের পরিচিতি	১
পাঠ ১.২	ধানের পরিচিতি ও গুরুত্ব	৮
পাঠ ১.৩	ধান চাষের শ্রেণিবিভাগ	১২
পাঠ ১.৪	আধুনিক ও স্থানীয় ধান জাতের বৈশিষ্ট্য	১৬
পাঠ ১.৫	ধান গাছের বৃদ্ধি পর্যায়	২০
পাঠ ১.৬	ধানের জন্য জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, বীজ বপন ও চারা রোপন	২৪
পাঠ ১.৭	ধানের জমিতে আগাছা দমন, সার প্রয়োগ ও পানি সেচ ব্যবস্থাপনা	৩০

পাঠ ১.৮	ধানের পোকা দমন, রোগ দমন ও ফসল সংগ্রহ	৩৫
ব্যবহারিক		
পাঠ ১.৯	ধান গাছের বিভিন্ন অংশ ও বৃদ্ধি পর্যায় চিহ্নিতকরণ	৪০
পাঠ ১.১০	ধান চাষের বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন	৪১
ইউনিট ২	**দানা ফসলের চাষ-২**	**৪৪-৭০**
পাঠ ২.১	গমের পরিচিতি ও গুরুত্ব	৪৫
পাঠ ২.২	গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ও জমি প্রস্তুতকরণ	৪৯
পাঠ ২.৩	গমের চাষ পদ্ধতি	৫২
পাঠ ২.৪	ভুট্টার পরিচিতি ও গুরুত্ব	৫৭
পাঠ ২.৫	ভুট্টার চাষ পদ্ধতি	৬০
পাঠ ২.৬	কাউনের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি	৬৫
ব্যবহারিক		
পাঠ ২.৭	গম ক্ষেতে আগাছা দমন ও সার প্রয়োগ	৬৮
ইউনিট ৩	**ডাল চাষাবাদ**	**৭১-৯৮**
পাঠ ৩.১	ডাল ফসলের সাধারণ পরিচিতি ও শ্রেণিবিভাগ	৭১
পাঠ ৩.২	ডাল ফসলের পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব	৭৫
পাঠ ৩.৩	ডালজাতীয় ফসলের জন্য সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা	৭৮
পাঠ ৩.৪	মসুর ডালের চাষ পদ্ধতি	৮১
পাঠ ৩.৫	মুগ ডাল চাষ পদ্ধতি	৮৪
পাঠ ৩.৬	ছোলা চাষ পদ্ধতি	৮৭
পাঠ ৩.৭	মাসকালাই, খেসারি ও গোমটরের চাষ পদ্ধতি	৯১
ইউনিট ৪	**তৈল ফসলের চাষ-১**	**৯৯-১১৪**
পাঠ ৪.১	তৈল ফসলের পরিচিতি	৯৯
পাঠ ৪.২	সরিষার পরিচিতি ও গুরুত্ব	১০৩
পাঠ ৪.৩	সরিষার জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ বপন ও পরিচর্যা	১০৬
পাঠ ৪.৪	সয়াবীন চাষ পদ্ধতি	১১০
ইউনিট ৫	**তৈল ফসলের চাষ-২**	**১১৫-১৩১**
পাঠ ৫.১	তিল ও তিসির চাষ পদ্ধতি	১১৫
পাঠ ৫.২	চিনাবাদামের চাষ পদ্ধতি	১২০
পাঠ ৫.৩	সূর্যমুখীর চাষ পদ্ধতি	১২৪
ব্যবহারিক		
পাঠ ৫.৪	সরিষার জমি পরিদর্শন, গাছের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন পর্যবেক্ষণ	১২৭
পাঠ ৫.৫	তিলের জমি পরিদর্শন করে তিল গাছের সমস্ত অঙ্গ সম্পর্কে ধারণা লাভ	১২৯
ইউনিট ৬	**আঁশ ফসলের চাষ**	**১৩২-১৫৭**
পাঠ ৬.১	আঁশ ফসলের পরিচিতি	১৩২

পাঠ ৬.২	পাটের পরিচিতি ও গুরুত্ব	১৩৬
পাঠ ৬.৩	পাট চাষের জন্য জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ বপন ও উপরি সারের প্রয়োগ	১৪১
পাঠ ৬.৪	পাট কাটা ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি	১৪৫
পাঠ ৬.৫	তুলা চাষ পদ্ধতি	১৪৯
ব্যবহারিক		
পাঠ ৬.৬	পাটের জমি তৈরি ও পাট বীজ বপন	১৫৪
ইউনিট ৭	**চিনি ফসলের চাষ**	**১৫৮-১৮৪**
পাঠ ৭.১	চিনি ফসলের পরিচিতি	১৫৮
পাঠ ৭.২	আখের পরিচিতি ও গুরুত্ব	১৬১
পাঠ ৭.৩	আখ চাষের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, আখ রোপণের সময় নির্ধারণ	১৬৫
পাঠ ৭.৪	আখের জন্য সার প্রয়োগ ও অন্তর্বর্তী পরিচর্যা	১৬৮
পাঠ ৭.৫	আখ কর্তন ও মাড়াই	১৭৪
ব্যবহারিক		
পাঠ ৭.৬	আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ, জমিতে বীজ রোপণ	১৭৮
ইউনিট ৮	**ফসলের অনুক্রম ও ফসলাবর্তন**	**১৮৫-২১০**
পাঠ ৮.১	ফসল অনুক্রম	১৮৫
পাঠ ৮.২	একাধিক ফসল সম্বলিত অনুক্রম	১৯২
পাঠ ৮.৩	আন্তফসল ও সাথী ফসল, আন্ত ও সাথী ফসলের সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা	১৯৮
পাঠ ৮.৪	ফসলাবর্তন ও শস্যপর্যায়	২০৩
তথ্যসূত্র		**২১১**

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৬ পাটের জমি তৈরী ও পাট বীজ বপন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পাট চাষে জমি তৈরীর গুরুত্ব জানবেন
- পাটের জন্য জমি তৈরী করতে পারবেন
- পাটের বীজ শোধন করতে পারবেন
- পাটের বীজ বুনতে পারবেন, বিশেষকরে একটি ব্যবহারিক ক্লাশে সীড ড্রীল যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট বীজ বুনতে সচেষ্ট হবেন।

উত্তমরূপে জমি চাষ, সঠিক সময়ে বীজ বপন এবং যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে পাটের কাংখিত ফসল পাওয়া যায়। পাট একটি গভীরম লী ফসল বিধায় পাটের জমি গভীরভাবে চাষ করতে হয়। এর বীজ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অঙ্কুর ধান-গমের তূলনায় নরম (Tender) বলে জমি চাষ করে ভাল কর্ষিত অবস্থায় আনা প্রয়োজন। জমির উপরিভাগ চাষের পর সমতল অবস্থায় আনতে হবে, প্রয়োজনে পানি নিকাশের জন্য নালার ব্যবস্থা করতে হবে।

জর্মি নির্বাচন

এঁটেল বা বেলে মাটি ছাড়া আর যে কোন ধরনের মাটিতে সফলভাবে পাটচাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ মাটি পাটচাষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপযোগী। তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশী পাট উঁচু-নীচু দুধরনের জমিতেই চাষ করা চলে।

জমি তৈরী

পাটের জন্য পরিস্কার চাষ (Clean cultivation) দরকার। বোনার আগে জমির মাটি যেন ঝুর ঝুরে অবস্থায় আসে। রবিশস্য সংগ্রহের পর পাটের জমিতে চাষ দেবার জন্য চাষীকে অপেক্ষা করতে হয়। মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে 'জো' আসলে প্রথম লাঙ্গল চাষ দিতে হয়। পরবর্তী বৃষ্টিগুলোর পরেও

চাষ-মই দিয়ে জমি প্রস্তুতি অব্যাহত রাখা হয়। আগাছাগুলো পরিস্কার করা হয় অথবা জমির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বৃষ্টির পর অনেক আগাছা অঙ্কুরিত হয় এবং চাষে বিনষ্ট হয়। এভাবে ৫-৬ টি চাষ-মই দিয়ে মাটি মোটামুটি একটি কর্ষিত অবস্থায় এনে জমি বোনার আগে একটি মাঝারী বড়-বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

সার প্রয়োগ

গোবর বা জৈব সার দ্বিতীয় বা তৃতীয় চাষের সময় জমিতে দেওয়া হয় যাতে এ সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশে যায়। প্রয়োজনীয় অন্যান্য সার (ইউরিয়া ব্যাতীত) শেষ চাষের আগে মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে চাষ-মই দেওয়া হয়।

বীজ শোধন

এই ফসলে তিনটি বীজ বাহিত (Seed borne) রোগ হয়। কাল পট্টি (Block borne) কান্ড পঁচা (Slem rot), এবং এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)। বীজ শোধন করলে এই রোগগুলোর আক্রমন কমে এবং শোধিত বীজ থেকে উৎপন্ন চারা অন্যান্য সংক্রমনের হাত থেকেও রেহাই পেতে পারে। বীজ শোধনের জন্য নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতির যে কোনটি গ্রহন করা যেতে পারে-

ক) গরম পানি পদ্ধতি- পরিস্কার পানি একটি পাত্রে নিয়ে ৫০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় গরম করতে হবে। পরিমানমত বীজকে ৫-১০ মিনিট ঐ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এর পর বীজকে হালকা শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বপন করতে হবে।

খ) বীজে ছত্রাক নাশক প্রয়োগ- প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ক্যাপ্টান/ ৬ গ্রাম গ্রানোসান এম বা এগ্রোসান জি এন বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। রোটারী ড্রাম সীড ট্রিটারে বীজ ও গুড়া ঔষধ নিয়ে ঘূর্ণনের মাধ্যমে ভালভাবে মিশানো যায়। একটি কাচের বয়মের মাধ্যমেও এ কাজ সম্পন্ন করা যায়।

বীজহার

পাটের বীজের অঙ্কুরোদম ক্ষমতা ৯০-৯৫% হলে ভাল। পুরাতন বীজ (একবছরের অধিক হলে) অত্যন্ত নিম্নমানের হয় এবং এটি ব্যবহার করা নিষেধ। BJRI (১৯৯০) -এর সুপারিশ অনুযায়ী পাটের বীজহার নিম্নরূপঃ

পদ্ধতি	দেশী পাট	তোষা পাট
ক) সারি	৬-৭ কেজি / হেক্টর	৩.৫-৪.৫ কেজি / হেক্টর
খ) ছিটিয়ে	৮-১০ কেজি / হেক্টর	৬-৮ কেজি / হেক্টর

ছিটিয়ে বপন অপেক্ষা সারিতে বুনলে কম বীজ লাগে। অন্যাদিকে সারিতে বুনলে আঁশের ফলন ও গুণগতমাণ বৃদ্ধি পায়। আন্ত পরিচর্যা বিশেষ করে নিড়ানী ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ সহজতর হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি

দেশের সকল চাষীরা সাধারনতঃ পাটের বীজ ছিটিয়ে বপন করে। এক্ষেত্রে শেষ চাষ দেবার পর বীজ ছিটিয়ে বোনা হয় এবং মই দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। জমিতে যদি বড় বড় ঢেলা দেখা যায় তাহলে বোনার পর পরই মুগুর দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। সারিতে বপন করার সুবিধাজনক প্রযুক্তি হচ্ছে বপন যন্তের ব্যবহার করা (চিত্রঃ ৬.৬ ক)। এর সাহায্যে সারি থেকে সারির দুরত্ব এবং বীজ থেকে বীজের দুরত্ব সহজে বজায় রাখা যায়। দেশী পাটের ক্ষেত্রে সারি থেকে দুরুত্ব ২০-২৫ সেমি এবং তোষা পাটের জন্য ২৫-৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দুরত্ব উভয় পাটের ক্ষেত্রে ৫-৭ সেমি।

(সীড ড্রীল যন্ত্রের ব্যবহার পাট বোনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই যন্ত্রের পরিচিতি ও কার্যবিধি সরেজমিনে একটি ব্যবহারিক ক্লাশে দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সীড ড্রীল সম্পর্কে একটি তৈরী জমিতে পাট বীজ নিজ হাতে সারিতে বপন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ-৬

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন ঃ

১। পাটের জন্য জমি নির্বাচন ও জমি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। পাটের জমি কিভাবে চাষ করবেন ?
৩। পাটের বীজ কিভাবে শোধন করা যায় বর্ণনা করুন।
৪। পাটের বীজ ছিটিয়ে বোনা ও সারিতে বোনার সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।

আ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ঃ
সঠিক উত্তর নির্দ্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণ- আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুণ)।

১। পাটের জন্য কি ধরনের জমি চাষ দরকার ?
ক) Coarse tilth খ) Medium tilth
গ) Fine tilth ঘ) Very fine tilth

২। দেশী পাট চাষের জন্য কি ধরনের জমি দরকার ?
ক) নিচু জমি খ) মাঝারী নিচু জমি
গ) খুব নিচু জমি ঘ) উঁচু-নিচু দুধরনের জমি।

৩। পাটের জমিতে গোবর সার কখন দিতে হয় ?
ক) জমি চাষের আগে খ) বীজ বোনার সময়
গ) বীজ বোনার পরে ঘ) ১ম বা ২য় চাষের সময়।

৪। গরম পানি দিয়ে বীজ শোধনের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা কোন্‌টি ?
ক) ৪০ ক্ক সে. খ) ৮০ক্ক সে.
গ) ৫০ক্ক সে. ঘ) ১০০ক্ক সে.।

৫। পাট চাষে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব কত ?
ক) ১০-১২ সেমি. খ) ৩-১০ সেমি.
গ) ৫-৭ সেমি. ঘ) ৬-১২ সেমি.

সঠিক উত্তর ঃ আ. ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ

ব্যবহারিক

পাঠ ৭.৬ আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ, জমিতে বীজ রোপন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কিভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করা হয় তা জানতে পরবেন
- আখ চাষের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন, বিশেষ করে রোপা আখ চাষ সম্পর্কে জানবেন
- বীজ আখ সংগ্রহ ও আখ রোপন কিভাবে হাতে-কলমে করা যায় সে সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে আখের ফলন ও চিনি আহরনের শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। আলী এবং তার সহযোগীদের (১৯৮৯) মতে প্রচলিত পদ্ধতিতে যথাযথ অঙ্কুরোদগম না হবার ফলে জমিতে শতকরা ৩১ ভাগ স্থান ফাঁকা (Gap) থেকে যায়। এর ফলে মাড়াই যোগ্য (Millable) আখ কম উৎপাদন হয় এবং ফলন কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণ এ দেশে আখের ফলন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ সুপারিশ করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলো-

- আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ
- আখ চাষে রোপা পদ্ধতি অনুসরণ।

উন্নত পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ

ভাল অঙ্কুরোদ্গম, গাছের বৃদ্ধি ও উচ্চ ফলন নিশ্চিত করার জন্য সুস্থ, সবল ও রোগ-পোকা-মাকড় মুক্ত আখ বীজ ব্যবহার করতে হবে। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি উন্নত পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্টঃ

ক) বীজ আখের চাষ- আখের বীজ নির্বাচনের কাজ বীজ সংগ্রহের প্রায় এক বছর আগেই শুর€ হয়। যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বীজ চাষ করা হয়, যেখান থেকে পরবর্তীতে আখ বীজ সংগ্রহ করা হয়। এভাবে আবাদকৃত প্রত্যায়িত আখ বীজ ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করাই বিজ্ঞানসম্মত।

খ) প্রি ফার্টিলাইজড্ বীজ আখ - বীজ আখ কাটার ৪-৬ সপ্তাহ আগে বীজ আখের জমিতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫-৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। বীজ আখকে জোরালো ও সতেজ রাখাই এই বাড়তি সার প্রয়োগের কাজ। প্রি ফার্টলাইজড্ বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। চারার শিকড় দ্রুত গজায় এবং চারার বৃদ্ধি জোরালো হয়। সার দেবার আগে মাটিতে যেন রস থাকে সেটি নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনে সেচ দিয়ে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ) বীজ আখ নির্বাচন- বীজের জন্য আলাদাভাবে উৎপাদিত আখের জমি থেকে আখ বীজ সংগ্রহ করতে হবে। পোকামাকড় ও রোগাক্রান্ত গাছ থেকে যেন বীজ সংগ্রহ না করা হয়। বীজ আখ গাছের বয়স ৮-৯ মাস হলে ভাল হয়। গাছের যে অংশে শিকড় থাকে তা বীজের জন্য বাদ দিতে হবে। সম্ভব হলে নীচের ১/৩ অংশ বাদ দিয়ে আখ বীজ সংগ্রহ করলে খুব ভাল হয়। কারণ, নীচের ১/৩ অংশে চিনির ভাগ বেশী থাকে ও চোখগুলি শক্ত থাকে বলে ভাল গজায় না।

গ) বীচন তৈরী- ক্ষেত হতে আখ কাটার সময় সতর্কতা অবলম্বণ করা উচিত। যে ‘দা’ বা ‘হাসুয়া’ ব্যবহার করা হবে তাকে আগুনে ঝলসিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে। উত্তপ্ত দা/হাসুয়ার গায়ে ২/৩ ফোটা পানি দিলে যদি সাথে সাথে শব্দ করে শুকিয়ে যায় তাহলে অস্ত্র জীবানুমুক্ত হয়েছে মনে করতে হবে। এছাড়া ৫% ‘লাইসল’ দ্রবনে দা/হাসুয়া ডুবিয়ে নিয়েও জীবানুমুক্ত করা যায়।

আখ গাছ যদি বহন করে দুরের জমিতে নিতে হয় তাহলে শুকনো পাতা গাছের গায়ে লেগে থাকা অবস্থায় তা করতে হবে। এতে আখের চোখ কম নষ্ট হয়। এরপর আখকে একটি উঁচু খুটির উপর রেখে দা/হাসুয়ার সাহায্যে সাজোরে সামান্য কাত করে কাটতে হবে। কোন অবস্থাতেই কান্ড থেৎলে বা ফেটে না যায়। এই ছোট ছোট টুকরোই আখের বীচন যা এক/দুই বা তিন চোখ বিশিষ্ট হতে পারে। চোখ বলতে আখের গীট (Node) কে বুঝায়। এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের বেলায় চোখের উপরের দিকে ২.৫ সেমি ও নীচের দিকে ৫-৭.৫ সেমি. কান্ড রেখে কাটতে হয়। বীচন কাটার সময় নজর দিতে হবে যাতে আখের চোখ উপরে বা পাশে থাকে অর্থাৎ যেন আঘাত না পায়। এছাড়া, আখ গাছটি খন্ড করার সময় তা উপর থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের দিকে কাটতে হবে। এক, দুই ও তিন চোখ বিশিষ্ট কাটা আখের বীচনের ছবি নিম্নে দেখানো হলো (চিত্র ৭.৬ ক)ঃ

ঘ) বীজন শোধন- মাটি বাহিত রোগ জীবানু থেকে আখকে রক্ষা করার জন্য রোপনের আগে বীচনকে শোধন করা দরকার। বীচনগুলোকে ০.১% এরিটান দ্রবনে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিলেই চলে। এছাড়া, টেক্টো বা ব্যাভিষ্টিন নামক ছত্রাক নাশক দ্বারা বীচন শোধন করা যেতে পারে।

জমিতে বীজ রোপন

প্রচলিত পদ্ধতি এবং রোপা পদ্ধতি- এই দুই ভাবেই বাংলাদেশে বর্তমানে আখ চাষ করা হয়ে থাকে। উন্নত হওয়া সত্বেও রোপা পদ্ধতির বিস্তার আমাদের দেশে এখনো তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। নিম্নে এ সকল পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি (Flat method)

২। ভাওড় পদ্ধতি (Ridge method

৩। নালা পদ্ধতি (Trench method)

খ) রোপা পদ্ধতি ।

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি- বীজ আখ রোপন করার পরও জমি সমতল দেখায় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নাম-করণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা ৫-৬ সেমি নালা তৈরী করা হয়। তারপর নালায় বীজ আখ রোপন করে ৫-৬ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

২। ভাওড় পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে সমতলী পদ্ধতির চেয়ে কিছুটা গভীর নালা (প্রায় ১৫ সেমি) তৈরী করার পর নালায় বীজ আখ স্থাপন করে ৮-১০ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

৩। নালা পদ্ধতি- প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নালা পদ্ধতি উত্তম বলে বর্তমানে বাংলাদেশে নালা পদ্ধতিতে অধিকাংশ কৃষক চাষ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ৩০ সেমি গভীর নালা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে নালার উপরের দিকে প্রায় ৪০ সেমি এবং নীচের দিকে প্রায় ৩০ সেমি চওড়া থাকে।

তারপর নালার নীচের দিকে ৫-৭ সেমি.স্থান খুঁড়ে নরম করে বীজ আখ রোপন করা হয় এবং বীজ আখ ৫-৭ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। এক নালার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অন্যটির কেন্দ্রবিন্দু ৯০-১০০ সেমি দুরত্ব হয় (চিত্রঃ ৭.৬ খ)।

খ) রোপা পদ্ধতি

১৯৬৯ সনে বাংলাদেশে প্রথম রোপা পদ্ধতিতে আখ চাষ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীতে, ইক্ষু গবেষনা ইনষ্টিটিউট ১৯৭৬ সালে এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষনা শুরু করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে ১৯৭৯ সনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয় যে, নিম্মোক্ত দুটি কারণে বাংলাদেশে রোপা আখের চাষ প্রচলিত আখচাষের চেয়ে বেশী সম্ভবনাময়-

- প্রচলিত আখচাষ পদ্ধতিতে যেখানে একর প্রতি বীজের পরিমাণ ১.৮৭ টন, রোপা পদ্ধতিতে বীজ লাগে মাত্র ০.৪৫ টন।
- প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে রোপা পদ্ধতিতে আখ এবং চিনি উভয় ক্ষেত্রেই ফলন বেশী পাওয়া যায়।

এছাড়া, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ এম শাহজাহান ১৯৮১ সালে উলে-খ করেন যে, চিনিকল এলাকার ১.৯০ লক্ষ একর জমিতে রোপা আখ চাষ করা হলে ১২.২৫ কোটি টাকা ম ল্যের বীজ আখের আশ্রয় হবে। এই পরিমাণ আখ মিলে সরবরাহ করলে ২৪২০৭ টন অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হবে (Alli ***et al***., ১৯৮৯)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আখ চাষের ক্ষেত্রে রোপা পদ্ধতি বা Spaced Transplanting (STP) একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। নিে এ পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

রোপা আখ চাষকে চারা উৎপাদন পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত দুভাগে ভাগ করা যায়-

১. সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি

২. পলিব্যাগ পদ্ধতি

সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজন মোতাবেক ৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট যে কোন দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরী করা যায়। তবে আন্ পরিচর্যা ও চলাফেরার সুবিধার্থে ৪ ী ২৪ ফুট বীজতলা তৈরী করা ভাল। বীজতলার মাটি ভালভাবে চাষ করে ও কুপিয়ে ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। বীজতলার মাটিতে ২ মন পঁচা গোবর/ কম্পোষ্ট, ইউরিয়া ৮ ছটাক, টিএসপি ৮ ছটাক এবং এমপি ৪ ছটাক প্রয়োগ করে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর দুই চোখ বিশিষ্ট বীজখন্ডের চোখ পাশে রেখে মাটির সমান্ রালে পাশাপাশি স্থাপন করে বীজ খন্ডগুলোকে প্রায় ১ সেমি মাটির স্ র দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ খন্ডগুলো সামান্য দেখা যায়। বীজতলাটি খড় অথবা আখের শুকনা পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষার্থে মাঝে মধ্যে সেচ দিতে হবে। এভাবে উৎপন্ন চারা ৪ পাতা বিশিষ্ট হলেই তুলে নিয়ে মূল জমিতে ৬-৯ ইঞ্চি গভীর নালায় রোপন করে ১-১.৫ ইঞ্চি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে (চিত্রঃ ৭.৬ গ)।

পলিব্যাগ পদ্ধতি

পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা না থাকলে পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতিতে চারা তৈরী করে রোপা আখ চাষ করা উত্তম। এক্ষেত্রে প্রথমে ৫ ী ৪ ইঞ্চি মাপের পলিথিন ব্যাগ নিয়ে ব্যাগের ৩/৪ অংশ ৫০ ভাগ বেলে দোঁআশ মাটি এবং ৫০ ভাগ গোবর বা কম্পোষ্ট এর মিশ্রন দিয়ে পুরণ করতে হবে। এরপর এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের চোখ উপরের দিকে রেখে খাড়া করে ব্যাগের মাটির মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বীজ খন্ডের অগ্রভাগ ব্যাগের উপর থেকে আধ ইঞ্চি নীচে থাকে। ব্যাগটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে মাটি একটু চেপে দিতে হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজ খন্ডের অগ্রভাগ মাটির বাইরে বেরিয়ে না থাকে। ব্যাগের নীচের দিকে ১/২ টি ছিদ্র করে দিতে হবে যেন বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি ব্যাগে জমে না থাকে। ব্যাগসমূহ আঙ্গিনার বা সুবিধাযুক্ত অন্য কোথাও সারিবদ্ধভাবে রেখে কিছু খড় বা আখের শুকনা পাতা দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। উৎপন্ন চারাগুলো চার পাতা বিশিষ্ট হলে এগুলো রোপন উপযোগী হয়। রোপন করার পূর্বেই অর্ধেক অংশ অবশ্যই ছেটে দিতে হবে। রোপন করার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে পলিব্যাগগুলো পানি ভর্তি বালতিতে চুবিয়ে নিতে হবে। বে-ডের সাহায্যে পলিব্যাগগুলো কেটে মাটিসহ চারা ব্যাগ থেকে আলাদা করে জমিতে গর্ত করে রোপন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

অ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্নঃ

১। আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করবেন ?
২। নালা পদ্ধতি ও রোপা আখ চাষ পদ্ধতির মধ্যে তূলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা কি কি ?
৩। সাধারণ বীজতলা পদ্ধতিতে কিভাবে রোপনের জন্য চারা তৈরী করবেন ?
৪। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে আখের চারা তৈরীর বর্ণনা দিন।

আ. বহু নির্বাচনীমূলক প্রশ্ন ঃ
সঠিক উত্তর নির্দ্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণ- আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুণ)।

১। আখের উচ্চ ফলনের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ বিষয়টি অগ্রগণ্য ?
ক) আখ গাছের উচ্চতা খ) উৎপন্ন আখের কান্ডের ব্যাস
গ) আখ কাটার সময় ঘ) হেক্টর প্রতি মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা।

২। বীজের গুণগত মানের জন্য আখগাছের কোন্ অংশটি বেশী গ্রহনযোগ্য ?
ক) নীচের ১/৩ অংশ খ) উপরের ১/৩ অংশ
গ) মাঝের ১/৩ অংশ ঘ) সমগ্র গাছটি।

৩। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে কোন্ ধরনের বীজখন্ড ব্যবহার করা হয় ?
ক) এক চোখ বিশিষ্ট আখ খন্ড খ) দুই চোখ বিশিষ্ট আখ খন্ড
গ) তিন চোখ বিশিষ্ট আখ খন্ড ঘ) গোটা আখ গাছ খন্ড।

৪। কোন্ পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী আখচাষ হয় ?
ক) পলিব্যাগ পদ্ধতি খ) ভাওড় পদ্ধতি।
গ) নালা পদ্ধতি ঘ) সমতলী পদ্ধতি

৫। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে উৎপন্ন চারা কখন রোপন উপযোগী হয় ?
ক) চারা ৬ ইঞ্চি উঁচু হলে খ) চারা চার পাতা বিশিষ্ট হলে
গ) চারা ১২ ইঞ্চি উঁচু হলে ঘ) চারা দুই পাতা বিশিষ্ট হলে।

সঠিক উত্তরঃ আ. ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ

ইউনিট ১ দানা ফসলের পরিচিতি

ইউনিট ১ দানা ফসলের পরিচিতি

যে সমস্ত ফসল চাষ করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য দানা শস্য পাওয়া যায় সেগুলোকে দানা ফসল বলে। ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দানা শস্য (Cereal grains)। অধিকাংশ দানা শস্য মাঠ ফসলের (Field crops) অন্তর্ভুক্ত। মাঠ ফসলের অন্যান্য প্রকারের মধ্যে রয়েছে আঁশ ফসল (পাট, তুলা), চিনি ফসল (আখ, সুগার বিট), ডাল ফসল (মুগ, মসুর), তেল ফসল (সরিষা, সয়াবীন) ইত্যাদি।

দানা ফসলের মধ্যে বাংলাদেশে ধান অন্যতম ফসল। বাংলাদেশের মাঠ ফসলের মধ্যে প্রায় ৮০% জমিতে ধানের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দানা ফসল হিসেবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে গম ও ভুট্টা। চতুর্থ স্থানে রয়েছে মিলেট (Millet) বা চিনা ও কাউন। আমাদের দেশে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই ইউনিটে তাই বিভিন্ন দানা ফসলের পরিচিতিসহ বিস্তারিতভাবে ধানের চাষ বর্ণনা করা হলো। এই ইউনিট পাঠ শেষে আপনি দানা ফসলের পরিচিতি, চাষের বিস্তারিত বিষয়াবলী, ধান চাষের উন্নত প্রযুক্তিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১.১ দানা ফসলের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- দানা ফসলসম হের পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবেন।
- দানা ফসলের প্রধান প্রধান জাতের নাম বলতে পারবেন।

যে সমস্ত ফসলের দানা (Grains) মানুষের ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে দানা ফসল (Cereal) বলে।

যে সমস্ত ফসলের দানা (Grains) মানুষের ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে দানা ফসল (Cereal) বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ দানা ফসল গ্রামিনী (Gramineae) বা পোয়েসি (Poaceae) পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। মাঠে ব্যপকাকারে চাষযোগ্য ফসলের মধ্যে দানা ফসলের গুরুত্ব খুবই বেশি। বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমির (Total cropped area) মাঠ ফসলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই দানা শস্য (Cereal) ফসলের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশে দানা শস্য ফসলের মধ্যে রয়েছে:

১। ধান (Rice)
২। গম (Wheat)
৩। ভুট্টা (Maize)
৪। চিনা (Proso millet)
৫। কাউন (Foxtail millet)
৬। যব (Oat)
৭। জোয়ার বা সরগম (Sorghum)
৮। বার্লি (Barley)
৯। রাই (Rye)।

বাংলাদেশে দানা ফসলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন (১৯৯২-৯৩)

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	উৎপাদন (হাজার টন)
ধান		
গম	৬৩০	১১৭৬
বার্লি বা যব	১২	৮
ভুট্টা	৩	৩
চিনা	১৮	১৫
জোয়ার বা সরগম	০.৪০	০.৪০
বাজরা	০.৪০	০.৪০
অন্যান্য	৬৪	৪৬

ধান সারা বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান দানা শস্য।

ধান

ধান সারা বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান দানা শস্য। নিচু থেকে উঁচু সকল জমিতে জন্মে। অসংখ্য জাত রয়েছে। গাছের উচ্চতা ৪০ সে.মি. থেকে ৪০০ সে.মি.। কান্ড নরম। পাতা ফলক ও খোলে বিভক্ত। শিকড় গুচ্ছমূল। এশিয়ার ধানের অন্তত ১৮টি বন্য জাত রয়েছে। গাছে পত্রখোলের গোড়ায় অরিকল (auricle) রয়েছে।

ধানের ক্রোমোসম সংখ্যা $2n = ২৪$। ফল কেরিওপসিস (Caryopsis)। ধান থেকে চাউল হয়। চাউল প্রধানত শ্বেতসার (Starch) দ্বারা গঠিত। ধানে সাধারণত ১৭টি অ্যামাইনো এসিড রয়েছে।

চিত্র-১

গম

গমের অন্তত ৪টি প্রজাতি রয়েছে। যথা- *Triticum aestivum, T.durum, T.dicoccum* এবং *T.Sphaerococcum*। শীতপ্রধান দেশের বা শীত মৌসুমের ফসল *T.aestivum* প্রজাতির গম থেকে রুটি তৈরি করা যায়।

গম গাছের কান্ড ধানের চেয়ে একটু শক্ত। গম বিশ্বের প্রধান দানা ফসল, তবে বাংলাদেশে এর স্থান তৃতীয়। বাংলাদেশে *T.aestivum* প্রজাতির বিভিন্ন জাতের চাষাবাদ হয়ে থাকে।

চিত্র - ২

> **দানা ফসলের মধ্যে ভুট্টার ফলন সবচেয়ে বেশি।**

ভুট্টা

ভুট্টা মূলত আমেরিকার ফসল। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের মাধ্যমে ভারতে আসে। দানা ফসলের মধ্যে ভুট্টার ফলন সবচেয়ে বেশি। ভুট্টার দানা, পাতা ও নরম কান্ড সবই পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার দানা ও তৈল মানুষের খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র - ৩

গম ও বার্লি গাছের মধ্যে পার্থক্য

গম	বার্লি
গাছ গাঢ় সবুজ, দৃঢ় কুশির সংখ্যা ৩-৫টি অনুমঞ্জরী ১টি শুং খাটো	গাছ হালকা সবুজ, একটু নরম কুশির সংখ্যা ১৫-৩০টি অনুমঞ্জরী ৩টি শুং লম্বা

চিত্র-৪

বার্লি (Barley)

বার্লির বৈজ্ঞানিক নাম *Hordeum vulgare*। বার্লি গুরুত্বপূর্ণ দানা ফসল। তবে বাংলাদেশে এর চাষাবাদ কম। বার্লির দানা থেকে ছাতু হয়। বার্লির অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে H.*disticum* এবং *H.irregulare*.

চিত্র - ৫

থই বা ওট (Oat)

ওটের বৈজ্ঞানিক নাম (*Avena sativa*)। বাংলাদেশে রবি মৌসুমে প্রধানত পশুখাদ্য হিসেবে চাষাবাদ হয়।

সরগাম বা জোয়ার (Sorghum)

সরগামের বৈজ্ঞানিক নাম *Sorghum vulgare*। সরগামের অপর নাম জোয়ার (*Jower*)। শুষ্ক এলাকার জন্য মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে সরগাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। শীষ অনুসারে গঠন অনুসারে সরগাম আটসাট শীষ ও ঢিলা শীষসম্পন্ন হতে পারে।

সরগামের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে - *S.cernum* ও *S. dochna*. বাংলাদেশে চাষকৃত *S.vulgare* কে *S.bicolor* ও বলা হয়।

সরগামের ক্রোমোসম সংখ্যা 2n=১০। গভীরমন্ডলী ও বিস্তৃত শিকড়সম্পন্ন গাছ। ফল - কেরিওপসিস, বীজের বর্ণ সাদা, কালো বা লালচে হতে পারে।

চিনা (*Panicum miliaceum*)

চিনার ইংরেজী নাম Proso millet। চিনার অন্যান্য জাতের মধ্যে *P.maximum* গর€ ঘাস উৎপাদনের ব্যবহৃত হয়। এই ঘাস প্রচলিতভাবে গিনি ঘাস (Guinea grass) নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে চিনার চাষ হয়ে আসছে। পাবনা, টাংগাইল, জামালপুর ও ফরিদপুরে চিনার চাষ বেশি হয়। চিনার ক্রোমোসম সংখ্যা 2n = ১৮, ৩৬.

গাছের উচ্চতা ৩০-১০০ সে.মি, ফল - কেরিওপসিস।

বীজের বর্ণ হাল্কা বাদামী, মসৃণ।

বাজরা (Bearl millet) ঃ বৈজ্ঞানিক নাম (*Pennisetum typhoides*)

দানা ফসলের পুষ্টিমান:

ফসলের নাম	শর্করা (%)	আমিষ (%)	¯েœহ (%)	মোট তাপ শক্তি ক্যালরী
ধান	৭৭	৮	৩.৫	৪৩৩
গম	৭২	১২	১.৭	৩৬৪
ভুট্টা	৭৮	৯	৪.৫	৩৯৭
বার্লি	৬৭	১১	২.৫	৩৫২
সরগাম	৭৩	১১	৩.২	৩৬০
চিনা	৬৮	১৩	১.১	৩৬৩
কাউন	৭১	১০	৩.৫	৩৮৭
বাজরা	৬৬	১০	৪.০	৩৫৫

কাউন বা ইটালিয়ান মিলেট (Foxtail millet)

বৈজ্ঞানিক নাম *Setaria italica*। ৯০ থেকে ১১০ দিনের ফসল। নিরক্ষীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল।

ক্রোমোসম সংখ্যা 2n = ১৪.

অন্যান্য প্রজাতির নাম S.sphacelate যা মূলত .... ও ...... জন্য চাষ করা হয়।

ফল কেরিওপসিস। শীষ শিয়ালের লেজের মত। শীষ ও বীজের রং হলুদে, কমলা, লাল, বাদামী ও কালো হতে পারে।

কমন মিলেট (Common millet)

বৈজ্ঞানিক নাম *Panicum miliacum*। খরা প্রতিরোধী স্বল্পমেয়াদি ফসল।

ক্ষুদে মিলেট (Little millet)

বৈজ্ঞানিক নাম *Panicum miliare* । খরা প্রতিরোধী ফসল। অপরদিকে জলাবদ্ধতাও সহ্য করতে পারে। ফসলের মেয়াদ ৮০-৮৫ দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশে মাঠ ফসলের মধ্যে কোনটির পরিমাণ বেশি?

(ক) চিনা (খ) বার্লি

(গ) ভুট্টা (ঘ) সরগাম

২. ধানের ক্রোমোসম সংখ্যা কত?

(ক) 2n=১৪ (খ) 2n=২৪

(গ) 2n=৩৪ (ঘ) 2n = ৪৪

৩. কোন গাছে কুশির সংখ্যা বেশি?

(ক) সরগাম (খ) চিনা

(গ) গম (ঘ) বার্লি

৪. গমের প্রধান প্রজাতি কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৫. রুটি তৈরির গমের প্রজাতির নাম কী?

(ক) *T.durum* (খ) *T.aestivum*

(গ) *T.dicoccum* (ঘ) *T.sphaerococcum*

৬. দানা ফসলের মধ্যে কোনটিতে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বেশি?

(ক) ধান (খ) গম

(গ) ভুট্টা (ঘ) কাউন

পাঠ ১.২ ধানের পরিচিতি ও গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধানের বিভিন্ন উপপ্রজাতির পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ধানের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারাবেন।

এই উপমহাদেশের ধানের পরিচিতি আলোচনা করতে প্রথমেই ধানের উপপ্রজাতিসমূহ জানা দরকার। এশিয়ায় ধানের ৩টি উপপ্রজাতি রয়েছে, এগুলো হলো ঃ

ক) ইন্ডিকা টাইপ (Indica)
খ) জাপনিকা টাইপ (Japonica)
গ) জাভানিকা টাইপ (Javanica)

এইসব উপপ্রজাতির প্রধান প্রধান পার্থক্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

এশিয়ার ধানের বিভিন্ন উপপ্রজাতির তুলনা:

বৈশিষ্ট্য	উপপ্রজাতির নাম		
	ইন্ডিকা	জাপনিকা	জাভানিকা
আলোর স্পর্শকাতরতা (Photo sensitivity)	স্পর্শ কাতর	স্পর্শ কাতর নয়	স্পর্শ কাতর নয়
প্রতিকূলতা সহ্য ক্ষমতা	বেশি	মধ্যম	কম
দৈহিক বৃদ্ধিকাল	দীর্ঘ	মধ্যম	খুবই দীর্ঘ
গাছের কাঠামো	নরম	শক্ত	শক্ত
গাছের উচ্চতা	লম্বা	খাটো	লম্বা
কুশির সংখ্যা	বেশি	মধ্যম	কম
শীষ পাতা	সরু	মধ্যম	চওড়া
ফলনশীলতা	মধ্যম	বেশি	কম

ধানের প্রায় ২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে কেবল ২টি ধানের চাষাবাদ হয়। এগুলো হলোঃ

* *Oryza sativa*
* *Oryza glaberrima*

ধানের মূল উৎপত্তি স্থল ভারত অথবা চীন। ধানের বৈজ্ঞানিক জেনাস (Genus) বা গণের নাম অরাইজা (Oryza)। এই ধানের প্রায় ২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে কেবল ২টি ধানের চাষাবাদ হয়। এগুলো হলোঃ

* *Oryza sativa*
* *Oryza glaberrima*

অন্যান্য প্রজাতি গুলো এখনো বন্য অবস্থায় রয়েছে।

oryza sativa এর ৩টি রেস (Race) বা উপ-প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ইন্ডিকা ও জাপনিকা রয়েছে।

চিত্র - ১১,১২

বাংলাদেশে বহু জাতের ধান রয়েছে। এসব জাতের মধ্যে উপপ্রজাতিগত পার্থক্য যথা- ইন্ডিকা, জাপনিকা ও জাভনিকা জাতের মধ্যে ধান গাছের পার্থক্য রয়েছে। গাছ ব্যতিত ইন্ডিকা জাতের মধ্যে ও দানার আকার আকৃতিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্যের ভিত্তিতে ধানকে শনাক্তও করা যায়। যেমন -

১। ধানের দানার আকার অনুসারে-

মোটা দানার ধান - দেশীয় আউশ (ধারিয়াল) ও বোরো ধান (টেপি)

মধ্যম আকারের ধান - আমন ধানের অধিকাংশ জাত (লতিশাইল)

সরু আকারের ধান - আমন ধানের জাত - পোলাও চাল, কালিজিরা, আক্কর কড়া, কাটারী ভোগ।

২। দানার বর্ণ অনুসারে -

সোনালী - অধিকাংশ জাত

লালচে - কটক তারা, মরিচবাটি

কালচে - কালা মোটা, কালিজিরা

ধূসর - ধরিয়াল

চিত্র - ১৪

৩। দানার শুং (ধহি) এর উপস্থিতি অনুসারে
শুং বিহিন - আধিকাংশ জাত
শুং সহ - গাজী, অনেক স্থানীয় জাত।

ধান চাষের গুরুত্ব

সারা বিশ্বের ধান উৎপাদনকারী দেশগুলো হচ্ছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড। উত্তর কোরিয়া ও জাপানে ধানের একরপ্রতি ফলন সবচেয়ে বেশি। অপর দিকে ফলন সবচেয়ে কম ভারত ও বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই এদেশে ধান চাষের গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। নিচে কয়েকটি প্রধান গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

১। বাংলাদেশে সকল এলাকায়ই ধান চাষ করা যায়।

২। বাংলাদেশে অনেক উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত রয়েছে।

৩। বাংলাদেশের প্রায় ৫০% জমিতে ধানের মতো এত অনায়াসে অন্য কোন ফসল চাষ করা যায় না।

৪। দেশে খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণে ধানের চাষ না বাড়ালে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে চাল আমদানি করতে হয়।

৫। ধান চাষ সম্পর্কে এদেশের সাধারণ কৃষকের ধারণা রয়েছে।

৬। বর্তমানে মোট ফসলী জমির প্রায় ৭০% জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে ধান চাষ হয়।

বর্তমানে মোট ফসলী জমির প্রায় ৭০% জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে ধান চাষ হয়।

৭। ধানে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণ অন্যান্য দানা ফসলের চেয়ে বিশেষ করে গমের চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশে ধান চাষ বিষয়ক তথ্য:

ধান	ধানের জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	ধান উৎপাদন (হাজার টন)

আউশ	১৭১৫	১০৭৫
আমন	৫৭৭৭	৯৬৮০
বোরো	২৬০৫	৬৮০৪
মোট	১০০৯৭ (মোট ফসলী জমির ৭০%)	১৭৫৫৯

খাদ্য হিসেবে চাউলের তুলনামূলক পুষ্টিমান

অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণ (গ্রাম/১০০ আমিষ)

অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিডের নাম	দ্রব্য		
	চাউল	গম	গরুর দুধ
আইসোলিউসিন	৫.১	৪.২	৬.৪
লিউসিন	৯.০	৬.৯	৯.৯
লাইসিন	৩.২	১.৬	৭.৮
ফিনাইল এলানিন	৬.৩	৪.৯	৪.৯
মিথিওনিন	৩.৪	১.৭	২.৪
থায়ামিন	৩.০	২.৪	৪.৫
ট্রিপ্টোফেন	১.৩	১.০	১.৪
ভেলিন	৫.৪	৪.৩	৬.৯

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কতকগুলো দেশীয় জাতের ধানে এসব অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণ আরও বেশি।

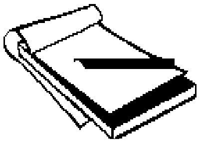

অনুশীলন (Activity): *এশিয়ায় ধানের কয়টি উপযজাতি রয়েছে? এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ইন্ডিকা জাতে কুশির সংখ্যা-

(ক) বেশি (খ) মধ্যম

(গ) কম (ঘ) নাই

২. মরিচবাটি ধানের বর্ণ কী?

(ক) সোনালী (খ) লালচে

(গ) কালো (ঘ) ধ সর

৩. ধানের একর প্রতি ফলন কোন দেশে বেশি?

(ক) চীন (খ) জাপান

(গ) বাংলাদেশ (ঘ) ভারত

৪. বাংলাদেশের কোন ধানের জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?

(ক) আউশ (খ) রোপা আমন

(গ) বোরো (ঘ) বোনা আমন

৫. চাউলে মেথিওনিনের পরিমাণ কত (গ্রাম /১০০ গ্রাম আমিষ)?

(ক) ১.৪ (খ) ২.৪

(গ) ৩.৪ (ঘ) ৪.৪

৬. কোন ধানে শুং আছে?

(ক) কালিজিরা (খ) দুলাভোগ

(গ) গাজী (ঘ) লতিশাইল

পাঠ ১.৩ ধান চাষের শ্রেণিবিভাগ

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধানের চাষ পদ্ধতিগত শ্রেণিগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- ধান শ্রেণিকরণের কৃষিতাত্ত্বিক তাৎপর্য ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ধান ও ধান চাষের বিষয়াবলীতে কৃষিতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিকরণ করা যায়, যেমন-

(ক) চাষাবাদের ঋতু (Season of cultivation) অনুসারে;
(খ) চাষাবাদ কৌশল (Cultivation technique) অনুসারে;
(গ) আলোর প্রয়োজনীয়তা (Photo sensetivity) অনুসারে।

চাষাবাদে ঋতু বা মৌসুম অনুসারে শ্রেণিকরণ

চাষাবাদের মৌসুম অনুসারে ধান চাষকে প্রধান ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা -

(ক) বোরো (Boro) বা শীতকালীন ধান চাষ,
(খ) আউশ (IUs) বা গ্রীষ্মকালীন ধান চাষ,
(গ) আমন (Aman) বা বর্ষাকালীন ধান চাষ।

বোরো বা শীতকালীন ধান

নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে জন্মানো ধানকে বোরো ধান বলে।

নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে জন্মানো ধানকে বোরো ধান বলে। বীজতলায় চারা উৎপাদন করে তারপর মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হয়। বোরো ধান চাষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই মৌসুমে ধান চাষ করতে হলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। ধান সাধারণত একটু মোটা। বোরো ধান চাষে ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি। বোরো ধান ২ প্রকার, যথা -

(ক) দেশী বোরো ধান,
(খ) উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান।

দেশী বোরো ধান একটু আগাম অর্থাৎ এপ্রিল মাসে কাটা যায়। আবার উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান একটু বিলম্বে অর্থাৎ মে মাসে কাটতে হয়।

চিত্র - ১৫

আউশ ধান চাষ

আউশ ধান স্বল্প মেয়াদি এবং আলো নিরপেক্ষ। সাধারণত ৯০-১০০ দিনের মধ্যে পরিপক্ক হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে বীজ বুনলে ফলন কিছুটা বাড়ে। আউশ মৌসুমে চাষের জন্য দেশী ও উচ্চ ফলনশীল উভয় জাতের ধানই রয়েছে। ধানের ফলন কিছুটা কম। ধানের আকার মাঝারী থেকে মোটা।

চিত্র - ১৬

আমন ধান চাষ

মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে চাষ করা ধানকে আমন ধান

মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে চাষ করা ধানকে আমন ধান বলে। আমন ধান স্বল্প মেয়াদি থেকে দীর্ঘ মেয়াদি (১২০-১৬০ দিন) হতে পারে। এই ধান আলোর প্রতি স্পর্শকাতর।

যখনই রোপণ করা হউক না কেন দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘন্টার চেয়ে কমতে শুরু করলে থোড় আসবে। ধানের গাছের উচ্চতা মধ্যম থেকে লম্বা, ফলন মধ্যম। আমন মৌসুমে দেশী ও উচ্চ ফলনশীল উভয় প্রকার ধানই চাষ করা যায়। আমন ধানের জাতসম হের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাইল কথা যুক্ত থাকে। তবে পশুশাইল আমন ধান বা শাইল ধান নয়। আমন ধানের চাল চিকন, সুস্বাদু ও জনপ্রিয়।

চিত্র - ১৭

চাষাবাদ কৌশল (Production technology) অনুসারে ধান চাষের শ্রেণিবিভাগ

চাষাবাদ কৌশলের ভিত্তিতে ধানের চাষাবাদকে ছকের আকারে নিম্নরূপে উলে-খ করা যায় ঃ

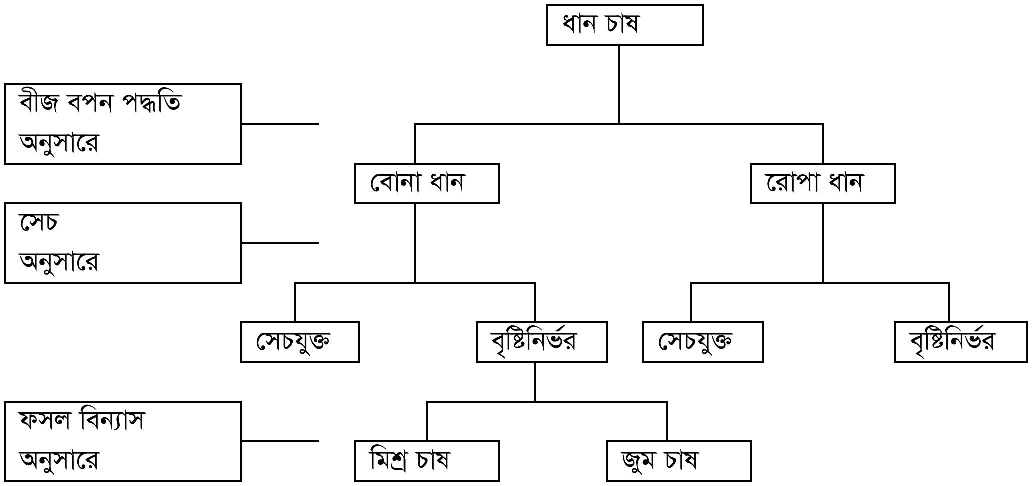

বোনা ধান (Broadcast rice)

জমি প্রস্তুত করার পর তাতে সরাসরি বীজ বুনে চাষ করা ধানকে বোনা ধান বলে। বোনা ধান নিুরূপ হতে পারে, যথা-

(ক) বোনা আউশ
(খ) বোনা আমন

বোনা আউশ (Broadcast IUs)

বোনা আউশ ধান ছিটিয়ে এবং সারিতে উভয় পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। বোনা আউশ ধান সাধারণত বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে চাষ করা হয়। তবে সুযোগ থাকলে আংশিক সেচ দেওয়া যায়। দেশী ধান সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয় এবং উফশী বোনা আউশ ধান সারিতে বোনা হয়। কোন কোন সময় আউশ ধান ডিবলিং (Dibbling) করা হয়। মাটি চিকন খুটি দিয়ে গর্ত করে তাতে বীজ বপনকে ডিবলিং বলে।

বোনা আমন ধান মার্চ-এপ্রিল মাসে জমিতে সরাসরি বপন করা হয়। বর্ষার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছও লম্বা হয় গভীর পানিতে ডুবে থাকা জমিতে বোনা আমন ধান চাষ করা হয় বলে একে গভীর পানির ধান (Deep water rice) বলা হয়।

বোনা আমন (Broadcast Aman)

বোনা আমন ধান মার্চ-এপ্রিল মাসে জমিতে সরাসরি বপন করা হয়। বর্ষার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছও লম্বা হয় গভীর পানিতে ডুবে থাকা জমিতে বোনা আমন ধান চাষ করা হয় বলে একে গভীর পানির ধান (Deep water rice) বলা হয়। গাছ বড় হওয়ার পর পানিতে ভেসে থাকে বলে বোনা আমন ধানকে বা অনেক জাতকে ভাসমান ধান (Floating rice) বলে। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও পাবনা জেলার হাওড়-বাওড় এলাকায় এই ধান বেশি হয়।

বোনা ধান অন্যান্য ফসলের সাথে বা একাধিক ধানের জাত মিশ্রভাবে চাষ করা হয়। এগুলো নিুরূপ:

(ক) বোনা আউশ + বোনা আমন মিশ্র চাষ
(খ) বোনা আউশ + ভুট্টা মিশ্র চাষ
(গ) বোনা আউশ + জুম মিশ্র চাষ
(ঘ) বোনা আমন + খেসারী মিশ্র চাষ
(ঙ) বোনা আউশ + তিল/ডাটা মিশ্র চাষ

রোপা ধান চাষ

আউশ, আমন ও বোরো ৩ ধরনের ধানেই রোপা চাষ করা যায়। এই পদ্ধতিতে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে তারপর মূল জমিতে চারা রোপণ করা হয়।

আউশ, আমন ও বোরো ৩ ধরনের ধানেই রোপা চাষ করা যায়। এই পদ্ধতিতে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে তারপর মূল জমিতে চারা রোপণ করা হয়। দেশীয় ধান ও উফশী ধান উভয়েরই রোপা চাষ করা যায়। সেচের সুবিধা থাকলে বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে আউশের রোপা চাষ করা হয়। প্রধানত উফশী আউশ ধানের রোপা চাষ করা হয়। রোপা আমন ধানের বৃষ্টি নির্ভর দেশীয় জাত এবং সেচ দ্বারা উফশী ধানের চাষ করা হয়।

রোপা আউশ

মার্চ- এপ্রিল মাসে রোপা আউশের চারা কাদাময় জমিতে রোপণ করা হয়। বোনা আউশের চেয়ে রোপা আউশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে -

(ক) খরার ক্ষতিকর প্রভাব কম
(খ) উফশী জাত অধিক চাষ করা হয়
(গ) ধানের জীবনকাল ১৫-২৫ দিন বেড়ে যায়
(ঘ) ধানের ফলন বেশি হয়
(ঙ) জমি প্রস্তুত করার সময় বা পরবর্তী সময়ে সেচের প্রয়োজন হয়।

নিচু জমিতে দেশীয় জলীয় আউশ ধানের চারাও রোপণ করা যায়।

রোপা আমন ধানের চাষ

রোপা আমন ধানই বাংলাদেশের প্রধান ধান ফসল।

রোপা আমন ধানই বাংলাদেশের প্রধান ধান ফসল। জুন-জুলাই মাসে চারা উৎপাদন করে তা মূল জমিতে রোপণ করা হয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়। দেশীয় জাতের রোপা আমন ধানে সাধারণত সেচ দেওয়া হয় না তবে উফশী ধানে সেচ দিতে হয়। দেশীয় রোপা আমন ধানের চাষে অনেক স্থানে মসুর ডাল ও মটরের মিশ্র চাষ হয়। বোনা আমন ধানের চেয়ে রোপা আমন ধানের ফলন বেশি হয়, গাছ খাটো থাকে। বাংলাদেশে বন্যায় প্রতি বছর রোপা আমন ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

বোরো ধান

বোরো ধান সর্বদাই রোপণ করা হয়। তবে দু'একটি জায়গায় সরিষার সাথে মিশ্রভাবে বোরো ধানের বীজ বপনও করা যায়। এতে ফলন কম হয়।

আলোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ

আলোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ধানের চাষকে প্রধান ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা -

(ক) আলো নিরপেক্ষ (Photo neutral) ধান চাষ ঃ ফুল উৎপাদনের জন্য এরা দিবসের দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যখনই চাষ করা হউক একটি নির্দিষ্ট সময় বা বয়সে ফুল উৎপাদন করে। এদেরকে বয়স নির্দিষ্ট ধান (Periodically fixed rice) বলে। অধিকাংশ আউশ ধান এর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার ধান চাষে বীজ বপন বা চারা রোপণ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) খাটো দিবসী ধান (Short day rice) ঃ এসব ধান আলোর প্রতি স্পর্শকাতর হয়। এই ধান যখনই রোপণ করা হউক দিবস দৈর্ঘ্য খাটো হলেই ফুল-ফল উৎপাদন করে।

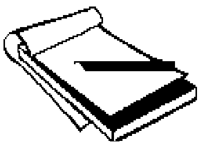

অনুশীলন (Activity): *চাষাবাদের কৌশল (Reduction Technology) অনুসারে ধানের শ্রেনিবিভাগ করুন এবং বর্ণনা দিন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের ধান চাষের বিষয়াবলীকে কয়টি দৃষ্টিকোণে শ্রেণিকরণ করা যায়?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২. কোন শাইল আসলে শাইল ধান নয়?

(ক) কাজলশাইল (খ) লতিশাইল

(গ) নাইজারশাইল (ঘ) পশুশাইল

৩. বোরো ধান কোন ঋতুতে রোপণ করা হয়?

(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা

(গ) হেমন্ত (ঘ) শীত

৪. উচ্চ ফলনশীল আউশ ধান কোন মাসে রোপণ করা হয়?

(ক) জানুয়ারি (খ) মার্চ

(গ) মে (ঘ) জুলাই

৫. কোন ধানের গাছ সবচেয়ে লম্বা?

(ক) রোপা আমন (খ) রোপা আউশ

(গ) বোনা আমন (ঘ) বোরো ধান

৬. কোন ধান প্রধানত বৃষ্টি নির্ভরভাবে চাষ করা হয়?

(ক) বোনা আউশ (খ) রোপা আউশ

(গ) উফশী রোপা আমন (ঘ) বোরো

পাঠ ১.৪ (আধুনিক ও স্থানীয়) ধানের জাতের বৈশিষ্ট্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের ধানের জাতসমূহের নাম বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধানের জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশে প্রধানত তিন জাতের ধান রয়েছে, যথা -

ক) স্থানীয় জাত
খ) স্থানীয় অনুমোদিত জাত
গ) আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত

নিচে ধানের এই তিন ধরনের জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

স্থানীয় জাতের বৈশিষ্ট্য

নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা জাতসম হকে স্থানীয় জাত বলে।

নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা জাতসম হকে স্থানীয় জাত বলে। আমাদের দেশব্যাপী বহু সংখ্যক স্থানীয় জাতের ধানের চাষ হয়ে থাকে। এক এলাকার স্থানীয় জাত সাধারণত অন্য এলাকায় চাষ করতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে এ ধরনের স্থানীয় জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

চিত্র - ১৮

১। নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা হয়।
২। ফলন খুব কম, হেক্টর প্রতি ১.৫ - ২.০ টন।
৩। ধান গাছ লম্বা তাই হেলে পড়ে।
৪। মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ ক্ষমতা কম।
৫। গাছের কান্ড নরম, পাতা লম্বাটে।
৬। রোগ ও পোকার আক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।
৭। অনেক জাত স্বল্পমেয়াদি।

চিত্র - ১৯

স্থানীয় জাতের নাম

বোরো	-	টেপি, গঁচি, খৈয়া, বোরো
আউশ	-	গিরবি, লাল মোটা, কালো মোটা
বোনা আমন	-	দুধ সর, বাজাইল
রোপা আমন	-	বতিশাইল, দাপালনি, বিরই

স্থানীয় উন্নত জাত

আমাদের দেশে স্থানীয় ধানের জাতসম হের মধ্যে যেগুলোর উন্নত গুণাবলী রয়েছে এবং কৃষি বিভাগ অনুমোদন দিয়েছে সেগুলোকে স্থানীয় উন্নত জাত বলে। স্থানীয় উন্নত জাতসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

চিত্র - ২০

১।	ফলন ক্ষমতা স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশি, হেক্টর প্রতি ২.০ - ৩.০ টন।
২।	একাধিক এলাকায় চাষাবাদ হয়।
৩।	রোগ এবং পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে কিছুটা সক্ষম।
৪।	সার প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানো যায়।
৫।	ধান গাছের গড়ন মধ্যম থেকে লম্বা।
৬।	কোন কোন জাত এলাকা বিশেষের জন্য অনুমোদিত (যেমন লোনা জমির জন্য রাজাশাইল)।

চিত্র - ২১

অনুমোদিত স্থানীয় উন্নত জাতের নাম

বোরো - হবিগঞ্জ
আউশ - কটক তারা, ধারিয়াল
বোনা আমন - ************
রোপা আমন - পাজাম, লতিশাইল, রাজাশাইল, কালিজিরা।

আধুনিক বা উফশী জাতের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে চাষকৃত উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতসম হের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলোঃ

উফশীজাতের ধানের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু।

১।	ধানের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু।
২।	গাছে পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে একটি পাতা আরেকটিকে সম্পর্ণ ঢেকে রাখেনা।
৩।	ধানের গাছ খাটো ও শক্ত গড়নের।
৪।	অধিকতর হারে মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।
৫।	ধান পাকার সময়ও কিছু কিছু সবুজ থাকে।
৬।	উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন গড়ে ১ঃ১।
৭।	রোগ, পোকা, খরা ও অতিরিক্ত ঠান্ডায় কমবেশি প্রতিরোধক!

উফশীজাতের উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন গড়ে ১ঃ১।

চিত্র-২২

জাতের নাম	জাতের নম্বর	যে মৌসুমে চাষ করা যায়	ফলন মাত্রা /হেক্টর
চান্দিনা	বি আর ১	বোরো আউশ	৪.৫-৬.৫
মালা	বি আর ২	,,	৩.৫-৫.৫
বিপ-ব	বি আর ৩	,,	৪.৫-৬.৫
ব্রিশাইল	বি আর ৪	রোপা আউশ	৫.৫-৬.৫
দুলাভোগ	বি আর ৫	,,	২.২-২.৮
বি আর -৬	আই আর ২৮	বোরো আউশ	৩.০-৪.০

জাতের নাম	জাতের নম্বর	যে মৌসুমে চাষ করা যায়	ফলন মাত্রা /হেক্টর
ব্রিবালাম	বি আর ৭	,,	৩.৫-৪.৫
আশা	বি আর ৮	,,	৪.৫-৫.৫
সুফলা	বি আর ৯	,,	৩.৫-৪.৫
প্রগতি	বি আর ১০	রোপা আমন	৫.৫-৬.৫
মুক্তা	বি আর ১১	,,	৫.৫-৬.৫
ময়না	বি আর ১২	বোরো আউশ	৪.০-৫.০
গাজী	বি আর ১৪	,,	৪.০-৫.৫
মোহিনী	বি আর ১৫	,,	৪.০-৫.৫
শাহী বালাম	বি আর ১৬	,,	৪.০-৬.০
হাসি	বি আর ১৭	বোরো	৪.৫-৫.৫
শাহজালাল	বি আর ১৮	,,	৫.০-৬.০
মঙ্গল	বি আর ১৯	,,	৫.০-৬.০
নিজামী	বি আর ২০	বোনা আউশ	৩.০-৪.০
নিয়ামত	বি আর ২১	,,	৩.০-৪.০
ভরসা	বি এইচ ৬৩	আমন	৪.০-৫.০
ইরাটম ২৮	ইরাটম ২৮	বোরো ও আউশ	৪.৫-৫.৫
ইরি ৫	আই আর ৫	রোপা আমন	৬.০-৭.০
ইরি ৮	আই আর ৮	বোরো আউশ	৫.৫-৬.৫
ইরিশাইল	আই আর ২০	রোপা আমন	৩.৫-৪.৫
পূর্বাচী	চীনা ধান	বোরো, আউশ	৪.৫-৫.৫

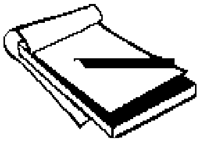

***অনুশীলন (Activity):** স্থানীয় ও আধুনিক জাতের ধানের পার্থক্য লিখুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. আধুনিক ধান জাতের গাছ ও পাতা কিরূপ?

(ক) গাছ খাটো পাতা লম্বা (খ) গাছ খাটো পাতা শক্ত

(গ) গাছ লম্বা পাতা খাটো (ঘ) গাছ লম্বা পাতা লম্বা

২. স্থানীয় জাতের ধানের গাছ ও পাতা কিরূপ?

(ক) গাছ নরম পাতা ছোট (খ) গাছ শক্ত পাতা নরম

(গ) গাছ শক্ত পাতা শক্ত (ঘ) গাছ নরম পাতা লম্বাটে

৩. মুক্তা ধান কোন মৌসুমে চাষ করা যায়?

(ক) বোরো মৌসুম (খ) আউশ মৌসুম

(গ) রোপা আমন মৌসুম (ঘ) সারা বছর

৪. বিপ-ব ধানের কোড নম্বর কত?

(ক) বি আর ৩ (খ) বি আর ১৩

(গ) বি আর ২৩ (ঘ) বি আর ৩০

পাঠ ১.৫ ধান গাছের বৃদ্ধি পর্যায়

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধানের বৃদ্ধি পর্যায়সম হের নাম বলতে পারবেন।
- ধানের বৃদ্ধি পর্যায় শনাক্ত করতে পারবেন।

বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার পর থেকে একটি ধান গাছ ধীরে ধীরে বড় হয়। গাছে ফুল ও দানা উৎপাদিত হয় এবং সবশেষে ধান পাকে। এগুলোকে ধান গাছের বিভিন্ন বৃদ্ধি অবস্থা বলে। ফসল উৎপাদনের জন্য এসব বৃদ্ধি পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধান গাছের জীবনকালকে মোটামোটি ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় -

১। চারা পর্যায় (Seedling stage)
২। কুশি উৎপাদন (Tillering stage)
৩। কান্ড বৃদ্ধি পর্যায় (Stem elongation stage)
৪। কাইচ থোড় উৎপাদন পর্যায় (Booting staমব)
৫। ফুল উৎপাদন পর্যায় (Flowering stage)
৬। দানা পুষ্টি পর্যায় (Grain filling stage)
৭। পরিপক্ক পর্যায় (Maturing stage)

বৃদ্ধি পর্যায় ও ধান গাছের জীবনকাল

একটি ধানের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে পুনরায় ধান পাকা পর্যন্ত সময়কে এর জীবনকাল বলে। বাংলাদেশে বহুজাতের ধান রয়েছে। এসব ধান জাতের জীবনকালও ভিন্ন। ধানের জাত ও জন্মানোর মৌসুমভেদে ধানের জীবনকালে পার্থক্য হয়। অপর দিকে ধান গাছের জীবনকালের ওপর এর বৃদ্ধি পর্যায়সমূহের মেয়াদ নির্ভর করে। এখানে বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ের বিবরণ দেওয়া হলো:

১। ধানের চারা পর্যায় (Seedling stage)

বীজ বপনের পর তা অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে কুশি উৎপাদন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থাকে চারা অবস্থা বলা হয়।

বীজ বপনের পর তা অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে কুশি উৎপাদন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থাকে চারা অবস্থা বলা হয়। ধানের চারা অবস্থায় মেয়াদ নিুরূপ হতে পারে-

বোরো মৌসুম : ৩৫ - ৫০ দিন
আউশ মৌসুম : ৩০ - ৪০ দিন
রোপা আমন মৌসুম : ২৫ - ৩৫ দিন

চিত্র - ২৩

২। কুশি উৎপাদন পর্যায় (Tillering stage)

ধান গাছের গোড়া থেকে গজানো চারাকে কুশি বলা হয়। কুশি ধান গাছের কোন শাখা প্রশাখা নয়। একটি নতুন চারা।

ধান গাছের গোড়া থেকে গজানো চারাকে কুশি বলা হয়। কুশি ধান গাছের কোন শাখা প্রশাখা নয়। একটি নতুন চারা। বীজ বপনের ৪০ - ৫০ দিন পর বা চারা রোপণের ১০ - ১৫ দিনের মধ্যেই ধান গাছে কুশি উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। কোন একটি ধান জাতের জীবনকাল ১২০ দিন হলে মোটামোটি ৫০-৬০ দিনের মধ্যেই কুশি উৎপাদন শেষ হয়ে যায়। জীবনকাল লম্বা হলে কুশি উৎপাদন সময় সীমাও কিছুটা বাড়ে।

চিত্র - ২৪

***অনুশীলন* (*Activity*):** *ধান গাছের বৃদ্ধি পর্যায় কয়টি? প্রতিটির মেয়াদ এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লিখুন।*

> ধানের জাতের জীবনকাল ১২০ হলে এর বাড়ন্ত কাল হবে প্রায় ৫৫ দিন।

ধান গাছের চারা অবস্থা ও কুশি উৎপাদন অবস্থাকে এক সাথে বাড়ন্ত কাল বলে। ধানের জাতের জীবনকাল ১২০ হলে এর বাড়ন্ত কাল হবে প্রায় ৫৫ দিন। ধানের জীবনকাল ১৬০ দিন হলে চারা অবস্থাসহ কুশি উৎপাদন মেয়াদ হবে প্রায় ৭৫ দিন। ধানের শেষ পর্যায়ে যেসব কুশি উৎপাদিত হয় তার সবগুলোতে শীষ নাও হতে পারে।

৩। কান্ড বৃদ্ধি পর্যায় (Stem elongation stage)

এই পর্যায়ে কান্ড দ্রুত লম্বা হতে থাকে। কুশি উৎপাদনের সাথে সাথেই কান্ড দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কুশি উৎপাদনের মাঝামাঝি থেকে এই পর্যায় ১৫-২৫ দিন মেয়াদি হতে পারে।

চিত্র -২৫

৪। কাইচ থোড় উৎপাদন পর্যায় (Booting stage)

> ধান গাছের যে অবস্থায় ফুল উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয় তাকে কাইচ থোড় অবস্থা বলে।

ধান গাছের যে অবস্থায় ফুল উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয় তাকে কাইচ থোড় অবস্থা বলে। ধান গাছের বয়স ১২০ দিন হলে মোটামুটি ৫০ - ৬০ দিন বয়সেই কাইচ থোড় উৎপাদন শুরু হয়।

চিত্র - ২৬

ধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাইচ থোর অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধানের কাইচ থোর অবস্থায় মাটিতে পুষ্টি বা পানির ঘাটতি হলে ধানের ফলন খুবই কমে যায়।

৫। ফুল উৎপাদন পর্যায় (Flowering stage) বা গর্ভ পর্যায় (Reproductive stage)

> জীবনকাল ১২০ দিন হলে ধানের ফুল অবস্থা ২৫-৩৫ দিন পর্যন্ত মেয়াদের হয়ে থাকে।

কাইচ থোড় অবস্থার শুরু থেকে কচি শীষের বহিঃপ্রকাশ পর্যন্ত অবস্থাকে ফুল অবস্থা বলা যায়। ফুল উৎপাদন অবস্থায় ধানের জমিতে উপযুক্ত পরিচর্যা না হলে ধানে চিটা হয়। জীবনকাল ১২০ দিন হলে ধানের ফুল অবস্থা ২৫-৩৫ দিন পর্যন্ত মেয়াদের হয়ে থাকে।

চিত্র ২৭

৬। দানা পুষ্টি পর্যায় (Grain filling stage)

এই পর্যায়ে দুধ উৎপাদিত হয়ে ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে। এই পর্যায় ১০-১৫ দিন মেয়াদের হতে পারে।

চিত্র - ২৮

৭। পরিপক্ক পর্যায় (Maturing stage)

ধানের ফুলে পরাগায়নের পর দুধ অবস্থা থেকে দানা পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়সীমা ধান পরিপক্ক অবস্থা হিসেবে বিবেচিত। ধানের পাকা অবস্থা ২৫-৩৫ দিন পর্যন্ত মেয়াদের হতে পারে।

চিত্র - ২৯

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ধানের প্রধান বৃদ্ধি অবস্থা কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২. বোরো মৌসুমে ধানের চারা অবস্থা সাধারণত কতদিন মেয়াদের হয়ে থাকে?

(ক) ১০-২৫ দিন (খ) ২০-৪০ দিন

(গ) ৩৫-৫০ দিন (ঘ) ৪০-৬০ দিন

৩. ধানের জীবনকাল ১২০ দিন হলে ফুল উৎপাদন অবস্থার মেয়াদ কতদিন হবে?

(ক) ১৫-২৫ দিন (খ) ২৫-৩৫ দিন

(গ) ৩০-৪৫ দিন (ঘ) ৩৫-৫০ দিন

পাঠ ১.৬ ধানের জমি ও চারা রোপণ

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধানের জমি নির্বাচন ও জমি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধানের চারা উৎপাদন ও চারা রোপণ পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

ধানের জমি নির্বাচন

আমরা জানি যে, সকল জমিতে ধানের ফলন ভাল হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন ভাল হয়। মাঝারী উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে পানি সেচ নিশ্চিত করতে হয়। মাটির বুনট পলি দোওটাশ, পলি এঁটেল ও এঁটেল হলে ভাল। ন্দিরূপ বৈশিষ্ট্য জেনে নিয়ে আমরা ধানের জমি শনাক্ত করতে পারি:

মাঝারি উচুঁ জমি	-	বর্ষাকালে প্লাবণ গভীরতা ০.৩০ সে.মি.
মাঝারি নিচু জমি	-	বর্ষাকালে প্লাবণ গভীরতা ৩০-৯০ সে.মি.
নিচু জমি	-	বর্ষাকালে প্লাবণ গভীরতা ৯০-৩০০ সে.মি.

চিত্র - ৩০

জমি তৈরি

ধানের জমি নির্বাচনের পর ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ধানের জমি তৈরি করতে হয়।

বীজ বাছাই

চলি-শ লিটার পানিতে দেড় কেজি পরিমাণ ইউরিয়া গুলে এর মধ্যে বীজ ছেড়ে দিয়ে পুষ্ট বীজ বাছাই করা যায়।

ধানের উন্নত মানের চারা তৈরি করতে হলে বীজ ঝেড়ে রোগমুক্ত পুষ্ট বীজ বাছাই করতে হবে। চলি-শ লিটার পানিতে দেড় কেজি পরিমাণ ইউরিয়া গুলে এর মধ্যে বীজ ছেড়ে দিয়ে পুষ্ট বীজ বাছাই করা যায়। এই বীজ তারপর কয়েকবার ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

চিত্র- ৩১,৩২

বীজ জাগ দেওয়া

বাছাই করা বীজ তাপমাত্রা অনুসারে নিম্নরূপ সময় মেয়াদে জাগ দেওয়া যায়ঃ

আউশ মৌসুম -	ফেবয়ারি - মার্চ	-	২৪ ঘন্টা
রোপা আমন মৌসুম -	জুন - জুলাই	-	৪৮ ঘন্টা
বোরো মৌসুম -	ডিসেম্বর - জানুয়ারি -		৭২ ঘন্টা

চিত্র - ৩৩

বীজ শোধন

ধানের বীজ নিরোগ করার জন্য নির্দিষ্ট উপায়ে ঔষধ দ্বারা পুষ্ট বীজ শোধন করা যায়। এগ্রোসান জি এন বা এগ্রোসান এম ৪ ঔষধ প্রতি কেজি বীজের জন্য ২০ গ্রাম হারে ব্যবহার করতে হয়। ঔষধ দিয়ে শোধন করা বীজ জাগ দেওয়া ঠিক নয়।

বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

ধানের উত্তম ফলন পেতে হলে বীজের অন্তত ৮০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকা দরকার। এর কম হলে চারার সংখ্যা কম হবে এবং বীজের অপচয় হবে।

বীজতলা তৈরি

সাধারণত চার ধরনের বীজতলায় ধানের চারা উৎপাদন করা যায়, যথা-

(ক) শুকনা বীজতলা	(গ) ভাসমান বীজতলা
(খ) ভিজা বীজতলা	(ঘ) দাপোগ বীজতলা

বীজতলার জমি উঁচু ও দোওটাশ মাটিসম্পন্ন হলে শুকনো বীজতলা এবং নিচু এঁটেল বুনট সম্পন্ন হলে ভিজা বীজতলা তৈরি করা যায়।

জমিতে ৪-৫টি চাষ মই দিয়ে নক্সা অনুসারে বীজতলা তৈরি করতে হয়। বন্যা কবলিত এলাকায় ভাসমান বীজতলা ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা যায়। এখানে ভিজা বীজতলা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করা হলোঃ

চিত্র - ৩৪

বীজতলার আকার	ঃ	১ কাঠা (১০ মিটার × ৪ মিটার)
বীজের পরিমাণ	ঃ	২.৫ - ৩.০ কেজি

উর্বর ও মাঝারি উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করলে কোনরূপ সার প্রয়োগের দরকার হয় না। অনুর্বর ও অল্প উর্বর জমিতে প্রতি বর্গমিটারে দু'কেজি গোবর বা পচা আবর্জনা সার প্রয়োগ করলেই চলবে।

পরিচর্যা ঃ বীজতলায় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে, আগাছা দমন করতে হবে। রোগ পোকার আক্রমণ হলে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।

চারা উঠানো ও সংরক্ষণ

চারা এমনভাবে তুলতে হয় যাতে গোড়া বা কান্ড ভেঙ্গে না যায়।

চারার বয়স ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে থাকলে তা রোপণ করা যায়। বীজতলা থেকে চারা উঠানোর ঠিক পূর্বে পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। চারা এমনভাবে তুলতে হয় যাতে গোড়া বা কান্ড ভেঙ্গে না যায়। চারাগুলো ছোট ছোট ওটাটির আকারে বাঁধতে হয়। চারা তোলার পর পর লাগানো না গেলে চারার আঁটিগুলো ছায়ায় ছিপছিপে পানিতে রেখে দিতে হয়।

চারা রোপণ

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মূল জমিতে রোপণ করা ভাল। সমতল করা জমির উপরে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করতে হয়। লম্বা দড়ির সাহায্যে সোজা সারি করে চারা রোপণ করতে হয়। চারার রোপণ দুরত্ব নিম্নরূপ -

সারি থেকে সারির দ রত্ব	-	২০-২৫ সে.মি.
গুছি থেকে গুছির দ রত্ব	-	১৫-২০ সে.মি.

চারা রোপণ সময় যত বিলম্বিত হয় চারা তত ঘন করে রোপণ করতে হয়। প্রতি গুছিতে ২-৩টি সুস্থ সবল চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণ কৌশল অর্থাৎ কীভাবে আংগুল চারার গোড়ার উপর রেখে রোপণ করতে হয় তা চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র - ৩৬

চারা মাটির ২-৩ সে.মি. গভীরে রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের গভীরতা এর চেয়ে বেশি হলে (চিত্র ....) গাছে কুশি উৎপাদন প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়।

চারা রোপণের পূর্বে নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে নিতে হবে।

চিত্র - ৩৭

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. মাঝারি নিচু জমি বর্ষাকালে কত গভীরতায় প্লাবিত হয়?

(ক) ০-৩০ সে.মি. (খ) ৩০-৪৫ সে.সি.

(গ) ৩০-৬০ সে.মি. (ঘ) ৩০-৯০ সে.মি.

২. বোরো মৌসুমে ধানের বীজ কত ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়?

(ক) ১২ ঘন্টা (খ) ২৪ ঘন্টা

(গ) ৭২ ঘন্টা (ঘ) ১১২ ঘন্টা

৩. কোন ঔষধ দ্বারা বীজ শোধন করা যায়?

(ক) এগ্রোসান (খ) নগস

(গ) হিনোসান (ঘ) ডাইক্লোরোভস

৪. ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব কত?

(ক) ১০-১৫ সে.মি. (খ) ১৫-২০ সে.মি.

(গ) ২০-২৫ সে.মি. (ঘ) ২৫-৩০ সে.মি.

৫. প্রতি গুছিতে কয়টি চারা রোপণ করতে হয়?

(ক) ১-২টি (খ) ২-৩টি

(গ) ৪-৫টি (ঘ) ৫-৬টি

পাঠ ১.৭ ধানের জমিতে আগাছা দমন, সার প্রয়োগ ও পানি সেচ ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধানের জমিতে আগাছা দমন ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধানের জমিতে পানি সেচ এবং রোগ ও পোকা দমন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

আগাছা দমন

আমরা জানি যে, ধানের জমিতে ধান গাছ ছাড়াও সেখানে অনেক আগাছা জন্মে। আগাছা ধানের ফলন কমিয়ে দেয়। আগাছা মাটি থেকে ফসল গাছের পুষ্টি উপাদান শোষণ করে নেয়, পানি ও আলোর জন্য ধান গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং জমিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

জমিতে আগাছা থাকলে এবং সে জমিতে ইউরিয়া সার দিলে ধান গাছের চেয়ে আগাছা বেশি বাড়ে। এসব কারণে আগাছা ধানের ফলন কমিয়ে দেয়। ধান গাছের প্রধান প্রধান আগাছার মধ্যে রয়েছে-

১) ঘাসজাতীয় আগাছা শ্যামা (*Echinocloa crisgulli*)
২) মুথা জাতীয় আগাছা (*Cyperus spp.*)
৩) প্রসস্থ পাতা সম্পন্ন আগাছা মুথা (*Monochoria vaginalis*)

চিত্র-৪১

ধান গাছে অরিকল থাকে। আগাছা ঘাসে অরিকল থাকে না।

ঘাসজাতীয় আগাছা দেখতে অনেকটা ধান গাছের মত। তাই এই আগাছা শনাক্ত করতে হলে পাতার গোড়ায় অরিকল (IUricle) আছে কি না দেখতে হয়। ধান গাছে অরিকল থাকে। আগাছা ঘাসে অরিকল থাকে না। ধানের জমিতে উচ্চ ফলন পেতে হলে অন্ত তিনবার আগাছা দমন করতে হয়। আগাছা দমনের সময় ও পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১) ধানের চারা অবস্থায় ঃ চারা রোপণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে হাতে টেনে বা যন্ত্র দ্বারা (Rice weeder) আগাছা দমন করতে হয়।

২) ধান গাছের বাড়ন্ত অবস্থায়ঃ প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় আগাছা দমন করতে হয়।

৩) ধানে কাইচ থোড় অবস্থায়ঃ ধানের কাইচ থোড় তৈরি হওয়ার ঠিক পূর্বে পুনরায় হাতে টেনে আগাছা দমন করতে হয়।

চিত্র- ৪২

সার প্রয়োগ

ধানের উচ্চ ফলন পেতে হলে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। দেশী জাতের তুলনায় উফশী জাত অধিক পরিমাণ উদ্ভিদপুষ্টি গ্রহণ করে তাই সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়। ধানের জমিতে নিম্নরূপ সময়ে সার প্রয়োগ করতে হয়।

১) জৈব সার ঃ গোবর বা কম্পোস্টজাতীয় জৈব সার জমি প্রস্তুত করার সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। জৈব সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়।

২) রাসায়নিক সারঃ ইউরিয়া ব্যতীত সকল জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার আগে প্রয়োগ করে মই দিতে হয়।

৩) ইউরিয়া সারঃ জমিতে চারা রোপণের পর ৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

ধানের জমিতে সার প্রয়োগের নির্দেশনা সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো। ধানের জমিতে সার প্রয়োগের সাধারন (Generalized) নীতিমালার আলোকে নির্দিষ্ট জমিতে জাত ও মৌসুমভেদে সার সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হবে।

উফশী ধানের জমিতে সার প্রয়োগের নির্দেশনা সুপারিশঃ

প্রতি শতক জমিতে সারের পরিমাণ (গ্রাম)

মৌসুম	ধানের জাত	সারের পরিমাণ					ফলন মাত্রা (কেজি)
		ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা সার	
বোনা আউশ	নিজামী, নিয়মত	৪৫০-৫৫০	২৭৫-৩৩০	১৪৫-১৭৫	২২০-২৬০	৩০-৫০	
রোপা আউশ	চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রি-বালাম	৫০০-৬০০	৩৪০-৩৮০	১৪০-১৮০	২২৫-২৬৫	৩০-৩৫	
	বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহী-বালাম	৫৫০-৬৫০	৩৪০-৩৮০	১৪০-১৮০	২২৫-২৬৫	৩০-৩৫	
রোপা আমন	কিরণ, দিশারী, নাবী	৩৪০-৩৮০	৩৩০-৩৭০	১৩৫-১৭০	২১০-২৫০	২৫-৪০	
	ব্রি-শাইল, প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব	৫৬০-৬২০	৩৫০-৩৮০	১৪০-১৮০	২৩০-২৭০	৩৫-৫৫	
বোরো	চান্দিনা, প র্বাচী	৭০০-৮০০	৩৬০-৪৫০	১৭০-২৬০	২৩০-২৭৫	৪০-৫০	
	বিপ-ব, আশা, ময়না, মোহিনী, শাহী বালাম	৮০০-৯০০	৪৫০-৫৫০	২৫০-৩২০	২৬০-৩০০	৪০-৫০	
	হাসি, শাহজালাল, মংগল, (হাওর এলাকার জন্য)	৫০০-৬০০	৩২০-৩৮০	১৪৫-১৭৫	২৩০-২৭৫	৩৫-৫০	

বিঃ দ্রঃ জৈব সার হিসেবে পচা গোবর বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করা ভাল। প্রতি শতকে ৩০-৫০ কেজি দিতে হবে। জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ২০-৩০% কমিয়ে দেওয়া যায়।

ধানক্ষেতে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা

ক) মৃত্তিকা বিবেচনায়

লাল বেলে মাটি ও পাহাড়ের পাদভূমির (Piedmount) মাটিতে এমপি সারের পরিমাণ দেড়গুণ দিতে হবে।

১। লাল বেলে মাটি ও পাহাড়ের পাদভূমির (Piedmount) মাটিতে এমপি সারের পরিমাণ দেড়গুণ দিতে হবে।

২। বেলে বুননের মাটিতে এমপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল।

৩। হাওড়ের মাটিতে সকল সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।

৪। গঙ্গা প্লাবন ও সেচ প্রকল্প এলাকায় দস্তা সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

খ) ফসল বিবেচনায়

১। দেশী জাতের বেলায় সারের পরিমাণ অর্ধেকের বেশি হবে না।

২। পূর্ববর্তী কোন ফসলে টিএসপি, এমপি, জিপসাম যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে উপস্থিত ফসলে এসব সারের আর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।

৩। কোন একটি ফসলে জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা হলে পরবর্তী ২টি ফসলে তা প্রয়োগ করার দরকার হয় না।

৪। ফসল চক্রের প্রথম খরিপ মৌসুমে যে জমিতে সবুজ সারের চাষ করা হয়েছে সে জমিতে পরের ফসলে ইউরিয়ার পরিমাণ ৩০-৪০% কমিয়ে দেওয়া যায়।

ফসল চক্রের প্রথম খরিপ মৌসুমে যে জমিতে সবুজ সারের চাষ করা হয়েছে সে জমিতে পরের ফসলে ইউরিয়ার পরিমাণ ৩০-৪০% কমিয়ে দেওয়া যায়।

পানি সেচ ব্যবস্থাপনা

উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ক্ষেত্রে পানি সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে চারা রোপণের পর ৩-৫ সে.মি. পানি সপ্তাহখানেক আটকে রাখলে আগাছার প্রকোপ কম হয়। এর পর জমিতে কুশি উৎপাদন পর্যায়ে (১০-১২ দিন) পানির পরিমাণ ২-৩ সে.মি. রাখলে কুশি উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। চারায় বয়স ৫০-৬০ দিন হলে জমিতে ৭-১০ সে.মি. পানি রাখা ভাল। এতে উৎপাদনশীল কুশির সংখ্যা বাড়ে। কারণ অধিক পানি বিলম্বিত কুশি উৎপাদন রোধ করে। বিলম্বিত কুশি থেকে ভাল দানা হয় না।

জমি সমতল হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং জমি চালু হলে বেসিন চেক বা আইল বন্ধ প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া যায়।

জমির পানি কমে গেলে প্রয়োজন মোতাবেক আগাছা দমন করে এবং উপরি সার প্রয়োগ (Top dressing) করে তারপর পানি সেচ দেওয়া যায়।

খরা দেখা দেওয়ার আশংকা থাকলে পটাশিয়াম সারের পরিমাণ বেশি দেওয়া উপকারী। এতে খরায় ফসলের ক্ষতি কম হয়।

জমির মাটি একটু দোওটাশ ধরনের হলে একবারে বেশি পারিমাণ পানি না দিয়ে কম কম করে ঘন ঘন পানি সেচ দেওয়া উত্তম। জমিতে থোড় আসা অবস্থায় পানির ঘাটতি পড়া খুবই ক্ষতিকর। তবে দানা পুষ্ট হতে শুরু করলে আর পানি সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ধানের জমিতে পানির সেচক্রম নিম্নরূপ চিত্রের সাহায্যে উল্লেখ করা যায়।

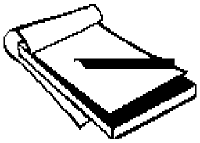

অনুশীলন (Activity): ধানের জমিতে কতবার আগাছা দমন করতে হয় পদ্ধতিসহ উল্লেখ করুন। ধানের জমিতে পানি সেচ ব্যবস্থাপনা উল্লেখ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের কোনটি ধানের প্রধান আগাছা নয়

(ক) শ্যামা (খ) মুথা

(গ) নুখা (ঘ) বথুয়া

২. জৈব সার প্রয়োগের কত দিন পর ধানের চারা রোপণ করতে হয়?

(ক) ৩-৪ দিন পর (খ) ৪-৭ দিন পর

(গ) ৭-১০ দিন পর (ঘ) ১০-২০ দিন পর

৩. ধানের জমিতে ইউরিয়া সার কয় কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়?

(ক) ১ কিস্তি (খ) ২ কিস্তি

(গ) ৩ কিস্তি (ঘ) ৪ কিস্তি

৪. নিজামী জাতের বোনা আউশে প্রতি শতক জমিতে কত গ্রাম টিএসপি দিতে হয়?

(ক) ১৭৫-২০০ গ্রাম (খ) ১৭৫-২৩০ গ্রাম

(গ) ২৭৫-৩৩০ গ্রাম (ঘ) ৩৭৫-৪০০ গ্রাম

৫. বোরো চান্দিনা ধানে প্রতি শতক জমিতে কত গ্রাম দস্তা সার দিতে হয়?

(ক) ১০-২০ গ্রাম (খ) ২০-৩০ গ্রাম

(গ) ৩০-৪০ গ্রাম (ঘ) ৪০-৫০ গ্রাম

পাঠ ১.৮ ধানের পোকা দমন, রোগ দমন ও ফসল সংগ্রহ

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধানের পোকা ও রোগ দমনের বিষয়াবলী আলোচনা করতে পারবেন।
- ধান কাটার সময় ও ফলন নির্ণয়ের সূত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

ধান চাষ করে উচ্চ ফলন পেতে হলে চারা অবস্থা থেকে পোকা ও রোগ দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। ধান পাকার সঠিক সময়ে তা কাটতে হবে এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হবে। এই পাঠে তাই ধানের পোকা ও রোগ দমন এবং ধান কাটা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পোকা দমন

ধানের ফসল বহু ধরনের পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এসব পোকার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছেঃ

১। চারা ও বাড়ন্ত পর্যায়ে ঃ মাজরা পোকা, গল মাছি, পামরী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা।
২। থোড় পর্যায়ে ঃ গান্ধী পোকা।
৩। পরিপক্ক পর্যায়ে ঃ শীষ কাটা লেদা পোকা ইত্যাদি।

চিত্র - ৪৫ ঃ মাজরা পোকা

চিত্র - ৪৬ঃ পামরী পোকা

চিত্র-৪৭ ঃ পামরী পোকা আক্রান্ত গাছ

চিত্র- ৪৮ ঃ রশি টেনে পামরী পোকা দমন

ধানের জমিতে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধম লক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে:

পোকা আক্রমণ প্রতিরোধ জাতের চাষ, যেমন- চান্দিনা ও ব্রি-শাইল জাতের ধানে মাজরা পোকার আক্রমণ কম হয়।

১। পোকা আক্রমণ প্রতিরোধ জাতের চাষ, যেমন- চান্দিনা ও ব্রি-শাইল জাতের ধানে মাজরা পোকার আক্রমণ কম হয়।
২। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ
৩। জমি আগাছামুক্ত রাখা

ধানের পোকার যান্ত্রিক দমন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ঃ

১। আলোর ফাঁদ দ্বারা মথ বিনষ্ট করা, যেমন- মাজরা পোকা দমন;
২। পাতার অগ্রভাগ কাটা, যেমন- পামরী পোকা দমন;
৩। জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ, যেমন- পামরী পোকা সংগ্রহ;
৪। হাতের পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ, যেমন- মাজরা পোকা সংগ্রহ।

চিত্র ৪৮ ঃ বাদামী গাছ ফড়িং

চিত্র ৫০ ঃ সবুজ পাতা ফড়ি

চিত্র ৫১, ৫২ ঃ গান্ধী পোকা

চিত্র ৫৩ ঃ পাতা মোড়ানো পোকা

চিত্র ৫৪ ঃ আলোর ফাঁদ

চিত্র ৫৫,৫৬ ঃ কীটনাশক প্রয়োগ

ধানের পোকার রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

ধানের জমিতে পোকার আক্রমণ বেশি হলে নির্ধারিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ধানের পোকার জৈবিক দমন পদ্ধতি

ধানের জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিলে সেখানে পাখি বসে এবং বিভিন্ন পোকা খেয়ে ফেলে।

ধানের জমিতে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি প্রধান কীটনাশকের ব্যবহার মাত্রা নিম্নের তালিকায় উল্লেখ করা যায়।

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম	আকার	প্রতি শতকে প্রয়োগ মাত্রা
পামরী, গান্ধী, পাতা মোড়ানো, পাতা শোষক, চুংগী, থ্রিপস, গল মাছি ও ছাতরা পোকা	ম্যালাথিয়ন ৫৭, রগড় ৪০, সুমিথিয়ন ৫০, এমএলটি ৫৭	তরল	৪-৫ মি.লি.
বাদামী গাছ ফড়িং	ডায়াজিনন ১৪, বাসুডিন ১০, ফুরাডান ৩ ডাইমেক্রন ১০০, কার্বিক্রন ৫০	দানাদার তরল	১০০ গ্রাম ৪-৫ গ্রাম মি.লি.
	ডিডিভিপি, ডাইক্লোরোভোস, ভেপোনা ১০০, নগস ১০০	তরল	২-৩ মি.লি.

সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থা

কোন ধানের জমিতে পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক পদ্ধতি অবলম্বন করা ভাল।

রোগ দমন

ধান ফসল জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নানারূপ রোগের উপসর্গ সৃষ্টি করে। ধানের উচ্চ ফলন পেতে হলে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ধানের প্রধান প্রধান বীজাণুঘটিত রোগের মধ্যে রয়েছেঃ

টুংরো রোগ, ব্লাষ্ট রোগ, বাদামী দাগ রোগ, লাল রেখা রোগ, খোল ধসা রোগ, উফরা রোগ ইত্যাদি।

এসব রোগে আক্রান্ত হলে ধানের কান্ড, শিকড়, পাতা, থোড় ও দানা বিনষ্ট হয়ে ফসলের ফলন কমে যায়।

ধানের জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থাসম হ অবলম্বন করা যায়।

চিত্র - ৫৭-৬০ঃ ধানের রোগের লক্ষণ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাস্পন্ন জাতের চাষঃ যেমন - চান্দিনা, দুলাভোগ, ব্রি-শাইল প্রভৃতি জাতে টুংরো রোগ কম হয়। মালা ও গাজী জাতে বাদামী দাগ রোগ কম হয়।

১। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষঃ যেমন - চান্দিনা, দুলাভোগ, ব্রি-শাইল প্রভৃতি জাতে টুংরো রোগ কম হয়। মালা ও গাজী জাতে বাদামী দাগ রোগ কম হয়।

২। বীজ শোধনঃ এগ্রোসান ঔষধ দ্বারা বীজ শোধন করলে পরবর্তীতে রোগের আক্রমণ কম হয়।

৩। আগাছা দমনঃ সুষ্ঠুভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করলে টুংরো রোগ আক্রমণ কম হয়।

যেমন - পাতা ফড়িং পোকা দমন করলে টুংরো রোগের প্রকোপ কমে যায়।

৪। সুষম সার প্রয়োগঃ জমিতে ইউরিয়া , ফসফেট, পটাশ , জিপসাম ও দস্তাজাতীয় সার সুষমভাবে প্রয়োগ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়।

রোগ দমনের কারিগরী পদ্ধতিঃ রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।

জৈবিক দমন পদ্ধতি

পূর্ব ফসলের নাড়া পুড়ে ফেলা।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতিঃ জমিতে রোগ দেখা দিলে রোগনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করা। রোগনাশকের মধ্যে রয়েছে কুপ্রাভিট ৫০ এবং হিনোসান ৫০ যথাক্রমে প্রতিশতকে ১৫ গ্রাম ও ৪ মি.লি. হারে প্রয়োগ।

ধান কাটার উপযুক্ত সময়

ধান পাকার উপযুক্ত সময়ে ধান কাটলে ফসলের অপচয় কম হয়। ধান পাকার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলোঃ

ক) কোন শীষের উপরের অর্ধেক দানার ৮০% শক্ত হবে।
খ) শীষের নিচের অর্ধেক দানার ২০% শক্ত হবে।

উপযুক্ত সময়ে ধান কাটার সুফল হলো যে এতে অপচয় কম হয়। কারণ-

ক) দানা ঝরে পড়ে না
খ) পাখি দানা খাওয়ার সুযোগ কম পায়
গ) শীষ কাটা লেদা পোকা ক্ষতি কম করতে পারর।

উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে ধান পাকার পরও পাতার অংশবিশেষ সবুজ থাকতে পারে, তবে ধান সোনালি রং ধারণ করে।

উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে ধান পাকার পরও পাতার অংশবিশেষ সবুজ থাকতে পারে, তবে ধান সোনালি রং ধারণ করে। শীষের মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। কোন কোন ধানের গাছও হেলে পড়তে পারে।

প্যাডেল থ্রেসার দ্বারা ধান মাড়াই করলে ধান গাছের গোড়ায় কেটে ছোট ছোট আটি বাঁধতে হবে। অন্যথায় গাছের মাঝামাঝি ধান কাটলেই চলে।

ধান রাখার জায়গা না থাকলে শুকনো দিনে ধান কাটাই ভাল।

ধানের ফলন নির্ণয়

ধান পেকে যাওয়ার পর কেটে মাড়াই করার আগেই এর খসড়া ফলন নির্ণয় করা যায়। ধানের ফলন নির্ণয়ের স ত্র হলোঃ

$$\text{প্রতি শতক জমিতে ধানের ফলন} = \frac{\text{১ বর্গমিটার স্থানে শীষের সংখ্যা} \times \text{পুষ্ট যে কোন ১০টি ছড়ায় ধানের সংখ্যা} \times \text{২৫} \times \text{৪০}}{\text{১০০০০} \times \text{১০০০}} \text{ কেজি}$$

কোন জমিতে ৩টি স্থান দৈবচয়ন করে সেখান থেকে ৩টি হিসাব নিয়ে গড় করে ধানের ফলন বের করা যায়।

উদাহরণঃ $$\text{শতকে ধানের ফলন} = \frac{\text{১০০} \times \text{১৮০০} \times \text{২৫} \times \text{৪০}}{\text{১০০০০} \times \text{১০০০}}$$

ধান কাটার পর যথাশীঘ্র মাড়াই করতে হয়। তারপর শুকিয়ে গোলায় রাখতে হয় বা বস্তায় ভরে শুকনো স্থানে রাখতে হয়।

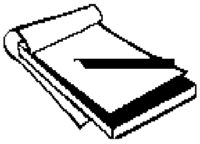

অনুশীলন (Activity): *একটি উদাহরনের সাহায্যে এক একর জমিতে ধানের ফলন নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন?*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ধানের বাড়ন্ত পর্যায়ে কোন পোকা আক্রমণ করে?

(ক) শীষ কাটা লেদা পোকা (খ) গান্ধী পোকা

(গ) মাজরা পোকা (ঘ) কাটুই পোকা

২. ফুরাডান কী জাতীয় দ্রব্য?

(ক) কীট নাশক (খ) রোগ নাশক

(গ) আগাছা নাশক (ঘ) ভাইরাস নাশক

৩. ধানের শীষের নিচের ভাগের কতভাগ ধান পরিপক্ক হলে ধান কাটা যায়?

(ক) ২০% (খ) ৪০%

(গ) ৬০% (ঘ) ৮০%

৪. ধান মাড়াই যন্ত্রের নাম কী?

(ক) রাইছ উইডার (খ) পেডেল থ্রেসার

(গ) উইনোয়ার (ঘ) টিলার

৫. নিচের কোনটি রোগনাশক দ্রব্য?

(ক) ম্যালাথিয়ন (খ) হিনোসান

(গ) কার্বিক্রণ (ঘ) রগড়

ব্যবহারিক

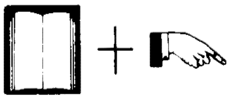

পাঠ ১.৯ ধান গাছের বিভিন্ন অংশ এবং বৃদ্ধি পর্যায় চিহ্নিতকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি

- একটি ধান গাছ দেখে গাছটি কোন বৃদ্ধি পর্যায়ে রয়েছে তা শনাক্ত করে নাম বলতে পারবেন,
- একটি ধান গাছ এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম বলতে পারবেন এবং চিত্রে চিহ্নিত করতে পারবেন।

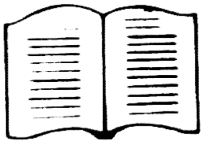

পরীক্ষার উপকরণ

১) বিভিন্ন বয়সের ধান গাছ
২) ম্যাগনিফাইং গ্লাস
৩) নোট খাতা, পেন্সিল, রাবার, স্কেল

কাজের ধাপ

১) ধানের জমি থেকে বিভিন্ন বয়সের গাছ তুলে নিয়ে আসুন।
২) প্রতিটি গাছ কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নির্ণয় করুন।
৩) একটি ধান গাছ এঁকে মেগনিফাই করুন।

পরীক্ষার ফলাফল ছক

ধান গাছের চিত্র

পরীক্ষা করা গাছটি বৃদ্ধির .... পর্যায়ে রয়েছে।

চিত্র

ব্যবহারিক

পাঠ ১.১০ ধান চাষের বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন

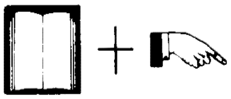

এ পাঠ শেষে আপনি

- চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা তৈরি করতে পারবেন।
- বীজতলায় যাবতীয় পরিচর্যা করতে পারবেন।

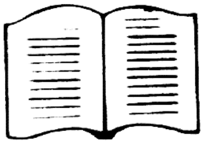

উপকরণ

১) এক খন্ড জমি
২) কোদাল, রশি, খুঁটি
৩) বীজ
৪) ঝাঝরি
৫) সার দ্রব্য
৬) মাপক টেপ

কাজের ধাপ

১) ফিতা দিয়ে ১ শতক জমি মেপে নিন।
২) বীজতলার মাপ অনুসারে কোদাল দিয়ে বীজতলা তৈরি করুন।
৩) বীজতলায় সার দিন ও বীজ বুনুন।
৪) বীজতলায় যাবতীয় পরিচর্যা করুন।

কাজের ফলাফল ছক

১) বীজতলার নক্সা আঁকলাম।
২) বীজতলায় কৃত যাবতীয় কার্যাবলী লিখলাম।
৩) বীজতলায় ব্যবহৃত যাবতীয় উপকরণের নাম ও পরিমাণ।
৪) বীজতলায় কৃত পরিচর্যার বিবরণ লিখলাম।

1. বাংলাদেশের ৩টি প্রধান দানা খাদ্য ফসলের পরিচিতি বর্ণনা কর€ন।

2. গম ও বার্লি গাছের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নির্ণয় করবেন?

3. চিনা ও সরগামের পরিচিতি বর্ণনা করুন।

4. ধান ও ভুট্টার বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

5. বাংলাদেশের ৫টি দানা শস্যের নাম লিখুন?

6. দানা ফসল কাকে বলে?

7. ইন্ডিকা ও জাভনিকা উপ-প্রজাতির বৈশিষ্ট্য তুলনা করুন।

8. দানার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ধানকে কীভাবে শ্রেণিকরণ করা যায়?

9. বাংলাদেশে ধান চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

10. জাপনিকা জাতের গাছের কাঠামো ও উচ্চতা কীরূপ?

11. *Oryza sativa* এর ৩টি রেস এর নাম কী কী?

12. বাংলাদেশে কী পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ করা হয়?

13. বাংলাদেশে বোরো ধান চাষ বিষয়াবলী চিত্রসহ আলোচনা করুন।

14. আউশ ধান কী কী ভাবে চাষ করা যায় বর্ণনা করুন।

15. চিত্রসহ আমন ধানের চাষ সময় বর্ণনা করুন।

16. দেশী ও উফশী বোরো ধান কোন সময় রোপণ করা হয়?

17. আলোর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ধান শ্রেণিকরণ করুন।

18. বোরো ধান চাষের বৈশিষ্ট্য কী?

19. আধুনিক ধানের জাতসমূহের মূল বৈশিষ্ট্য কী কী?

20. পাঁচটি আধুনিক ধানের জাতের নাম, নম্বর এবং ফলনমাত্রা উল্লেখ করুন।

21. ধানের স্থানীয় জাত এবং স্থানীয় অনুমোদিত জাতসম হের বৈশিষ্ট্য তুলনা করুন।

22. ধান গাছের বৃদ্ধি অবস্থা কয়টি? যে কোন ২টি অবস্থা বর্ণনা করুন।

23. চিত্রসহ ধানের চারা অবস্থা ও কুশি উৎপাদন অবস্থা বর্ণনা করুন।

24. ধান চাষের জন্য জমি নির্বাচন ও জমি প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

25. ধানের চারা উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

26. ধানের চারা রোপণর বিষয়াবলী আলোচনা করুন।

27. বীজ কত সময় জাগ দিতে হয়?

28. কীভাবে ধানের বীজ শোধন করতে হয়?

29. এক শতক বীজ তলায় কী পরিমাণ সার দিতে হয়?

30. ধানের জমিতে আগাছা দমন বিষয়াবলী আলোচনা করুন।

31.ধানের জমিতে রোপা আমন মৌসুমে সারের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

32.ধানে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা কী কী?

33.ধানের পানি সেচ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করুন।

34.ধানের প্রধান আগাছাগুলোর নাম লিখুন।

35.ধান ও ঘাসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

36.ধানের জমিতে ইউরিয়া সার কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়?

37.ধানের প্রধান প্রধান পোকার নাম ও এদের দমন পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

38.ধানের প্রধান প্রধান রোগের নাম ও এদের দমন ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

39.ধানের ফসল কাটার সময় ও ফলন নির্ণয়ের সূত্র উল্লেখ করুন।

40.ধানের ৫টি ক্ষতিকর পোকার নাম করুন।

41.ধানে ব্লাষ্ট রোগ দমনের ব্যবস্থা কী?

42.ধানের ফলনের সূত্র কী?

উত্তরমালা

পাঠ ১.১:

১। ক, ২।খ, ৩।ঘ, ৪।গ, ৫।খ, ৬।গ

পাঠ ১.২:

১। ক, ২।খ, ৩।খ, ৪।খ, ৫।গ, ৬।গ

পাঠ ১.৩:

১।খ, ২।ঘ, ৩।ঘ, ৪।খ, ৫।গ, ৬।ক

পাঠ ১.৪:

১।খ, ২।ক, ৩।গ, ৪।ক

পাঠ ১.৫:

১।*, ২।গ, ৩।খ

পাঠ ১.৬:

১।ঘ, ২।গ, ৩।ক, ৪।গ, ৫।খ

পাঠ ১.৭:

১।গ, ২।গ, ৩।গ, ৪।গ, ৫।ঘ

পাঠ ১.৮:

১।গ, ২।ক, ৩।খ, ৪।খ, ৫।খ

ইউনিট ২ দানা ফসলের চাষ

ইউনিট ২ দানা ফসলের চাষ

গম, ভুট্টা ও কাউনের চাষ

বাংলাদেশে চাষকৃত দানা ফসলসমূহের মধ্যে গম, ভুট্টা ও কাউনের চাষ খুবই সম্ভাবনাময়। পানির অভাবে বা মাটি বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ হওয়ার কারণে অনেক জমিতে ধানের ফলন ভাল হয় না। কিন্তু এসব জমিতে সন্তোষজনকভাবে গম, ভুট্টা ও কাউনের চাষ করা যায়। বাংলাদেশে বহু জাতের গম, ভুট্টা ও কাউন রয়েছে। এসব ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য গবেষণা করে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাই গম, ভুট্টা ও কাউন চাষ করে সফলতা লাভ করতে হলে উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। উৎপাদন কৌশলসমূহ জেনে নিয়ে তা অনুশীলন করা দরকার। এই ইউনিট পাঠ শেষে তাই আপনি গম, ভুট্টা ও কাউনের সাথে পরিচিত হবেন এবং এর উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশল জানতে পারবেন।

চিত্র ৬৮, ৬৯

পাঠ ২.১ গমের পরিচিতি ও গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি

- গম ও এর বিভিন্ন জাতের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- গমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানা ফসল। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে বহু জাতের গম উদ্ভাবন ও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গম সম্ভবত দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় প্রথম চাষাবাদ হয়েছিল। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে ইরাকের ইউফ্রেটস (Euphrates) ও টাইগ্রিস (Tigris) উপত্যকা। গমের উৎপাত্তির অন্যান্য স্থানগুলো হচ্ছে ইরাক, ইরান এলাকার জারমো (Jarmo), করিম শাহির (Karim shahir), টিপ সারাব (Tepe sarab)। প্রাচীন পারস্য, গ্রীস এবং মিশরে ঘনীভুত (Carbonized) গম দানা পাওয়া গেছে। অতএব, গম অত্যন্ত প্রাচীন ফসল। বর্তমানে গম পৃথিবীর সর্বাধিক জমিতে চাষকৃত ফসল।

গমের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি নিম্নরূপ।

গমের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি

প্রজাতি	ইংরেজী নাম	ক্রোমোসম সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য
১. *Triticum aestivum*	Common wheat	2n =৪২	রুটি তৈরির গম
2. *T.duram*	Duram	2n=২৮	বিবিধ ব্যবহার
T.dicoccum	Emmer	2n=২৮	,,
3. *T.Sphaerococcum*	Shot	2n=৪২	,,
4. *T. monococcum*	Eincorn	2n=১৪	,,

গমের এই ৪টি প্রজাতিতে ১৪টি উপ-প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে Turanicum নামে একটি উপ-প্রজাতি বন্য। বাকি সবগুলো উপ-প্রজাতি আবাদযোগ্য।

বাংলাদেশে *T.aestivum* প্রজাতির চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে *T.aestivum* প্রজাতির চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে।

চিত্র -৭০

গমের জাত নির্বাচন

গমের জাত নির্বাচনের ওপর গম চাষের সফলতা নির্ভর করে। গম জাতের মধ্যে কোনটি আগাম, আবার কোনটি একটু বিলম্বে বপন করলেও চলে। এছাড়া বাংলাদেশের সকল স্থানে গমের ফলন সমান হয় না। তাই গম চাষের জন্য এর জাত নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গমের সনোরা, দোয়েল, পাভন, আনন্দ, কাঞ্চন, বরকত, আকার ও অগ্রনী জাতসমূহ মোটামুটি সারা দেশেই ভাল জন্মে। গমের বলাকা জাতটি উপকূলীয় এলাকায় ভাল হয় না। ইনিয়া নরটেনো, সোনালিকা, জুপাটিকো ও পূরী জাতসমূহ রাজশাহী বিভাগ ও ময়মনসিংহ জেলায় ভাল জন্মে। টেনোরি জাতের গম যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লায় ভাল জন্মায়।

গমকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। গমের দানার গঠন অনুসারে

ক) নরম (soft) গম ঃ দানায় গ্লুটিন ৪০% এর কম। আটা নরম। বেকারী (বিস্কুট) শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- *T.aestivum*

খ) শক্ত (Hard) গমঃ দানার প্রুটিনের পরিমাণ ৪০% এর বেশি। পাউরুটি ও চাপাতি তৈরির জন্য ভাল। উদাহরণ- *T.durum*

২। দানার বর্ণ অনুসারে

ক) লাল বা হলদে গম - ইনিয়া, জোপাটেকো, সনোরা, টেনোরি, সোনালিকা।

খ) সাদা গম - বলাকা, দোয়েল, নরটেনো, কাঞ্চন, আনন্দ, আকবর, বরকত, অগ্রনী।

৩। ক্রোমোসম সংখ্যা অনুসারে

ক) ডিপ্লোয়েড (Diploid) - *T.monococcum*

খ) টেট্রাপ্লয়েড (Tetraploid)- *T. durum*

গ) হেক্সাপ্লয়েড (Hexaploid) - *T.aestivum*

কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	গাছের উচ্চতা (সে.মি.)	দানার রং ও আকার	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন সেচ সহ কেজি /শতক
আনন্দ	১০০	সাদা ছোট	১০৩-১০৮	১৩-১৭
কাঞ্চন	১০০	সাদা বড়	১০৬-১১২	১৭-২০
বরকত	৯০	সাদা মধ্যম	১০৫-১১০	১৩-১৬
আকবর	৯০	সাদা মধ্যম	১০৩-১০৮	১৫-২০
সোনালিকা	৯০	সোনালী বড়	১০০-১০৪	১৩-১৫
কল্যান সোনা		,,	১০০-১১০	১৩-১৬
ইনিয়া-৬৬		লাল	১০৫-১০৭	১২-১৫
পাভন-৭৬		সাদা	১১২-১১৭	১৫-১৮
বলাকা	৮০	,	১০৫-১১০	১৪-১৮
অগ্রনী	৯০	সাদা বড়	১০০-১১৫	১২-১৬

বাংলাদেশে চাষকৃত জাতসম হের মধ্যে বর্তমানে সোনালিকা এবং কাঞ্চন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বাংলাদেশে চাষকৃত জাতসম হের মধ্যে বর্তমানে সোনালিকা এবং কাঞ্চন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বলাকা ও অগ্রনী জাত ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই জাতগুলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত বা উদ্ভাবিত এবং সরকারিভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত। বর্তমানে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লোনা মাটি সহ্যশীল এবং উচ্চতর আবহাওয়ায় উপযোগী গম জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলছে।

গমের গুরুত্ব

বাংলাদেশে খাদ্য সংকট পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় খাদ্য ফসল হিসেবে গম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গমের গুরুত্ব নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা যায়ঃ

বাংলাদেশে গমের ফলন সন্তোষজনক, প্রতি শতকে ১৫-২০ কেজি।

১) বাংলাদেশে গমের ফলন সন্তোষজনক, প্রতি শতকে ১৫-২০ কেজি।

২) খাদ্য হিসেবে গম বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

৩) পানি ধারণ ক্ষমতা কম থাকার ফলে যেখানে ধান চাষ সম্ভব নয়, সেখানেও গমের চাষ করা যায়।

৪) সেচ চাহিদা কম।

৫) গম চাষে ব্যয় কম, তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকও এর চাষাবাদ করতে পারে।

৬) গম কাটার পর সে জমিতে পাট বা আউশ ধানের চাষ করা যায়।

৭) গমের চাষ মৌসুমে প্রাকৃতিক দ র্যোগ কম।

৮) গমের দানার সবটুকুই খাওয়া যায়, তুষ বা কুড়া হয় না।

৯) গমের গাছ দিয়ে ঘর ছাওয়া যায়, বেড়াও দেওয়া যায়।

১০) গমের নরম গাছ গবাদি পশুও খায়।

১১) গমের ভুষি পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১২) গম বেকারী শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে।

১৩) গম স্বল্পকালীন ফসল, ১০০-১১৫ দিনের মধ্যেই কাটা যায়।

১৪) ধানের বেলায় ধান ও চাউলের অনুপাত ১০ঃ৭, অথচ গমের সবটুকুই আটায় পরিণত করা যায়।

ধানের বেলায় ধান ও চাউলের অনুপাত ১০ঃ৭, অথচ গমের সবটুকুই আটায় পরিণত করা যায়।

১৫) এক একর জমির ধানের পানি দিয়ে ৩ একর জমিতে গম চাষ করা যায়।

১৬) গমে রোগ পোকার আক্রমণ তুলনাম লকভাবে কম।

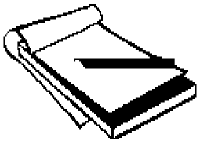

অনুশীলন (Activity): *১. গমের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতির ছক তৈরী করুন, ২. বাংলাদেশে চাষকত গমের জাতসম হের কৃষতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী লিখুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. *T.aestivum* এর ক্রোমোসম সংখ্যা কত?

(ক) 2n=১৪ (খ) 2n=২৮

(গ) 2n=৪২ (ঘ) 2n=৫৬

২. কাঞ্চন জাতের গমের ফলন প্রতি শতকে কত কেজি?

(ক) ১২-১৩ কেজি (খ) ১৩-১৫ কেজি

(গ) ১৭-২০ কেজি (ঘ) ২০-২৭ কেজি

৩. নিচের কোন প্রজাতির গম দ্বারা ভাল চাপাতি তৈরি হয়?

(ক) *T. aestivum* (খ) *T. durum*

(গ) *T. turgidum* (ঘ) *T. monococcum*

৪. নিচের কোনটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত?

(ক) কাঞ্চন (খ) ইনিয়া

(গ) সোনালিকা (ঘ) জাপনিকা

৫. এক একর ধান জমির প্রয়োজনীয় পানি দ্বারা কত একর গমের চাষ করা যায়?

(ক) ১ একর (খ) ২ একর

(গ) ৩ একর (ঘ) ৪ একর

পাঠ ২.২ গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ও জমি প্রস্তুতকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি

- ♦ গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায়সম হ শনাক্ত করতে পারবেন।
- ♦ গম চাষের জন্য জমি নির্বাচন ও জমি প্রস্তুতের বিষয়াবলী আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জমিতে বীজ বোনার পর অঙ্কুরিত চারা ধীরে ধীরে বড় হয়ে পুনরায় শীষ ও দানা উৎপাদন করে জীবনকাল পূর্ণ করে। গম চাষের জীবনকালকে কৃষিতাত্ত্বিক বিবেচনায় বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। নিচে গম গাছের প্রধান প্রধান বৃদ্ধি পর্যায়সমূহ আলোচনা করা হলো।

চিত্র-৭১

১। চারা পর্যায় (Seedling stage) ঃ বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

২। মুকুট শিকড় উৎপাদন পর্যায় (Crown root stage) ঃ বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার ১৩-২০ দিনের মধ্যে গম গাছের গোড়ায় মুকুট শিকড় উৎপাদিত হয়।

৩। কুশি উৎপাদন পর্যায় (Tillering stage)ঃ মুকুট বের হওয়ার পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত গম গাছের গোড়া থেকে কুশি উৎপাদিত হতে থাকে।

৪। দ্রুত বৃদ্ধি পর্যায় (Jointing stage) ঃ গাছ ৩৫-৬০ দিন বয়সে দ্রুত বড় হয়।

> কুশি উৎপাদনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে থোড় উৎপাদন শুরু হয়।

৫। থোড় পর্যায় (Booting stage) ঃ কুশি উৎপাদনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে থোড় উৎপাদন শুরু হয়।

৬। দানা পুষ্টি পর্যায় (Grain filling stage): দানা পুষ্ট হতে থাকে।

৭। পরিপক্ক পর্যায় ঃ শীষ বের হওয়ার ৩০-৩৫ দিনে মধ্যে দানা পরিপক্ক হয়।

গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ের গুরুত্ব

গাছের ফলন বৃদ্ধির জন্য এর বৃদ্ধি পর্যায়সম হের ভিত্তিতে পরিচর্যা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঃ

১। গমের চারা অবস্থায় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

২। গমের গাছের মুকুট শিকড় উৎপাদন অবস্থায় জমিতে সেচ ও সার দিতে হয়।

চিত্র-৭২

> জমিতে থোড় উৎপাদন ও শীষ বের হওয়া পর্যায়ে পানি সেচ ও পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

৩। জমিতে থোড় উৎপাদন ও শীষ বের হওয়া পর্যায়ে পানি সেচ ও পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

৪। গমের দানা পরিপক্ক হওয়ার পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি না থাকে বা জলাবদ্ধতা দেখা না দেয় সে ব্যবস্থা করতে হয়।

গম বীজ জমিতে বপনের পর অঙ্কুরোদগম পর্যায়ে পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হয়। গম পাকা অবস্থায়ও পাখি যাতে না খেয়ে ফেলতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

গম গাছ যথাযথভাবে বড় হওয়ার জন্য পতঙ্গ অবস্থায় পুষ্টি ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

গমের বৃদ্ধি পর্যায়, সময়সীমা ও কৃষিতাত্ত্বিক তাৎপর্য

ক্রমিক নং	বৃদ্ধি পর্যায় (growth stage)	গাছের বয়স	কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
১	চারা পর্যায়	৭-১১	আগাছা দমন করা
২	মুকুট শিকড়	১৭-২২	সার ও পানি সেচ দেওয়া
৩	কুশি উৎপাদন পর্যায়	২০-৪৫	সার ও পানি সেচ দেওয়া
৪	দ্রুত বৃদ্ধি পর্যায়	৩৫-৬০	আগাছা দমন করা পোকা ও রোগ দমন
৫	থোড় - গর্ভ -শীষ বের হওয়া -ফুল আসা ও ফোটা	৫৫-৮০	সার দেওয়া
৬	দানা পুষ্টি পর্যায়	৭০-৯০	পানি সেচ দেওয়া
৭	পরিপক্ক পর্যায়	৯০-১২০	ফলন কাটা

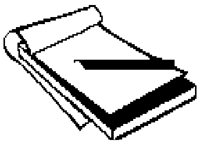

অনুশীলন (Activity): *গম গাছের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ের নাম লিখুন। প্রতিটি বৃদ্ধি পর্যায় গাছের বয়স বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা উল্লেখ করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. গমের প্রধান বৃদ্ধি পর্যায় কয়টি?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি

(গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

২. গমের মুকুট শিকড় পর্যায়ে কী করতে হয়?

(ক) আগাছা দমন (খ) কীটনাশক প্রয়োগ

(গ) পানি সেচ (ঘ) রোগনাশক প্রয়োগ

৩. শীষ বের হওয়ার কতদিনের মধ্যে গমের দানা পরিপক্ক হয়?

(ক) ২০-২৫ দিন (খ) ৩০-৩৫ দিন

(গ) ১০-১৫ দিন (ঘ) ৪০-৪৫ দিন

৪. গমের ১৭-২২ দিন বয়সে কী তৈরী হয়?

(ক) মুকুট শিকড় (খ) যোড়

(গ) ফুল (ঘ) কুশি

পাঠ ২.৩ গমের চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- গম চাষের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গম চাষের প্রযুক্তি অনুসরণের জন্য কী করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

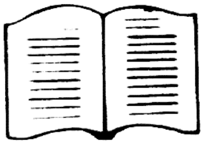

গম চাষ পদ্ধতির প্রধান প্রধান ধাপগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো। গমের জমি নির্বাচন ও জমি প্রস্তুতের পর করণীয় কাজগুলো হলো:

১) গমের জাত ও বীজ নির্বাচন
২) বীজ বপন
৩) সার ব্যবহার
৪) পানি সেচ
৫) আগাছা, পোকা, রোগ ও ইঁদুর দমন
৬) ফসল কাটা ও প্রক্রিয়াকরণ।

জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য উপযুক্ত।

উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য উপযুক্ত। লোনা মাটি, বেলে মাটি ও এঁটেল মাটিতে গম ভাল হয় না। গমের জমি সমতল হওয়া দরকার যাতে পানি সেচ দিলে জমির কোন অংশে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়। আগাম কাটার উপযুক্ত রোপা আমন ও বোনা আমন ধানের জমিতে গমের চাষ করা যায়।

জমি প্রস্তুতকরণ ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচনের পর মাটির ‘জো’ অবস্থা বা সামান্য ভিজা থাকা অবস্থায় চাষ দিতে হবে। এক দেড় সাপ্তাহের মধ্যে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে গমের জমি প্রস্তুত করা যায়। জমি চাষ করার সময় আগাছা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে তা যেন পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়।

জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করতে হলে তা জমি প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জৈব সার ছাড়াও টিএসপি, ফসফেট, জিপসাম ও দস্তা সার জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

জমির মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার পর লাঙ্গল দ্বারা ঢালের দিকে কয়েকটি আড়াআড়ি ফালি কাটতে হবে যাতে পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

বীজ নির্বাচন

বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৭৫-৮০% হওয়া দরকার, নতুবা জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ পাওয়া যাবে না।

গম চাষে ভাল ফলন পেতে হলে রোগমুক্ত ও পুষ্ট বীজ বাছাই করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৭৫-৮০% হওয়া দরকার, নতুবা জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ পাওয়া যাবে না। বীজ সন্দেহজনক হলে একটি পেট্রিডিশে ভিজা খবরের কাগজ পদ্ধতিতে এর অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে পেট্রিডিশের তলায় ৩-৪ ফর্দ খবর কাগজ বিছিয়ে তার উপর ৫০টি বীজ দিয়ে উপরে পুনরায় ৩-৪টি খবরের কাগজ দিয়ে তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়। এভাবে ৪-৬ দিনের মধ্যে বীজ গজাবে। গজানো বীজের সংখ্যা হিসাব করে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে।

বীজ বপন সময়

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে নভেম্বর মাসে এবং দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসম হের ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হয়। এই সময় সীমার পরে বীজ বুনলে গমের ফলন কমে যায়।

বীজ বপন হার

গম বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। নিচে গম বীজ বপনের হার উলে-খ করা হলো।

বীজ বোনার সময়	বপন পদ্ধতি	বীজের পরিমাণ (গ্রাম / শতক)	
		সেচযুক্ত	সেচছাড়া
নভেম্বর	ছিটিয়ে বোনা সারিতে বোনা	৫০০ ৪০০	৪০০ ৩৫০
ডিসেম্বর	ছিটিয়ে বোনা সারিতে বোনা	৬০০ ৫০০	৫০০ ৪৫০

বীজ বপন পদ্ধতি

> সারিতে বীজ বপন করলে সারি থেকে সারির দ রত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং বীজ থেকে বীজের দ রত্ব

ছিটিয়ে বীজ বপন করলে জমিতে বীজ বপনের পর জমিতে এমনভাবে একটি চাষ দিতে হবে যাতে অধিকাংশ বীজ ৪-৫ সে.মি. গভীরতায় থাকে। সারিতে বীজ বপন করলে সারি থেকে সারির দ রত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ২-৩ সে.মি.।

চিত্র

সারিতে বীজ বুনলে বীজ বপন যন্ত্র দ্বারা অতি দ্রুত বীজ বপন করা যায়। বীজ বপন যন্ত্র হাতেও ঠেলা যায়, আবার যন্ত্র চালিতও হতে পারে।

বীজ শোধন

গমের বীজ নিরোগ করতে ভিটাভেক্স (Vitavex) দ্রব্য দ্বারা বীজ শোধন করে তারপর বপন করা যায়। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৪-৫ গ্রাম শোধন দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। ভিটাভেক্স দ্বারা শোধন করলে গমের গোড়ায় তার কৃমির (Wire worm) আক্রমণ হয় না।

সার ব্যবহার

গম চাষ করে উত্তম ফলন পেতে হলে জমিতে অবশ্যই জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

গমের জমিতে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ এখানে উলে-খ করা হলো। সেচ সুবিধার ভিত্তিতে সারের পরিমাণ কম বেশি হয়ে থাকে।

গম সারের পরিমাণ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি / শতক)		
	সেচযুক্ত	অল্পসেচ	সেচহীন
ইউরিয়া	১২০০	৮০০	৫০০
টিএসপি	৮০০	৬০০	৩০০
এমপি	৩০০	২০০	১০০
জিপসাম	৮০০	৬০০	৩০০
দস্তা	৫০	৩০	১৫
জৈব	২৫	২০	১৫

> ইউরিয়া সারের এক তৃতীয়াংশ জমি প্রস্তুতের সময়, এক তৃতীয়াংশ চারা গজানোর ১৭-২০ দিন পর এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় প্রয়োগের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচযুক্ত চাষে ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হবে। ইউরিয়া সারের এক তৃতীয়াংশ জমি প্রস্তুতের সময়, এক তৃতীয়াংশ চারা গজানোর ১৭-২০ দিন পর এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় প্রয়োগের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচহীন অবস্থায় সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চিত্র-৭৪

পানি সেচ

গমের জমিতে উচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে পানি সেচ দিতে হবে। গমের গাছে মুকুট শিকড় (crown root) বের হওয়ার সময় অবশ্যই সেচ দিতে হবে। গমে ২টি সেচ দিলে প্রথমটি মুকুট শিকড় উৎপাদন পর্যায়ে এবং দ্বিতীয়টি শীষ বের হওয়ার সময় অর্থাৎ গাছের বয়স ৪৫-৫০ দিন হলে দিতে হবে। জমিতে তৃতীয় সেচ দেওয়ার সুযোগ থাকলে তা গাছের ৭৫-৮০ দিন বয়সে দিতে হবে।

গমের জমিতে সেচ দেওয়ার পূর্বে আগাছা দমন করে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগ করে নিতে হবে।

আগাছা দমন

জমিতে পানি সেচ ও সার প্রয়োগ করে গমের ফলন বাড়াতে হলে নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে।

জমিতে বীজ বপনের পর ১২-১৫ এবং ৩৫-৪৫ দিনের মধ্যে ২টি নিড়ানি দিলেই চলে।

জমিতে প্রধানত নিড়ানি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জমিতে নিড়ানি দেওয়ার সময় কোন স্থানে গাছ ঘন থাকলে তা পাতলা করে দিতে হয়। জমিতে বীজ বপনের পর ১২-১৫ এবং ৩৫-৪৫ দিনের মধ্যে ২টি নিড়ানি দিলেই চলে। জমিতে নিড়ানি দেওয়ার পর ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

গমের জমির প্রধান আগাছা হচ্ছে দুধা, শ্যামা, মুথা, কাঁটানাটে, দন্ডকলস, বথুয়া ইত্যাদি। এসব আগাছা শিকড়সহ টেনে তুলতে হবে এবং গাছে ফুল আসার পূর্বে আগাছা দমন করতে হবে।

পোকা দমন

গমের প্রধান প্রধান পোকার মধ্যে রয়েছে -

ক) জাব পোকা
খ) তার পোকা বা তার কৃমি
গ) মাজরা পোকা

জমিতে এসব পোকা দেখা দিলে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ইঁদুর দমন

গমের জমিতে ইঁদুর দমনের জন্য বাজার থেকে কিনে বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে। ইঁদুরের গর্তে বা গর্তের পাশে পর পর ৩-৪ রাত্রি বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়। ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে বা ধোঁয়া দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়।

চিত্র-৭৫

রোগ দমন

গমের প্রধান প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে -

ক) মরিছা রোগ (Wheat rust)
খ) পাতার দাগ (Leaf spot)
গ) শিকড় ও কান্ড পচা রোগ (Root and stem rot)
ঘ) ঝুল রোগ (Smut)

চিত্র ৭৬-৭৭

গমের ফলন এসব রোগের হাতে থেকে রক্ষার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়:

১) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ব্যবহার, যেমন- পাতার দাগ ও মরিচা রোগ দমন
২) বীজ শোধন করাঃ প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ প্রয়োগে কৃমি রোগ দমন হয়।
৩) একই জমিতে বার বার গমের চাষ না করা, যেমন- কৃমি রোগ দমন।
৪) আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা যেমন - ঝুল রোগ দমন।
৫) রোগ নাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ, যেমন- কুপ্রাভিট ও ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ।

ফসল কাটা ও মাড়াই

একটি শীষ হাতে নিয়ে তালুতে ঘষলে যদি দানা বের হয়ে আসে তা হলে বুঝতে হবে দানা পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া দানা দাঁতে কাটলে কট কট শব্দ হলে বুঝতে হবে দানা পেকে গেছে।

গম পাকার পর সকালে অথবা বিকেলে কাটতে হয়। গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকলে বুঝতে হবে গম পরিপক্ক হয়েছে। একটি শীষ হাতে নিয়ে তালুতে ঘষলে যদি দানা বের হয়ে আসে তা হলে বুঝতে হবে দানা পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া দানা দাঁতে কাটলে কট কট শব্দ হলে বুঝতে হবে দানা পেকে গেছে।

গম কাটার পর দুপুর বেলা মাড়াই করা উচিত। বাদলা দিনে গম কাটতে নেই। গম কাঠের উপর পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করা যায়।

গম মাড়াই করার পর ঝেড়ে ও শুকিয়ে বায়ুরুদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নভেম্বর মাসে সেচযুক্ত গম সারিতে বুনলে শতকে কী পরিমাণ বীজ দিতে হয়?

(ক) ২০০ গ্রাম (খ) ৩০০ গ্রাম

(গ) ৪০০ গ্রাম (ঘ) ৫০০ গ্রাম

২. গমের জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব কত?

(ক) ১০-১৫ সে.মি. (খ) ১৫-২০ সে.মি.

(গ) ২০-২৫ সে.মি. (ঘ) ২৫-৩০ সে.মি.

৩. সেচযুক্ত গমের জমিতে শতকে কী পরিমাণ ইউরিয়া দিতে হয়?

(ক) ১০০০ গ্রাম (খ) ১২০০ গ্রাম

(গ) ১৪০০ গ্রাম (ঘ) ১৬০০ গ্রাম

৪. গমের বীজ কী দিয়ে শোধন করতে হয়?

(ক) ডাইমেক্রন (খ) হিনোসান

(গ) নগস (ঘ) ভিটাভেক্স

৫. গম কোন সময় মাড়াই করতে হয়?

(ক) খুব ভোরে (খ) সকালে

(গ) দুপুরে (ঘ) বিকালে

পাঠ ২.৪ ভুট্টার পরিচিতি ও গুরুত্ব

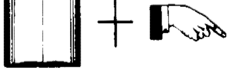

এ পাঠ শেষে আপনি

- ভুট্টা ফসল ও এর বিভিন্ন জাতের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- দানা ফসল হিসেবে বিশেষ করে বাংলাদেশে ভুট্টার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

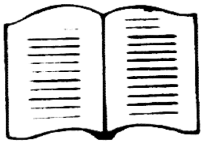

পৃথিবীতে ভুট্টা উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান দেশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও মেক্সিকো। বাংলাদেশে ভুট্টার চাষ এখনো সীমিত। ভুট্টার অনেকগুলো প্রজাতি ও উপপ্রজাতি রয়েছে। নিচে এসব উপপ্রজাতির পরিচয় উল্লেখ করা হলো।

১। ডেন্ট ভুট্টা (Dent) ঃ
ভুট্টা দানার উপরিভাগ দাঁতের মত খাঁজ কাটা।

২। ফ্লিন্ট ভুট্টা (Flint) ঃ
ভুট্টার পরিপক্ক দানার উপরিভাগ গোলাকার।

৩। মিষ্টি ভুট্টা (Sweet) ঃ
পুষ্ট দানা কিছুটা সংকুচিত, দানা মিষ্টি।

৪। খৈ ভুট্টা (Pop) ঃ
দানার আকার ছোট, খৈ তৈরি হয়।

৫। ময়দা ভুট্টা (Flour) ঃ
দানা নরম, শ্বেতসার দ্বারা গঠিত।

৬। মোম ভুট্টা (Waxy) ঃ
নরম, ভাংগার পর মোমের মত দেখায়।

৭। পড ভুট্টা (Pod) ঃ
দানা খোসা দ্বারা আবৃত, খাদ্য মান কম।

প্রজাতি	চাষ এলাকা	দানার রং	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
ডেন্ট ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	হলদে, সাদা, লাল	উপরিভাগ নরম, সংকুচিত
ফ্লিন্ট ভুট্টা	এশিয়া, ইউরোপ	সাদা, হলদে, লাল, নীল	গাছ ছোট, মোচা চিকন পোকা আক্রমণরোধী
মিষ্টি ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা	সাদা, হলদে	পুড়িয়ে খাওয়া যায়, গাছ মাঝারি
খৈ ভুট্টা	এশিয়া	সাদা, হলদে, লাল	গাছ ছোট
ময়দা ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	সাদা, নীল	আটা তৈরি করা যায়, গাছ মাঝারি
মোম ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	হলদে, লাল	দানায় খোসা আছে

ভুট্টার গুরুত্ব

বিশ্বে উৎপাদন ও ব্যবহারের বিবেচনায় ভুট্টা তৃতীয় দানা খাদ্য ফসল।

বিশ্বে উৎপাদন ও ব্যবহারের বিবেচনায় ভুট্টা তৃতীয় দানা খাদ্য ফসল। তবে বাংলাদেশে এর চাষ এখনো সীমিত যদিও এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার বাংলাদেশে ভুট্টা জনপ্রিয় হচ্ছে । নিচে বাংলাদেশে ভুট্টার গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো:

১। ভুট্টার দানা মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২। ভুট্টার গাছ ও পাতা পশু খাদ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ।
৩। ভুট্টার গাছ ও কব (পড়ন) কাগজ ও বোর্ডজাতীয় কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪। ভুট্টা থেকে তেল উৎপাদিত হয়। ভুট্টায় প্রায় ৩৫% তেল, ২০% আমিষ ও ১০% খনিজ দ্রব্য রয়েছে।

ভুট্টা থেকে তেল উৎপাদিত হয়। ভুট্টায় প্রায় ৩৫% তেল, ২০% আমিষ ও ১০% খনিজ দ্রব্য রয়েছে।

৫। হলদে ভুট্টায় প্রচুর ভিটামিন ’এ’ রয়েছে (প্রতি কেজিতে প্রায় ৫ মি.লি.)।
৬। ভুট্টা সারা বছর চাষ করা যায়।

৭। আন্ত ফসল হিসেবেও ভুট্টা চাষ করা যায়।

ভুট্টা আন্ত ফসলের উদাহরণ -

ক) মরিচ + ভুট্টা আন্ত ফসল

খ) মিষ্টি কুমড়া + ভুট্টা আন্ ফসল

গ) মিষ্টি আলু + ভুট্টা আন্ ফসল

ঘ) শীতকালীন সবজি + ভুট্টা আন্ ফসল

ঙ) আউশ + ভুট্টা আন্ত ফসল

৮। ভুট্টার বহু উচ্চ ফলনশীল জাত রয়েছে। সংকর ভুট্টা প্রতি শতক ৪০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৯। ভুট্টা গাছ মাটির গভীর থেকে পুষ্টিদ্রব্য শোষণ করে।

১০। ভুট্টা দিয়ে প্রায় ২০০ ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়।

১১। চর ও হাওড় এলাকার পতিত জমিতে চাষ করা যায়।

ভুট্টা দিয়ে প্রায় ২০০ ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়।

বাংলাদেশে ভুট্টার জাতসম হের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচিতি

জাতের নাম	উৎস	গাছের উচ্চতা (সে.মি.)	দানার রং	অন্যান্য বিবরণ
বর্ণালী	দেশী	১৮০	সোনালী	
শুভ্রা	দেশী	১৭০	সাদা	
সোয়ান ২	থাইল্যান্ড	১৬৫	হলদে	
খৈ ভুট্টা	দেশী	১১০	সোনালী	ছোট এবং শক্ত
মোহর	উদ্ভাবিত	১৯০	সোনালী	
পাহাড়ী	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১১০	মিশ্র	
সংকর		১৮০	সোনালী	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. খৈ ভুট্টার প্রধান চাষ এলাকা কোনটি?

ক) আমেরিকা খ) ইউরোপ

গ) আস্ট্রেলিয়া (ঘ) এশিয়া

২. শুভ্রা গাছের উচ্চতা কত?

ক) ১০০ সে.মি. খ) ১৪০ সে.মি.

গ) ১৭০ সে.মি. ঘ) ২৩০ সে.মি.

৩. বর্ণালী ভুট্টার রং কী?

ক) সোনালী খ) লাল

গ) মিশ্র বর্ণ ঘ) সাদা

৪. সোয়ান জাতের ভুট্টা কোথা থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?

ক) আমেরিকা খ) থাইল্যান্ড

গ) জাপান ঘ) ভারত

৫. কোন ভুট্টা জাতের গাছের উচ্চতা বেশি?

ক) সোয়ান খ) খৈ ভুট্টা

গ) পাহাড়ী ঘ) মোহর

পাঠ ২.৫ ভুট্টার চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- ভুট্টার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভুট্টা চাষের উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভুট্টা চাষের আধুনিক কলাকৌশলসমূহ নিম্নরূপ :

- জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ
- বীজ বপন
- সার প্রয়োগ ও পানি সেচ
- আগাছা, পোকা ও রোগ দমন
- ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

জমি নির্বাচন

ভুট্টা চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি ভাল। তবে শীতকালে চাষ করতে হলে কোন কোন মাঝারি নিচু জমিতেও এর চাষ করা যায়। পাহাড়ের ঢাল, উপত্যকা, পাদভূমিসহ ঈষৎ ক্ষারীয় জমিতেও ভুট্টা চাষ করা যায়।

ভুট্টা চাষের জন্য দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি ভাল। মাটির অম্লমান ৬.৫-৭.৫ উত্তম।

ভুট্টা চাষের জন্য দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি ভাল। মাটির অম্লমান ৬.৫-৭.৫ উত্তম।

সংকর জাতের ভুট্টা চাষ করে অধিক ফলন পেতে হলে জমি উচ্চ উর্বরতা সম্পূন্ন হওয়া দরকার। বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায়ই ভুট্টা চাষ করা যায়।

- **দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি**
- **সেচ সুবিধা থাকলে অন্যান্য মাটি**
- **চর ও হাওড় এলাকার উচুঁ স্থানের মাটি যা অক্টোবর মাসে শুকিয়ে যায়।**

জমি প্রস্তুতকরণ

জমিতে ৫-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ভুট্টার জমি তৈরি করতে হয়। মাটির ঢেলা গুঁড়া করে মাটি ঝুরঝুরে করা দরকার। মই দিয়ে জমি সমতল করতে হয়। জমিতে প্রয়োগের জন্য জৈব সার, ইউরিয়া

সারের অংশ বিশেষ, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও দস্তা সার জমির শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। জমির আগাছা মাটির সাথে এমনভাবে মিশিয়ে দিতে হয় যাতে তা পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। বড় আকারের আবর্জনা বেছে বাইরে ফেলে দিতে হয়।

জমির 'জো' অবস্থায় চাষ দিতে হবে এবং গভীরভাবে চাষ দিতে হবে।

জাত বাছাই

বছরব্যাপী চাষ করার জন্য ভূট্টার অনেক জাত রয়েছে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য, জীবনকাল ও ফলন এখানে দেওয়া হলো।

জাতের নাম	জীবনকাল (দিন)		ফলন, কেজি/শতক
	রবি	খরিপ	
বর্ণালী	১৩৫	১০০	২৩
শুভ্রা	১৪০	১০৫	২৫

সোয়ান ২	১৩৫	১০০	২০
খই ভুট্টা	১৩০	৯৫	১৭
মোহর	১৩০	১০০	২৭
আলাজুয়েলা	১১০	৯৫	১৬
সংকর	১৩৫	১০৫	৩৫

বীজ বপন

ভুট্টা বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব

ভুট্টা বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি.। বীজ হার প্রতি শতকে ৮০ গ্রাম। তবে গোখাদ্য হিসেবে চাষ করতে হলে বীজের পরিমাণ প্রতি শতকে ৩০০-৩৫০ গ্রাম দিতে হবে। বীজ বপণের প্রতিটি গর্তে ২টি করে বীজ দিতে হতে হবে। মাটি শুকনা হলে বীজ ৮ সে.মি. গভীরে এবং আর্দ্র হলে ৫ সে.মি. গভীরে বপন করতে হবে।

বীজ বপন সময়

ভুট্টা বীজ সারা বছরই বপন করা যায়। তবে বাংলাদেশে সাধারণত ৩টি মৌসুমে বীজ বপন করা হয়। যেমন-

ক)	রবি ভুট্টা	ঃ	নভেম্বর - ডিসেম্বর
খ)	গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা	ঃ	মার্চ - এপ্রিল (খরিপ-১)
গ)	বর্ষাকালীন ভুট্টা	ঃ	জুলাই-আগষ্ট (খরিপ-২)

বীজ শোধন

বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ বা ৩ গ্রাম থিরাম দ্বারা শোধন করে নিলে রোগের আক্রমণ কম হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ

সার প্রয়োগ

ভুট্টার পুষ্টি চাহিদা অনেক বেশি। তাই অধিক ফলন পেতে হলে ভুট্টার জমিতে সুষম সার দিতে হয়। প্রতি শতক জমিতে প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণঃ

ইউরিয়া	-	১ কেজি
টিএসপি	-	৫০০ গ্রাম
এম পি	-	৪০০ গ্রাম

এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ টিএসপি ও এমপি সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়ার অর্ধেক বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ৫০-৭০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের ইউরিয়া পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হয়।

লাল মাটি ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভুট্টার চাষ করতে হলে পটাশ সারের পরিমাণ ৪০০ গ্রামের বদলে ৬০০ গ্রাম দিতে হবে। মাটিতে সালফার ও দস্তার অভাব হলে প্রতি শতক জমিতে ৩০০ গ্রাম ও ৩০ গ্রাম যথাক্রমে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট দিতে হবে।

পানি সেচ

শুকনো মৌসুমে ভুট্টার চাষ করতে হলে ২-৩টি সেচ দিতে হয়। নিয়মিত বৃষ্টিপাত হলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

শুকনো মৌসুমে ভুট্টার চাষ করতে হলে ২-৩টি সেচ দিতে হয়। নিয়মিত বৃষ্টিপাত হলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভুট্টার জমিতে কোন অবস্থায়ই পানি জমে না থাকে।

ভুট্টায় পানি সেচ দিতে হলে প্রথম ও দ্বিতীয় বার ইউরিয়া পার্শ্ব প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া যায়। ভুট্টার মোচা (cob) তৈরি হওয়ার সময় আরেকবার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।

আগাছা, পোকা ও রোগ দমন

আগাছা দমন

ভুট্টার জমিতে প্রচুর আগাছা হয়। প্রধান প্রধান আগাছার মধ্যে রয়েছে দুধা, মুথা, আঙ্গুলী, চাপড়া, শ্যামা, কাকপারা, নুনিয়া, বথুয়া, হাতিশুঁড়, দন্ডকলস ইত্যাদি।

নিড়ানী দিয়ে ও ছোট কোদাল দিয়ে হাল্কাভাবে কুপিয়ে এসব আগাছা দমন করা যায়। ইউরিয়ার পার্শ্ব প্রয়োগ করার পূর্ব আগাছা দমন করতে হবে। তারপর সার দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়া নরম মনে হলে দুই সারির মাঝখানের মাটি দিয়ে গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে।

পোকা দমন

ভুট্টার প্রধান প্রধান পোকার মধ্যে রয়েছে

১) ভুট্টা মাজরা (Maize borer) *Ostrinia nubilis, Diatrasa grandiosella*
২) চিনচ বাগ (Chinch bug) *Blissus leucopterus*
৩) কাটুই পোকা (Cut worm)
৪) মোচা পোকা (Ear work) *Heliothis zea*
৫) জাব পোকা (Aphid) *Aphis spp.*

ভুট্টার এসব পোকা দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা, নাড়া পুড়ানোসহ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

রোগ দমন

ভুট্টার প্রধান প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে -

১) পাতা ধসা (Leaf blight)
২) পাতা দাগ (Leaf spot)
৩) ঝুল (Smut)
৪) ভাইরাস রোগ (Virus disease),

পাতা ফড়িং সংক্রমিত এসব রোগের কবল থেকে ভুট্টাকে রক্ষা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বীজ শোধন, সুষম সার প্রয়োগ ও রোগনাশক প্রয়োগ করতে হবে। রোগনাশকের মধ্যে রয়েছে টিল্ট, কুপ্রাভিট, ডাইথেন এম ৪৫, ভিটাভেক্স ও থিরাম।

পোকা ও রোগ দমনের জন্য	
কাটুই পোকা -	পানি সেচ, বিষটোপ, (বাসুডিন ১০ জি, ফুরাডান ৩জি বা ভার্সবান ২০ - ৫ মি.লি. ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ। এগ্রোথিয়ন ৫০, সুমিথিয়ন ৫০, ১০ লিটার
অন্যান্য পোকা-	পানি ৬-৮ মিলি হারে স্প্রে করা।
রোগ -	টিল্ট ২৫০ ০.০৫% হারে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করা।

ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

ভুট্টার ফসল সংগ্রহ কাজ ও সময় ভুট্টা চাষের উদ্দেশ্যের উপর নিভর করে। যেমন -

ক) **গো খাদ্য** ঃ গাছের কান্ড শক্ত হওয়ার আগেই ভুট্টা গাছ কেটে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। বীজ বপনের দুই আড়াই মাসের মধ্যে ফসল কাটা যায়।

খ) **পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য** ঃ মোচায় ভুট্টা দানা পুষ্ট হতে শুরু করলে মোচা সংগ্রহ করা যায়।

গ) **সবজি হিসেবে খাওয়ার জন্য** ঃ ভুট্টার মোচা তৈরি শুর€ হওয়ার পরপর ৪-৫ সে.মি. লম্বা মোচা সংগ্রহ করতে হয়।

ঘ) **দানা উৎপাদন** ঃ দানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য মোচা সম্ẑ র্ণ পরিপক্ক হওয়ার পর সংগ্রহ করতে হয়। মোচা সংগ্রহ করার পূর্বেই গাছের নিচের দিকের দুই একটি পাতা নিয়মিত কেটে পশুকে খাওয়ানো যায়।

ভুট্টার মোচা সংগ্রহের পর হাতের সাহায্যে, লাঠির সাহায্যে, গরু দ্বারা মাড়াই ও যন্ত্রের সাহায্যে মাড়াই করা যায়। ভুট্টার মোচা সংগ্রহের পর গাছের সবুজ পাতাগুলো গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। ভুট্টা মাড়াই করার পর তা রোদে ভালভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

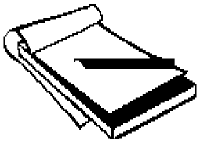

অনুশীলন (Activity): *কখন এবং কীভাবে ভূট্টার ফসল সংগ্রহ (Harvesting) করা হয় কারনসহ উল্লেখ করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কোন জাতের ভুট্টার ফলন সবচেয়ে বেশি?

ক) মোহর | খ) শুভ্রা

গ) খৈ ভুট্টা | ঘ) সংকর

২. রবি ভুট্টা কোন মাসে রোপণ করতে হয়?

ক) সেপ্টেম্বর | খ) নভেম্বর

গ) জানুয়ারি | ঘ) ফেব্রুয়ারি

৩. গো খাদ্য হিসেবে ভূট্টা চাষ করতে হলে প্রতি শতকে বীজহার কত?

ক) ১০০-১৫০ গ্রাম | খ) ২০০-২৫০ গ্রাম

গ) ৩০০-৩৫০ গ্রাম | ঘ) ৪০০-৪৫০ গ্রাম

৪. ভুট্টা জমিতে প্রতি শতকে কী পরিমাণ ইউরিয়া দিতে হয়?

ক) ৫০০ গ্রাম | খ) ১০০০ গ্রাম

গ) ১৫০০ গ্রাম | ঘ) ২০০০ গ্রাম

৫. শুকনা জমিতে কত সে.মি. গভীরতায় ভুট্টার বীজ বুনতে হয়?

ক) ৩ সে.মি. | খ) ৫ সে.মি.

গ) ৮ সে.মি. | ঘ) ১৩ সে.মি.

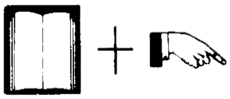

পাঠ ২.৬ কাউনের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- কাউনের পরিচিতি ও গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- কাউনের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

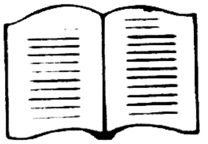

পরিচিতি

কাউনের ইংরেজি নাম Foxtail millet; বৈজ্ঞানিক নাম- *Setaria ital*রপধ। একে অনেক সময় *Panicum italicum* ও বলা হয়। কাউনের শীষ দেখতে শিয়ালের লেজের মত বলে এর ইংরেজী নাম ফক্সটেইল মিলেট। বর্তমানে জাপান, চীন, ভারত ও দক্ষিণ ইউরোপে কাউনের চাষ হয়ে থাকে। কাউনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

> কাউনের শীষ দেখতে শিয়ালের লেজের মত বলে এর ইংরেজী নাম ফক্সটেইল মিলেট।

ক্রোমোসম সংখ্যা	:	2n = ১৪
পরাগায়ন	:	স্বপরাগী (self pollinated)
জীবনকাল	:	এক বর্ষী
ফল	:	কেরিওপসিস

কান্ড ফাঁপা, পর্ব ভরাট, পত্র খোলের চেয়ে পত্র ফলক ছোট, গাছের উচ্চতা ১ মিটারের মত, কুশি উৎপাদন কম। দানার রং হলদে, কমলা, লাল, বাদামি ও কালচে হতে পারে।

কাউনের গুরুত্ব

বাংলাদেশে কাউন চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নরূপ কারণে কাউন বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দানা খাদ্য ফসলের দাবীদার:

১) বাংলাদেশে কাউনের অনেক জাত রয়েছে এসব জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সকল এলাকায় চাষ করা যায়।
২) বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল বুনটের সকল মাটিতে চাষ করা যায়।
৩) কাউনের আমিষের পরিমাণ বেশি; প্রায় ১৩%।
৪) কাউনের বহু ধরনের খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা যায়। যেমন ভাত, ক্ষির, পায়েশ, পিঠা ইত্যাদি।

কাউনের চাষ পদ্ধতি

জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমির দোআঁশ বুনটের মাটিতে কাউন চাষ করা যায়।

জাত মনোনয়ন

কাউনের বহু জাত রয়েছে। যেমন- শিবনগর (লাল ও সাদা) মগরা, অরজুনা, ইটালি ১ ভি-৮, জাপানি ইত্যাদি। এসব জাতের জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন। গাছের উচ্চতা ৯৫-১২০ সে.মি.। প্রতি শতকে ফলন ৪-৬ কেজি।

> *প্রতি শতকে ফলন ৪-৬ কেজি।*

জমি প্রস্তুত

জমিতে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ মই দিয়ে কাউনের জমি প্রস্তুত করতে হয়। জমি থেকে আবর্জনা ও

আগাছা অপসারণ করতে হবে। কাউনের বীজ খুব ছোট বলে যতদ র সম্ভব মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। জমি সমতল করতে হয় এবং পানি নিকাশের জন্য জমির ঢাল অনুসারে নালা কাটতে হয়।

সার প্রয়োগ

কাউন চাষ করে উক্ত ফলন পেতে হলে জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে সারের পরিমাণ ঃ

ইউরিয়া	-	২৫০ গ্রাম
টিএসপি	-	২৫০ ,,
এমপি	-	১২৫ ,,

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। তবে ১৩০ গ্রাম ইউরিয়া জমি প্রস্তুতের সময় দিয়ে বাকি ১২০ গ্রাম ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর প্রয়োগ করা ভাল।

বীজ হার

সারি থেকে সারির দ রত্ব ২০-২৫ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২-৩

কাউন ছিটিয়ে বপন করা যায় এবং সারিতেও বপন করা যায়। ছিটিয়ে বীজ বপন করলে প্রতি শতকে ৩০-৪০ গ্রাম এবং সারিতে বপন করলে প্রতি শতকে ২৫-৩০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। সারি থেকে সারির দ রত্ব ২০-২৫ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দ রত্ব ২-৩ সে.মি.।

আগাছা দমন

কাউনের জমিতে চারা অবস্থায় প্রচুর আগাছা জন্মে। প্রধান প্রধান আগাছার মধ্যে রয়েছে দুধা, মুথা, আঙ্গুলী, শ্যামা ইত্যাদি। আগাছা বেশি হলে অর্থাৎ গাছ ৮-১০ সে.মি. হলে জমি নিড়ানী দেওয়া দরকার।

পানি সেচ ও নিকাশ

কাউনের জমিতে পানি সেচ দিতে পারলে ভাল। তবে অতি বৃষ্টিতে জমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

কাউনে পোকার আক্রমণ কম। তবে পাতায় দাগ ও বীজ পচা জাতীয় কিছু কিছু রোগ হয়ে থাকে।

জমিতে পোকা ও রোগ দেখা দিলে কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশক্রমে নিয়ন্ ণের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফসল কাটা ও মাড়াই

কাউন গাছ শীষ আসার ২০-২৫ দিনের মধ্যে পেকে যায়। কাউনের দানা কামড় দিলে কট করে আওয়াজ হলে বুঝতে হবে দানা পরিপক্ক হয়েছে।

ফসল সংগ্রহের পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গর€ দিয়ে কাউন মাড়াই করা যায়। মাড়াই করার পর কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে ঝেড়ে সংরক্ষণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কাউনের ক্রোমোসম সংখ্যা কত?

ক) 2n=৮ খ) 2n = ১৪

গ) 2n = ১৬ ঘ) 2n = ২২

২. শীষ আসার পর কাউনের দানা কত দিনে পরিপক্ক হয়?

ক) ১০-১৫ দিন খ) ১৫-২০ দিন

গ) ২০-২৫ দিন ঘ) ২৫-৩০ দিন

৩. কাউনের জমিতে প্রতি শতকে কতটুকু ইউরিয়া দিতে হয়?

ক) ১৫০ গ্রাম খ) ২৫০ গ্রাম

গ) ৩৫০ গ্রাম ঘ) ৪৫০ গ্রাম

৪. কাউন গাছের উচ্চতা কত (প্রায়)?

ক) ৬০ সে.মি. খ) ৮০ সে.মি.

গ) ১০০ সে. মি. ঘ) ১৩০ সে.মি.

৫. কাউনে আমিষের পরিমাণ কত % ?

ক) ৯% খ) ১৩%

গ) ১৭% ঘ) ২১%

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৭ গম ক্ষেতে আগাছা দমন ও সার প্রয়োগ

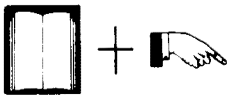

এ পাঠ শেষে আপনি

- গমের জমিতে আগাছা বাছাই করতে পারবেন।
- গমের জমিতে সার প্রয়োগ করতে পারবেন।

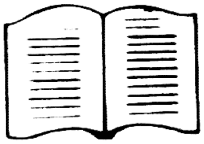

উপকরণ

১) নিড়ানী, ছোট কোদাল (হাত কোদালী)
২) ঝুড়ি
৩) সার দ্রব্য
৪) নিক্তি

কাজের ধাপ

১) নির্বাচিত জমিতে নিড়ানী দিয়ে আগাছা বাছাই করুন।
২) নির্ধারিত হারে সার পরিমাপ করে জমিতে প্রয়োগ করুন।

পরীক্ষার ফলাফল ছক

১) জমির প্রধান প্রধান আগাছাগুলোর নাম লিখুন।
২) জমিতে ব্যবহাররের জন্য নির্ণয় করা সারের পরিমাণ লিখুন।

1. গমের উৎপত্তি ও উপপ্রজাতিসমূহের বিবরণ দিন।

2. বাংলাদেশে গমের জাতসম হের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

3. বাংলাদেশে গম চাষের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

4. গমের মূল উৎপত্তি কোথায়?

5. গমের প্রধান উপ-প্রজাতিগুলোর নাম লিখুন।

6. সোনালিকা গম বাংলাদেশের কোথায় ভাল জন্মে ?

7. চিত্রসহ গম গাছের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করুন।

8. চিত্রসহ গমের বৃদ্ধি পর্যায়সম হ আলোচনা করুন।

9. গমের যে কোন ৩টি বৃদ্ধি পর্যায় বিস্তারিত উল্লেখ করন।

10. গমের চারা পর্যায় বর্ণনা করুন।

11. গমের বাড়ন্ত পর্যায়ে কী কী পরিচর্যা করতে হয়?

12. গমের থোড় পর্যায়ে কী কী প্রক্রিয়া চালু থাকে?

13. গমের চাষে জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ বিষয়াবলী আলোচনা করুন।

14. গমের জমিতে আগাছা, পোকা ও রোগ দমন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

15. গমের জমিতে কখন ও কীভাবে সার দিতে হয়?

16. গম চাষের প্রধান প্রধান ধাপগুলো কী কী?

17. গমের জমিতে কয় কিস্তি তে সার ও পানি সেচ দিতে হয়?

18. গমের পোকার ও রোগের নাম লিখুন।

19. বাংলাদেশে ভুট্টার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

20. ভুট্টার উপ-প্রজাতিসমূহ বর্ণনা করুন।

21. বাংলাদেশের ভুট্টার জাতসমূহের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচিতি দিন।

22. ভুট্টার ৫টি প্রধান গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

23. মিষ্টি ভুট্টার পরিচয় ও ব্যবহার লিখুন।

24. পশু খাদ্য হিসেবে ভুট্টা চাষের বৈশিষ্ট্য কী?

25. ভুট্টার জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত কীভাবে করতে হয়?

26. ভুট্টার জমিতে আগাছা, পোকা ও রোগ দমন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

27. ভুট্টার জমিতে সার প্রয়োগ ও পানি সেচ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

28. ভুট্টা চাষের প্রধান প্রধান ধাপ কী কী?

29. ভুট্টার ৩টি করে পোকা ও রোগের নাম লিখুন।

30. ভুট্টার ৫টি জাতের নাম ও ফলন উল্লেখ করুন।

31.কাউনের পরিচিতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

32.সংক্ষেপে কাউন চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

33.কাউন চাষে জমি প্রস্তুত পদ্ধতি, সার প্রয়োগ ও বীজ হার উল্লেখ করুন।

34.কাউনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় কী?

35.কাউনের প্রধান জাতগুলোর নাম লিখুন।

36.কাউনে কী পরিমাণ সার ব্যবহার করতে হয়?

উত্তরমালা

পাঠ ২.১

১। গ, ২। গ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। গ

পাঠ ২.২

১। গ, ২। গ, ৩। খ, ৪। ক

পাঠ ২.৩

১। গ, ২। গ, ৩। খ, ৪। ঘ, ৫। গ

পাঠ ২.৪

১। ঘ, ২। গ, ৩। ক, ৪। খ, ৫। ঘ

পাঠ ২.৫

১। ঘ, ২। খ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। গ

পাঠ ২.৬

১। খ, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। খ

ইউনিট ৩ ডাল চাষাবাদ

ইউনিট ৩ ডাল চাষাবাদ

বাংলাদেশের কৃষিতে ডালজাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এজাতীয় ফসল এদেশের মানুষ, পশুসম্পদ এবং মাটির পুষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ফসলের ফলন তুলনামুলকভাবে উচ্চ ফলনশীল ধান এবং গমের চেয়ে কম। তাই ডাল ফসলের আবাদ বোরো ধান এবং গমের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। উপযুক্ত উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এসব ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরী। এ ইউনিটে বিভিন্ন ডাল ফসলের পরিচিতি, পুষ্টিমান এবং উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ ডাল ফসলের সাধারণ পরিচিতি ও শ্রেণিবিভাগ

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে বিভিন্ন ডালজাতীয় ফসলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ডালজাতীয় ফসলের ঋতুভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডালজাতীয় ফসলের ফলন উল্লেখ করতে পারবেন।
- ডালজাতীয় ফসলের বাংলা, ইংরেজি এবং বৈজ্ঞানিক নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।

ডাল ফসলের জমি ও উৎপাদন এলাকা

এদেশে ডাল ফসলের মোট জমির পরিমাণ ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ০.৫২ মিলিয়ন টন।

আবহমান কাল হতে বাংলাদেশের কৃষিতে ডাল ফসল বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশে ডাল ফসলের মোট জমির পরিমাণ ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ০.৫২ মিলিয়ন টন (সারণী - ২)। ডাল ফসলের মোট জমি এবং উৎপাদনের শতকরা ৬১ ভাগই ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল, পটুয়াখালি, কুষ্টিয়া এবং খুলনা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই ডাল শস্যের আবাদ করা সম্ভব তবে বেলে-দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটিই এদের চাষের জন্য সর্বোত্তম। গত তিন দশক যাবত উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো ধান এবং গম উদ্ভাবনের সাথে সাথে এবং অধিক জমি সেচের আওতায় আসার কারণে কৃষকগন ডালের পরিবর্তে ধান ও গম চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছে। ফলে ডাল ফসল চাষের জমি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া ডাল ফসল সহজাতভাবে কম ফলনশীল এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনায় তেমন সাড়া দেয় না। তাই দিন দিন এদেশে ডাল ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং দেশ আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে। উপযুক্ত কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ডাল ফসল উদ্ভাবন এবং উন্নত চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে এজাতীয় ফসলের ফলন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ডাল ফসলের শ্রেণিবিন্যাস

ডাল লিগিউমজাতীয় ফসল। পেপিলিওনেসী উপ-পরিবারের প্রধান ১০-১২ টি গণের অন্তঃতঃ শতাধিক প্রজাতি ডাল ফসল হিসেবে সারা বিশ্বে চাষাবাদ হচ্ছে।

ডাল লিগিউমজাতীয় ফসল। পেপিলিওনেসী উপ-পরিবারের প্রধান ১০-১২ টি গণের অন্ তঃ শতাধিক প্রজাতি ডাল ফসল হিসেবে সারা বিশ্বে চাষাবাদ হচ্ছে। স্মরনাতীত কাল হতে বাংলাদেশে ডালজাতীয় ফসল যথা খেসারী, মসুর, ছোলা, মাস, মুগ, মটর, গোসীম (cow pea) ইত্যাদির চাষ হচ্ছে(সারণী - ১)। এই সমস্ত কলাই এর মধ্যে খেসারী, মসুর, ছোলা, মটর এবং গোসীম শীতকালীন ফসল হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে মাস এবং মুগ ডাল গ্রীস্মকালে চাষ হয়। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত ডালশস্যের শতকরা ৮৩ ভাগই শীতকালীন ফসল। দেশের উত্তরাঞ্চলে মুগ এবং মাস কলাই খরিপ - ২ মৌসুমে বপন করা হয় (আগষ্ট মাসে বপন করে অক্টোবর মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়)। শতকরা ১২ ভাগ উৎপাদিত হয় এই খরিপ - ২ মৌসুমে। দক্ষিণাঞ্চলে মুগ খরিপ - ১ মৌসুমে আবাদ করা হয় (জানুয়ারী মাসের শেষে বপন করে মার্চ মাসে ফসল তোলা হয়)। জমির পরিমান এবং উৎপাদনের দিক থেকে খেসারী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হচ্ছে যথাক্রমে মসুর এবং ছোলা (সারণী - ২)। ডাল শস্য সহজাতভাবে কম ফলনশীল এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনায় তেমন সাড়া দেয় না। তাই এদেশে ডাল শস্যের উৎপাদন-ক্ষমতা দিন দিন কমছে। আমাদের দেশে ডাল শস্য ঐ জমিতেই আবাদ করা হয় যেখানে স্বল্প ব্যবস্থাপনায় চাষ করা সম্ভব এবং অন্য কোন লাভজনক ফসলের চাষ করার সম্ভাবনা নেই। কৃষি গবেষকগণ কিছু নুতন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করায় ডালশস্য চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও উৎপাদন স্থিতিশীল রয়েছে।

সারণী ১ : বাংলাদেশের চাষকৃত ডাল ফসলের বাংলা, ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম

বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
খেসারী	Grass Pea	*Lathyrus sativus* L
মসুর	Lentil	*Lens culinaris* Medic
বুট, ছোলা	Gram, Chick Pea	*Cicer arietinum* L.

মাসকলাই	Black Gram	*Vigna mungo* L.
মুগ	Green Gram, Golden Gram	*Vigna radiata* (L) Wilezek
মটর	Field Pea, Garden Pea	*Pisum sativum* L.
অড়হর	Pigeon Pea, Red gram	*Cajanus cajan* L.
গোসীম	Cow Pea, China Pea	*Vigna unguiculata* (L) Walp
সয়াবিন	Soybean, Golden Pea	*Glycine max* (L) Merr.
শিম	Country bean	*Dolichos lablab* L.
বরবটি	Yard Long bean	*Vigna sinensis* L.
কামরাঙ্গা শিম	Winged bean	*Psophocarpus tetragonolobus* (L) DC

বাংলাদেশে ডাল হিসেবে খেসারী, মসুর, ছোলা, মাস ও মুগ গুরুত্বপূর্ণ এবং মটর, অড়হর, গোশিম, সয়াবীন ইত্যাদি নগন্য পর্যায়ে রয়েছে।

আবহাওয়া ও মাটি ভেদে জাত ও প্রজাতি ভিন্ন হওয়া এবং স্থানভেদে এদের নামে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় সকল ডাল ফসলের সাথে সুষ্ঠু পরিচিতি লাভ করা একটু কঠিন। বাংলাদেশে ডাল হিসেবে খেসারী, মসুর, ছোলা, মাস ও মুগ গুরুত্বপূর্ণ এবং মটর, অড়হর, গোশিম, সয়াবীন ইত্যাদি নগন্য পর্যায়ে রয়েছে। আর শিম, বরবটি ও কামরাঙ্গা শিম প্রধানতঃ সবজী এবং সয়াবীন তৈল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সারণী ২: বিভিন্ন ডালশস্যের জাতীয় ফলন, উন্নত প্রযুক্তির ফলন এবং প্রত্যাশিত উৎপাদন

ডাল শস্য	আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর)	জাতীয় ফলন (কেজি/হেক্টর)	উন্নত প্রযুক্তির ফলন		প্রত্যাশিত উৎপাদন (টন)
			গবেষণা কেন্দ্রে (কেজি/হেঃ)	কৃষকের মাঠে (কেজি/হেঃ)	
খেসারী	২৩৯৩৪৩	৭২৮	১৪০০	১২০০	২৮৭২১২
মসুর	২১১৯২৭	৭৩৮	১৫০০	১৩৫০	২৮৬১০১
ছোলা	৯৯৫৪৩	৬৯৬	১৪২০	১২৩০	১২২৪৩৮
মাসকলাই	৬৯২০২	৭৩৬	১৫০০	১২০০	৮৩০৪২
মুগ	৫৮৩৮৮	৫৪০	১২০০	১০০০	৫৮৩৮৮
মটর	১৮৮৬০	৭০৮	-	-	১৩৩৫১
অড়হড়	৫৫৮৪	৫৮২	-	-	৩২৪৮
ফেলন/গোমটর	১১১৩১	৬৩০	১৪০০	১২০০	১৩৩৫৭
অন্যান্য	১৯০৭১	৬১৬	-	-	১১৭৫৭
মোট	৭৩৩০৪৯				৮৭৮৮৯৪

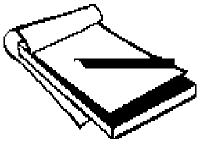

অনুশীলন (Activity): *আপনার নিজ জেলায় চাষকৃত ডালফসলসম হের বাংলা, ইংরেজী ও বৈজ্ঞানিক নাম, আবাদী জমির পরিমান এবং ফলন কেজি/হেক্টর উল্লেখ করুন। আপনার এলাকায় ফলনের সাথে জাতীয় ফলনের তুলনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। মসুর ও ছোলা কোন মৌসুমে আবাদ করা হয়?

ক) শীত খ) গ্রীষ্ম

গ) খরিফ - ১ ঘ) খরিফ - ২

২। ডালজাতীয় ফসল কোন পরিবারভূক্ত উদ্ভিদ?

ক) লিগিউম পরিবারভূক্ত খ) সোলানেসি পরিবারভূক্ত

গ) কম্পোজিটি পরিবারভূক্ত গ) লিলিয়েসি পরিবারভূক্ত

৩। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত ডাল শস্যের শতকরা কতভাগ শীতকালে উৎপাদিত হয়?

ক) শতকরা ৫০ ভাগ খ) শতকরা ৭৫ ভাগ

গ) শতকরা ৮৩ ভাগ ঘ) শতকরা ৯০ ভাগ

৪। বাংলাদেশে মোট ডাল শস্যের জমির পরিমান কত?

ক) ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর খ) ০.৫০ মিলিয়ন হেক্টর

গ) ০.৭৫ মিলিয়ন হেক্টর ঘ) ০.৪০ মিলিয়ন হেক্টর

৫। বাংলাদেশে ডাল জাতীয় ফসলের মোট উৎপাদন কত?

ক) ০.৬০ মিলিয়ন মেট্রিক টন খ) ০.৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন

গ) ০.৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টনঘ) ০.২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন

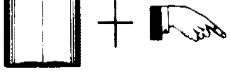

পাঠ ৩.২ ডাল ফসলের পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি

- খাদ্য তালিকায় ডালের চাহিদা এবং এদেশে ডাল উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে পারবেন।
- স্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্ভিদ আমিষের ভূমিকা এবং গুর€ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে ডালজাতীয় ফসল চাষের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাল ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

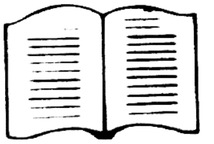

এদেশে ডালের উৎপাদন ০.৫২ মিলিয়ন টন থেকে বর্ধিত করে কমপক্ষে ১.৮১ মিলিয়ন টন করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১১০ মিলিয়ন। বাংলাদেশ পুষ্টি এবং খাদ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন গড়ে ১১২ গ্রাম ডালশস্য গ্রহণ করা উচিত। এই হিসেবে আমাদের বৎসরে ৪.৫ মিলিয়ন টন ডালশস্যের প্রয়োজন। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সুষম খাদ্য তালিকায় প্রতিটি মানুষের দৈনিক ৫৮ গ্রাম ডালশস্য থাকা দরকার। এই মোতাবেক আমাদের বৎসরে ২.৩ মিলিয়ন টন ডালশস্য প্রয়োজন। আমরা যদি জন প্রতি প্রতিদিন সর্বনি¤œ প্রয়োজনীয় ডালশস্যের পরিমান ৪৫ গ্রাম গ্রহণ করি তাহলে ১১০ মিলিয়ন মানুষের জন্য প্রয়োজন ১.৮১ মিলিয়ন টন ডালশস্য। অথচ ১৯৮৯-৯০ সালে আমাদের ডালশস্যের উৎপাদন ছিল ০.৫২ মিলিয়ন টন। অতএব এদেশে ডালের উৎপাদন ০.৫২ মিলিয়ন টন থেকে বর্ধিত করে কমপক্ষে ১.৮১ মিলিয়ন টন করতে হবে।

ডাল ফসলের পুষ্টিমান

একজন মানুষের জন্য প্রতিদিন গড়পরতা ২৩০০ কিলো ক্যালোরী শক্তি প্রয়োজন। সাধারনতঃ দানা ও শর্করা জাতীয় খাদ্য, ডালশস্য, সবজী, ফল, তৈলজাতীয় খাদ্য এবং প্রাণিজ খাদ্য এ শক্তি যোগায়।

একজন মানুষের জন্য প্রতিদিন গড়পরতা ২৩০০ কিলো ক্যালোরী শক্তি প্রয়োজন। সাধারনতঃ দানা ও শর্করা জাতীয় খাদ্য, ডালশস্য, সবজী, ফল, তৈলজাতীয় খাদ্য এবং প্রাণিজ খাদ্য এ শক্তি যোগায়। আমিষ খাদ্য সাধারণত দুটি উৎস থেকে মানুষ গ্রহন করে- একটি উদ্ভিদ জাত এবং অন্যটি প্রাণিজ। প্রাণিজ আমিষের উৎস মাংস এবং ডিমের দাম বেশি বলে এদেশের সাধারণ গরীব মানুষ তা ক্রয় করতে পারে না অপরদিকে এদেশের সাধারণ মানুষ তুলনাম লকবাবে সস্তায় ডাল ক্রয় করতে পারে এবং তা খেতেও তারা অভ্যস্ত । উদ্ভিদ জাত আমিষের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ডালশস্য থেকেই আসে। তাই অধিকাংশ সাধারণ মানুষ আমিষ খাদ্যের ঘাটতি এই ডালশস্য থেকেই পুরণ করে থাকে বলে ডালকে গরীবের মাংস বলা হয়। আমিষের উদ্ভিদ জাত খাদ্যের প্রধান উৎস ডালে অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড লাইসিন বেশি পরিমাণে থাকে কিন্তু মেথিওনিন এবং সিস্টিন -এর ঘাটতি থাকে। অন্যদিকে চালে মেথিওনিন এবং সিস্টিনের পরিমাণ বেশি এবং লাইসিনের পরিমান পর্যাপ্ত থাকে বিধায় পুষ্টি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ডাল-ভাত বা ডাল-রুটি খাদ্য হিসেবে বেশ সমন্বিত বলা যায়।

সারণী ৩: ডালজাতীয় ফসলের পুষ্টিমান (খাবারযোগ্য প্রতি ১০০ গ্রামে)

ডাল - জাতীয় ফসল	ক্যালরী	আমিষ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	লৌহ (মিঃগ্রাঃ)	থায়ামিন (মিঃগ্রাঃ)	জলীয় অংশ (গ্রাম)
খেসারী	৩৪৫	২৮.২০	৫৬.৬	০.৬	৬.৩	০.৩৯	১০.০
মসুর	৩৪৩	২৫.১০	৫৯.০	০.৭	৪.৮	০.৪৫	১২.৪
ছোলা	৩৭২	২০.০৮	৫৯.৮	৫.৬	৯.১	০.৪৮	৯.৯
মাসকলাই	৩৪৭	২৪.০০	৫৯.৬	১.৪	৯.১	০.৪২	১০.৯
মুগ	৩৩৪	২৪.০০	৫৬.৭	১.৩	৭.৩	০.৪৭	১০.১
মটর	৩১৫	১৯.৭০	৫৬.৫	১.১	৫.১	০.৪৭	১৬.০
অড়হর	৩৩৫	২২.৩০	৫৭.৬	১.৭	৫.৮	০.৪৫	১৩.৪
সীম	৩৪৭	২৪.৯০	৬০.১	০.৮	২.৭	০.৫২	৯.৬

চালের চেয়ে ডালে আমিষের পরিমান প্রায় ৩ গুণ বেশি এবং প্রায় সবটুকুই আহারোপযোগী।

চালের চেয়ে ডালে আমিষের পরিমান প্রায় ৩ গুণ বেশি এবং প্রায় সবটুকুই আহারোপযোগী। তবে ডালের প্রকার অনুযায়ী কিছুটা কম বেশি হয়, যেমন ছোলা ও মটরে ১৯-২০%, মাস, মুগ ও মসুরে ২৪-২৫%, খেসারীতে ২৮%, সয়াবীন ৪৩%, অন্যদিকে চালে ৮-৯% এবং গমে ১২-১৪% (সারণী-৩)। এ ছাড়া চালের চেয়ে ডালে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ ৩-৪ গুণ বেশি, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ও লৌহের পরিমাণ। ডালে থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন ও ফলিক এসিডের পরিমান চালের থেকে বেশি। ডালে শর্করার পরিমাণও উলে-খযোগ্য এবং শর্করা সহজপাচ্য এবং দ্রবনীয়।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ডাল ফসলের গুরুত্ব

ডাল ফসল জমিতে জৈব সার এবং নাইট্রোজেন সরবরাহ করে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

ডাল ফসল জমিতে জৈব সার এবং নাইট্রোজেন সরবরাহ করে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ডাল ফসল ধান, গম বা আখের সংগে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা সম্ভব। ডাল চাষের জন্য উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম এবং এতে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম। ডালের উপজাতগুলো যেমন ভূষি উত্তম পশুখাদ্য। বিভিন্ন ডালশস্যের চাষে রাইজোবিয়াম কালচার প্রয়োগে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমান বাড়ে। যেমন, মটর চাষে জমিতে নাইট্রোজেন বাড়ে হেক্টর প্রতি ৫০-৬২.৫ কেজি, ছোলাতে হেক্টর প্রতি ৭৫-৯৫ কেজি, মসুরে হেক্টর প্রতি ৭৫-৯৫ কেজি, মুগে হেক্টর প্রতি ২৫-৬৩ কেজি, বরবটি ও অড়হরে হেক্টর প্রতি ১২৫-২৫৫ কেজি। সুতরাং শস্য পর্যায়ে ডালশস্য জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ডালজাতীয় ফসল অল্প খরচে একযোগে মানুষ ও পশু-প্রাণীর পুষ্টি সরবরাহ এবং জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এদেশের সাধারণ গরীব মানুষের পক্ষে প্রাণিজ আমিষের উৎস মাছ এবং মাংস ক্রয় করা বেশ ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। অপরদিকে তুলনাম লকভাবে ডাল ফসলের ম ল্য কম এবং সহজলভ্য। তাই সাধারণ গরীব মানুষ তাদের আমিষ ঘাটতি ডাল হতে পুষিয়ে নিতে পারে বলে ডালকে গরীবের মাংস বলা হয়। ডাল ফসলের ভূষি উত্তম পশু খাবার। অল্প খরচে এদেশের গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ডাল ফসল বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি বছর ডাল ফসল হাজার হাজার টন বায়বীয় নাইট্রোজেন জমিতে যোগ করে যা অন্যান্য ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। এতে কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সুষম খাদ্য তালিকায় একজন মানুষের দৈনিক খাদ্য তালিকায় কত গ্রাম ডালশস্য থাকা দরকার?

ক) ৬০ গ্রাম খ) ৪৫ গ্রাম

গ) ৫৮ গ্রাম ঘ) ৪০ গ্রাম

২। আমাদের খাদ্য তালিকায় দৈনিক সর্বনিু কত গ্রাম ডাল শস্য থাকা দরকার?

ক) ৫০ গ্রাম খ) ৪০ গ্রাম

গ) ৪৫ গ্রাম ঘ) ৩৫ গ্রাম

৩। ডাল হতে আমরা কোন জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকি?

ক) সিষ্টিন খ) মেথিওনিন

গ) লাইসিন ঘ) ভ্যালিন

৪। কোন ডালে সবচেয়ে বেশি আমিষ থাকে?

ক) ছোলা খ) মসুর

গ) মুগ ঘ) খেসারী

৫। ডাল ফসল মাটিতে কোনজাতীয় সারের পরিমাণ বাড়ায়?

ক) ফসফরাস খ) নাইট্রোজেন

গ) পটাশ ঘ) দস্তা

পাঠ ৩.৩ ডালজাতীয় ফসলের জন্য সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি

- বিভিন্ন ডাল শস্যের জন্য সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার ও সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে ডাল শস্যের ফলন বৃদ্ধির কলাকৌশল উল্লেখ করতে পারবেন।
- ডাল শস্য উৎপাদনে ইনোকুলাম ব্যবহার করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সার ব্যবস্থাপনা

দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে প্রায় সকল প্রকার ডালশস্য ভাল ভাবে চাষ করা যায়। এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ছোলা ও মুগ ডাল ভাল জন্মে। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশ ও ফসফেটসমৃদ্ধ সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতে (পি,এইচ ৬.৫) সকল প্রকার ডালশস্য ভাল ফলন দেয়। পলি মাটি এলাকায় ফসফেট ও পটাসসমৃদ্ধ রসযুক্ত মাটিতে বিনা সেচে ছোলা, মসুর, মুগ, খেসারী, মটর প্রভৃতি শস্যের চাষ করা যায়। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সকল প্রকার ডালশস্যের জন্য নিম্নে তালিকা অনুসারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে (সারণী - ৪)।

দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে প্রায় সকল প্রকার ডালশস্য ভাল ভাবে চাষ করা যায়।

সারণী ৪: ডাল শস্যের জন্য সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটির উর্বরতার মান	রাসায়নিক সার (কেজি/হেক্টর)			প্রয়োগ পদ্ধতি
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)	
অতি উচ্চ	০	২০	০	নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের সম্পর্ণ পরিমাণ মূল সার হিসেবে জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে।
উচ্চ	০	৩০	০	
মধ্যম	১০	৪০	০	
মধ্য নিম্ন	১০	৫০	০	
নিম্ন	২০	৬০	২০	
অতি নিম্ন	২০	৭০	২০	

ইনোকুলাম (Inoculum) মিশিয়ে বীজ বপন করা হলে জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সারগুলোকে একত্রে মিশিয়ে শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন ডালশস্যের জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগের নিম্নরূপ সুপারিশ করেছে (সারণী - ৫)।

সারণী ৫: ডালশস্যে রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণ

ডাল	রাসায়নিক সার (কেজি/হেক্টর)		
	ইউরিয়া	টি.এস.পি	এম.পি
মসুর	৮০	২৫০	৬২
ছোলা	৮০	১৩০	৬০
খেসারী	৮০	১৩০	৫০
মুগ	৮০	১৩০	৫০
মাসকলাই	৮০	১৩০	৫০

সারণী ৬: ডাল শস্যে জীবাণুসার প্রয়োগের পরিমাণ

ডাল	জীবাণুসারের পরিমাণ (গ্রাম/প্রতি কেজি বীজে)	প্রয়োগ পদ্ধতি
মসুর	৭০	জীবাণু সার বীজের সংগে একত্রে মিশিয়ে বীজ বপন করতে হয়।
ছোলা	১০০	
মাসকলাই	৯০	
মুগ	৯০	

সেচ ব্যবস্থাপনা

কোন কোন ডাল শস্য মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

এদেশে বেশিরভাগ ডাল ফসল বর্ষার পানি সরে যাওয়ার পর জমির স্বাভাবিক রসেই চাষ করা হয়। তাছাড়া অধিকাংশ ডাল ফসলই স্বভাবজাত কারণেই জমিতে বেশি রস সহ্য করতে পারে না। তাই সাধারণত বিনা সেচেই ডাল ফসলের চাষ করা হয়। তবে জমিতে রসের অভাব হলে বীজ বোনার এক সপ্তাহ পূর্বে জমিতে সেচ দিয়ে জমির 'জো' এলেই জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে (যদি জমিতে রস না থাকে সে ক্ষেত্রে)। পরবর্তী সময়ে জমিতে ২-১ বার সেচের প্রয়োজন হতে পারে বিশেষ করে গুটিগুলোর যথাযথ পুষ্টির জন্য মাটিতে বেশ রস থাকা দরকার। ডাল ফসলের জমিতে সেচ খুব পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। সেচের অতিরিক্ত পানি অবশ্যই জমি হতে বের করে দিতে হবে। কোন কোন ডাল শস্য মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। ভারী মাটিতে সাধারনত সেচের প্রয়োজন হয় না।

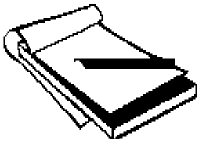

অনুশীলন (Activity): *ডালফসলে সার ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ডাল ফসলের চাষ করতে কোন সার বেশি পরিমাণে দরকার?

ক) ইউরিয়া খ) টি,এস,পি

গ) এম,পি ঘ) সবুজ সার

২। ইনোকুলাম ব্যবহার করলে কোন সার জমিতে আর ব্যবহার করতে হয় না?

ক) টি,এস,পি খ) ইউরিয়া

গ) এম,পি ঘ) এস,এস,পি

৩। কোন ধরনের জমিতে ছোলার চাষ ভাল হয়?

ক) দোআঁশ খ) পলি দোআঁশ

গ) এঁটেল দোআঁশ ঘ) বেলে

পাঠ ৩.৪ মসুর ডালের চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- মসুর চাষের মৌসুম এবং উপযুক্ত জমি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মসুর চাষের জন্য জমি নির্বাচন এবং তৈরি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জমিতে মসুর ফসলের যাবতীয় পরিচর্যা সম্পর্কীত কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

মাটি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ এবং এঁটেল দোআঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য উপযোগী। মাটির অম্লমান (পি,এইচ) ৬.৫-৭.৫ এর মধ্যে হলে ভাল হয়। মসুর খরা সহিলষ্ণু ফসল এবং বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় ভাল জন্মে। জলবায়ুগত বিচারে রবি মৌসুম বাংলাদেশে মসুর চাষ করার উপযোগী। মধ্য অক্টোবর থেকেই এর বপন কাজ শুরু হয় এবং মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। মসুর বীজ যথাসময়ে বপন না করলে ফলন বেশ কমে যায়।

মধ্য অক্টোবর থেকেই এর বপন কাজ শুরু হয় এবং মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

জাত

"উৎফলা" (এল-৫) একটি অনুমোদিত জাত।

জমি তৈরি

মসুরের বীজ আকারে ছোট বলে জমি বেশ ঝুরঝুরে এবং নরম করে তৈরি হয়। আগাম জাতের ধান বা পাট কেটে নেওয়ার পরে জো আসলে জমিতে ৩-৪ বার সোজাসুজি ও আড়াআড়ি ভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। পলি মাটিতে বর্ষার পানি চলে যাওয়ার পর বিনা সেচেও মসুরের চাষ করা যায়। মসুর গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বলে জমি তৈরির সময়ই নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

মসুরের বীজ আকারে ছোট বলে জমি বেশ ঝুরঝুরে এবং নরম করে তৈরি হয়।

সার প্রয়োগ

নদীর অববাহিকা অঞ্চলের পলি মাটি স্বভাবতই উর্বর বলে এরূপ জমিতে মসুর চাষ করতে জৈব সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য অঞ্চলের বেলে দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৫-৭ টন খামারে পচানো সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া হেক্টর প্রতি ৬৬-৮৮ কেজি ইউরিয়া এবং ১৮৮-২৫০ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট (SSP) প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। শেষ চাষের সময় এসব সার জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

মাটিতে সামান্য পরিমাণ কোবাল্ট ও মলিবডেনাম নামক গৌণ খাদ্যোপাদানের উপস্থিতিতে মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়াগুলোর বংশবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন বন্ধন বেশি হয়। সুতরাং হালকা মাটিতে উক্ত সারের সাথে হেক্টর প্রতি ২ কেজি সোডিয়াম মলিবডেট এবং এক কেজি কোবাল্ট নাইট্রেট মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বীজ বপন

পনেরই অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বর মসুর বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ছিটিয়ে বা সারিতে উভয় পদ্ধতিতে বীজ বপন করা গেলেও মসুরের ফলনে তেমন কোন পার্থক্য না থাকায় সাধারনত শেষ চাষের সময় বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। তবে সারিতে বপন করতে চাইলে ৩০ সেঃমিঃ দ রত্বে সারি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। জমিতে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া কম থাকলে বপনের প র্বে উপযুক্ত ইনোকুলাম (Inoculum) প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। তবে জমিতে ইতিপ র্বে মসুর চাষ করা হয়ে থাকলে প্রাথমিক ইউরিয়া এবং জীবাণু সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।

জমিতে ইতিপ র্বে মসুর চাষ করা হয়ে থাকলে প্রাথমিক ইউরিয়া এবং জীবাণু সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।

আন্ত পরিচর্যা

বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়। গাছ ঘন থাকলে পাতলা করা যেতে পারে। সাধারণত বাংলাদেশে মসুর ফসলে সেচ প্রয়োগ করা হয় না। তবে মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে সেচ দেয়া উত্তম। মরিচা পড়া (Rust) এবং নেতিয়ে পড়া (Wilt) রোগ দুটি মসুরের বেশ ক্ষতি করে। ভিটাভ্যাক্স - ৪০০ (১ঃ৪০০ হারে) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করে গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়। দেরি না করে সময় মতো বীজ বপন করলে মরিচা পড়া রোগ দমন করা সম্ভব।

গম, আখ, ভূট্টা এবং সরিষার সাথে সাথী ফসল হিসেবে মসুরের চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে সরিষার সাথেও মিশ্র ফসল হিসেবে মসুর চাষের প্রচলন রয়েছে।

সাথী ফসল

গম, আখ, ভূট্টা এবং সরিষার সাথে সাথী ফসল হিসেবে মসুরের চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে সরিষার সাথেও মিশ্র ফসল হিসেবে মসুর চাষের প্রচলন রয়েছে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ

সাধারনত বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যেই মসুর ডালে পরিপক্কতা আসে এবং মাঠের ৮০% ফল পরিপক্কতা লাভ করলে ফসল সংগ্রহ করা হয়। জাত অনুসারে হেক্টর প্রতি ১.৫-২.০ টন দানা পাওয়া যায়। বীজ সংগ্রহ করার পর ভালো করে রৌদ্রে শুকিয়ে মাটির পাত্রে, টিনে বা ড্রামে এমন ভাবে সংরক্ষণ করতে হয় যাতে বাতাস বা কীটপতঙ্গ ঢুকতে না পারে। পোকার আক্রমণ হয়েছে কি না দেখার জন্য বর্ষাকালে মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং সুযোগ পেলেই রৌদ্রে পুনরায় শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। এভাবে বীজ সংরক্ষণ না করলে পোকার আক্রমণ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কোন মাসে মসুর বীজ বপন করতে হয়?

ক) জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাস
খ) অক্টোবর - নভেম্বর মাস
গ) ডিসেম্বর - জানুয়ারি মাস
ঘ) মার্চ - এপ্রিল মাস

২। মসুর চাষে হেক্টর প্রতি কত কেজি বীজ বপন করতে হয়?

ক) ২০-২৫ কেজি
খ) ২৫-৩০ কেজি
গ) ৩০-৩৫ কেজি
ঘ) ৫০-৬০ কেজি

৩। বীজ বপনের কত দিনের মধ্যে মসুর ডাল পরিপক্ক হয়?

ক) ৭০-৮০ দিন
খ) ৮০-৮৫ দিন
গ) ৯০-১০০ দিন
ঘ) ১২০-১৩০ দিন

৪। ভাল ফলন হলে হেক্টর প্রতি কত কেজি মসুর ডাল পাওয়া যায়?

ক) ১,০০০-১,২০০ কেজি
খ) ১,৫০০-২,০০০ কেজি
গ) ৩,০০০-৩,৫০০ কেজি
ঘ) ৫,০০০-৫,৫০০ কেজি

পাঠ ৩.৫ মুগ ডাল চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- ◆ মুগ ডাল চাষের উপযুক্ত মৌসুম এবং জমি নির্বাচন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ মুগ ডাল চাষের জন্য জমি তৈরি, বীজ বপন, সার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- ◆ মুগ ডাল বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ডালজাতীয় ফসলের মধ্যে মুগ ৫ম গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এ দেশে প্রায় ৬০,০০০ হেক্টর জমিতে এটি চাষ করা হয় এবং এতে বছরে ৩১,০০০ মেট্রিক টন মুগ উৎপাদন হয়।

মাটি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি মুগ চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশে সাধারনত মুগ ডাল শীতের কাছাকাছি সময়ে (মধ্য সেপ্টেম্বর হতে মধ্য অক্টোবর) বপন করা হয়। তবে আলো নিরপেক্ষ মুগডাল বপনের উত্তম সময় মার্চের শেষ থেকে মধ্য এপ্রিল। এপ্রিল মাসের পরেও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে মাটির জলাবদ্ধতা, মেঘলা আকাশ ইত্যাদি কারনে ফলন কম হয়। কোন কোন আলো নিরপেক্ষ জাত সারা বছরই চাষ করা যায়।

জাত

সোনামুগ, কান্তি অনুমোদিত জাতের মুগ ডাল।

জমি তৈরি

অনেক সময় বিনা চাষেও মুগ ডালের চাষ করা যায়।

পূর্ববর্তী শস্য তুলে নেওয়ার পরই জমিতে রস থাকতে থাকতে ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি মোটামুটি তৈরি করে নিতে হবে। জমিতে পানি জমার সম্ভাবনা থাকলে উপযুক্ত নিষ্কাশন নালা কাটতে হবে। মুগ ডাল আবাদের জন্য জমি তেমন নরম করে তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় বিনা চাষেও মুগ ডালের চাষ করা যায়।

সার প্রয়োগ

উর্বর পলি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে সার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তবে বেলে দোআঁশ মাটিতে হেক্টর প্রতি ৫-৭ টন খামারের পচানো সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। পরীক্ষার পর মাটি অম্লযুক্ত বিবেচিত হলে বীজ বোনার প্রায় এক মাস আগেই চুনাপাথর গুঁড়া বা কাঠের ছাই প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেসব জমিতে পূর্বে মুগ চাষ করা হয় নাই সেখানে প্রাথমিক সার হিসেবে হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রতি কেজি বীজ ৯০ গ্রাম জীবাণু সার মিশিয়ে বপন করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

বীজ বপন

মুগ ডালের হেক্টর প্রতি বীজের হার সারি পদ্ধতিতে ১৫-২০ কেজি এবং ছিটানো পদ্ধতিতে ২০-২৫ কেজি।

মুগ ডালের হেক্টর প্রতি বীজের হার সারি পদ্ধতিতে ১৫-২০ কেজি এবং ছিটানো পদ্ধতিতে ২০-২৫ কেজি। বপনের পূর্বে বীজে উপযুক্ত ইনোকুলাম (Inoculum) প্রয়োগ করলে মুগডালের নাইট্রোজেন গুটি ও ফলন উভয়েই বেড়ে যায়।

আন্তঃ পরিচর্যা

জমিতে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করা হলে জমিতে নিড়ানী দেওয়ার সুবিধা হয়। বীজ বোনার ২-৩ সপ্তাহ পরে ছোট কোদাল দিয়ে মাটি অগভীরভাবে কর্ষণ করে আগাছা দমন করতে হয়। প্রথম অন্তর্বর্তী কর্ষনের সময় প্রতি সারির সবল চারাগুলো ১০-১২ সিঃমিঃ দূরে দূরে রেখে বাকি চারাগুলো

তুলে ফেলতে হবে। সেচের তেমন ব্যবস্থা না করলেও জমিতে যেন কোন অবস্থাতেই পানি না জমে, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার পোকা যেমন ঘোড়া পোকা, বিটল, বিছাপোকা, হকমথ, সবুজ গান্ধী পোকা, শুটির মাজরা পোকা ইত্যাদি দ্বারা মুগ ফসল আক্রান্ত হয়। বিছা পোকা এবং শুটির মাজরা পোকা মুগের বেশ ক্ষতি করে থাকে। মুগ ডাল গোড়া পচা, পাতার দাগ, হলদে মোজাইক ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এদেশে হলদে মোজাইক এবং পাতার দাগ রোগ মুগ ফসলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। হলদে মোজাইক রোগ দমনে এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হয়। ব্যাভিষ্টিন (০.২%) ১০-১২ দিন অন্তর তিন বার স্প্রে করে পাতার দাগ রোগ দমন করা যায়। শুটির মাজরা পোকা দমনে সুমিথিয়ন ৫০ ই,সি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃলিঃ ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। বিছা পোকার আক্রমণ নগস ১০০ ই,সি ১ মিঃলিঃ ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা যায়।

সাথি ফসল

আখের সাথে সাথি ফসল হিসেবে মুগ ডালের চাষ করা যেতে পারে।

আখের সাথে সাথি ফসল হিসেবে মুগ ডালের চাষ করা যেতে পারে। সাধারণত আখের দুই সারির মাঝে মাটি উচু করে মুগের চাষ করা হয়।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

আগাম জাতের মুগ প্রাক-খরিপ ঋতুতে বীজ বোনার ৬০-৬৫ দিন থেকে গাছে সুপরিপক্ক শুটি উৎপন্ন করতে শুরু করে। পাকা শুটিগুলো যথাসময়ে না তোলা হলে ফেটে গিয়ে বীজ ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই শুটিগুলো কালো রঙের হলেই সকালের দিকে দফায় দফায় শুটি তুলে নিতে হবে। একটি গাছ থেকে ২-৩ দফায় শুটি তোলা যায়। শেষ বার গাছের গোড়া কেটে পরিস্কার খামারে তুলে এনে ২-৪ দিন রাখার পর মেড়ে ঝেড়ে দানাগুলি ভূষি থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। তারপর দানাগুলোকে ২-৪ দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে (৭ শতাংশ রসযুক্ত দানা) গোলাজাত করতে হবে। জাত অনুসারে হেক্টর প্রতি ১.০-১.৫ টন দানা পাওয়া যায়। মুগ ডালের বীজ ভালভাবে শুকিয়ে গোলাজাত না করলে পোকার আক্রমণ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কোন ধরনের জমিতে মুগ ডাল ভাল ফলে?

ক) এঁটেল খ) এঁটেল দোআঁশ

গ) বালি গ) পলি

২। সাধারণত কোন সময় মুগ ডালের বীজ বপন করতে হয়?

ক) সেপ্টেম্বর - অক্টোবর খ) ডিসেম্বর - জানুয়ারি

গ) জুন - জুলাই ঘ) আগষ্ট - সেপ্টেম্বর

৩। আলো নিরপেক্ষ মুগ ডাল কোন সময় বপন করতে হয়?

ক) মার্চ - এপ্রিল খ) জুন - জুলাই

গ) জানুয়ারি - ফ্রেুয়ারি ঘ) ডিসেম্বর - জানুয়ারি

৪। সারি পদ্ধতিতে মুগ ডালের চাষ করতে হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ কত?

ক) ১৫-২০ কেজি খ) ১২-১৫ কেজি

গ) ২০-২৫ কেজি ঘ) ২৫-৩০ কেজি

৫। বাংলাদেশে মুগ ডালে কোন রোগ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে?

ক) গোড়া পচা খ) হলদে মোজাইক

গ) ব্লাইট ঘ) কান্ড পচা

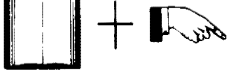

পাঠ ৩.৬ ছোলা চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- ছোলা চাষের উপযুক্ত মৌসুম এবং জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- ছোলা চাষের জন্য জমি তৈরি, বীজ বপন, সার প্রয়োগ ইত্যাদি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছোলা বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

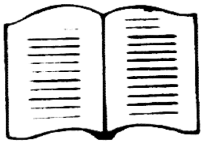

বাংলাদেশে ডালজাতীয় ফসলের মধ্যে ছোলা তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এদেশে প্রায় ১,০৩,০০০ হেক্টর জমিতে এর চাষ করা হয় এবং এতে বছরে ৮০,০০০ মেট্রিক টন ছোলা উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে সাধারণত দেশী ছোলার চাষ করা হয়। এজাতীয় ছোলার বীজের রং হলুদ থেকে কালচে বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান এবং গমের আবাদ বেশি লাভজনক হওয়ায় এদেশে ছোলার জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে।

মাটি ও আবহাওয়া

> পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি ছোলা চাষের জন্য উপযোগী।

পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি ছোলা চাষের জন্য উপযোগী। তবে এটেল দোআঁশ মাটিতে ছোলার ফলন ভালো হয়। ছোলা বিভিন্ন পরিবেশে জন্মাতে পারে কিন্তু জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। বেশি আর্দ্রতা এবং মেঘলা আবহাওয়া গাছের ফুল ধরা এবং শুটি গঠনে প্রতিকূল হতে পারে। জমিতে বেশি রস থাকলে এবং গাছের দ্রুত বৃদ্ধি হলে রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এদেশের জলবায়ু অনুযায়ী ছোলা বপনের উপযুক্ত সময় মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত । তবে রোপা আমন ধান কেটে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছোলা বপন করা যায়। দেরীতে বপন করলে ফলন কমে যায়।

জাত

নবীন (বারি ছোলা - ১), বারি ছোলা - ২ এবং বারি ছোলা - ৩ অনুমোদিত জাত।

জমি তৈরি

ঈর্ববর্তী শস্য তুলে নেওয়ার পরই জমির 'জো' বুঝে ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি বেশ সমতল করে তৈরি করতে হয়। ভবিষ্যতে পানিসেচের সুবিধার জন্য সরু সরু আল দিয়ে জমিকে সমান কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত করে এর সঙ্গে আড়াআড়িভাবে পানি সেচ ও নিকাশের নালাগুলো তৈরি করে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ

পূর্ববর্তী শস্যে বেশি মাত্রায় জৈবসার প্রয়োগ করা হ'লে ছোলা চাষের জন্য আর জৈব সার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অন্যথায় হালকা বা ভারী মাটিতে হেক্টর প্রতি ৫-৭ টন জৈব সার যেমন, পচানো খামারের সার বা কম্পোস্ট জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। যে সব জমিতে পূর্বে ছোলা চাষ করা হয় নাই সেখানে প্রাথমিক সার হিসেবে হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয় এবং প্রতি কেজি বীজে ১০০ গ্রাম জীবাণু সার মিশিয়ে বপন করতে হয়। তবে যে সব জমিতে ইতিপূর্বে সার প্রয়োগ করে ছোলার চাষ করা হয়েছে সেখানে ছোলা চাষের জন্য পুনরায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই। অম্লযুক্ত মাটিতে বীজ বোনার এক দেড় মাস পূর্বে অবশ্যই চুন প্রয়োগ করে মাটির অম্লত্ব নষ্ট করা উচিত। বেলে দোআঁশ মাটির অম্লত্ব (পি,এইচ) ৪ হ'লে হেক্টর প্রতি ৩.৭৫ টন চুনাপাথর চূর্ণ প্রায়োগ করতে হয়। এঁটেল দোআঁশ মাটির পি,এইচ ৪.৫ হলে হেক্টর প্রতি ১২.৫ টন পর্যন্ত চুনাপাথর চূর্ণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। জমি দু'একবার কর্ষণ করে রসযুক্ত মাটিতে উক্ত পরিমান চুন প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। যে সব এলাকায় গন্ধক এবং দস্তার অভাব রয়েছে সেখানে এ দু'টো সার অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বীজের হার

জমিতে ছিটিয়ে বপনের জন্য বীজের আকার অনুসারে হেক্টর প্রতি ৫৫-৬০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। সারি পদ্ধতিতে ৩৫-৪০ সেঃমিঃ দুরে সারিতে বীজ বপন করা হয় এবং এতে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আন্ত পরিচর্যা

বীজ বোনার ২-৩ সপ্তাহ পর প্রথমবার এবং ৫-৬ সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার গাছের সারিগুলোর মধ্যকার জমি অগভীরভাবে কর্ষণ ও আগাছা দমন করা দরকার। এই সময় প্রতি সারিতে ঘন চারাগুলো কিছুটা পাতলা করে দিতে হবে। সাধারণত উপযুক্ত জমিতে সঠিক সময়ে ছোলার চাষ করলে এবং প্রয়োজন হলে বপনের আগে জমিতে সেচ দিয়ে বীজ বপন করলে আর সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে দেরীতে বা হালকা মাটিতে ছোলার চাষ করলে অনেক সময় জমির রস শুকিয়ে যায়। তখন প্রয়োজনবোধে ১-২ টি সেচ দিলে ফলন ভাল হয়। ছোলার জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। জমিতে পানি জমে গেলে সত্বর তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারী মাটিতে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না।

> ভারী মাটিতে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না।

ছোলার রোগের মধ্যে উলে-খযোগ্য হচ্ছে ঢলে পড়া (Wilt), শুকনো শিকড় পচা (Dry root rot), শিকড় পচা (Root rot), বোট্রাইটিস গ্রে মোল্ড ইত্যাদি। ভিটাভ্যাক্স - ২০০ (১ ঃ ৪০০ হারে) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করলে শিকড় পচা রোগ দমন হয়। বোট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ দমনের জন্য ছোলা ঘন না করে বোনা এবং ছোলাতে সার ও পানির সেচ থেকে বিরত থাকা ফলদায়ক।

ফল ছিদ্রকারী পোকা ছোলার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার আক্রমন হলে রিপকর্ড ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃলিঃ মিশিয়ে ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়।

সাথী ফসল

আখের সঙ্গে ছোলা সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। সরিষার সঙ্গে ছোলাকে মিশ্র শস্য হিসেবে চাষ করা চলে। দশ ভাগ ছোলা বীজের সঙ্গে এক ভাগ সরিষার বীজ মিশিয়ে বপন করতে হবে। ছোলা পাকার আগে সরিষার বীজ তুলে নেওয়া যায়।

> আখের সঙ্গে ছোলা সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। সরিষার সঙ্গে ছোলাকে মিশ্র শস্য হিসেবে চাষ করা চলে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

জাত অনুসারে ১৩৫-১৬৫ দিনের মধ্যে ফসল তুলে নেওয়ার উপযোগী হয়ে উঠে। পরিণত গাছের পাতাগুলো ফিকে হলুদ রঙের হয়ে শুকিয়ে আসে, শুটি বেশ শক্ত ও হলুদ রং ধারণ করে। ফল পাকার সংগে সংগে গাছ গোড়া থেকে কেটে ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। তবে খেয়াল রাখতে হয় যেন কোন অবস্থাতেই ভিজা গাছ গাদা করে রাখা না হয়। এতে বীজের রং কালো হয় এবং গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায়। মাড়াই ও পরিষ্কার করে বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে মাটির পাত্র, ড্রাম বা টিনে সংরক্ষণ করতে হয়। পাত্রে যাতে বাতাস চলাচল করতে এবং কীট পতঙ্গ ঢুকতে না পারে তার জন্য পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে রাখতে হয়। ছোলা বীজ ভালভাবে শুকিয়ে বায়ু নিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ না করলে পোকার আক্রমণ হতে পারে।

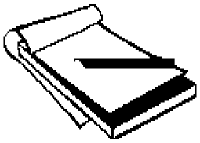

অনুশীলন (Activity): *মসুর, মুগ ও ছোলা চাষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লিখুন:*

i. বপন সময়
ii. বীজহার
iii. সাহি ফসল
iv. জাত
v. উপযুক্ত মাটি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কোন ধরনের জমিতে ছোলার ভাল ফলন হয়?

ক) বেলে মাটি
খ) বেলে দোআঁশ মাটি
গ) এঁটেল মাটি
ঘ) এঁটেল দোআঁশ মাটি

২। ছোলা বপনের উপযুক্ত সময় কখন?

ক) মধ্য সেপ্টেম্বর - অক্টোবরের শেষ
খ) মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরের শেষ
গ) মধ্য নভেম্বর - ডিসেম্বরের শেষে
ঘ) মধ্য ডিসেম্বর - জানুয়ারীর শেষ

৩। ছোলার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা কোনটি?

ক) ঘোড়া পোকা (Semi looper)
খ) ফলছিদ্রকারী পোকা (Pod borer)
গ) কাটুই পোকা (Cut worm)
ঘ) জাব পোকা (Aphids)

৪। কোন ফসলের সাথে ছোলা মিশ্র শস্য হিসেবে চাষ করা যায়?

ক) সরিষা
খ) গম
গ) ধান
ঘ) মুগ

৫। কোন ফসলের সাথে ছোলা সাথি ফসল হিসেবে চাষ করা যায়?

ক) ধান
খ) গম
গ) আখ
ঘ) মসুর

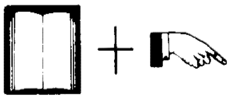

পাঠ ৩.৭ মাসকলাই, খেসারী ও গোমটরের চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- মাসকলাই, খেসারী ও গোমটরের চাষের উপযুক্ত জমি এবং মৌসুম নির্বাচন বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাসকলাই, খেসারী ও গোমটর চাষের জন্য জমি তৈরি, বীজ বপন, সার ও সেচ প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঐ সব ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

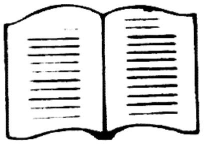

মাসকলাই চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে ডালজাতীয় ফসলের মধ্যে মাসকলাই ৪র্থ গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এদেশে প্রায় ৭০,০০০ হেক্টর জমিতে এর চাষ করা হয় এবং প্রতি বছর প্রায় ৫,২০০ মেট্রিক টন মাসকলাই উৎপাদন হয়। সাধারণত আউশ এবং পাট কাটার পর খরিফ-২ মৌসুমে (আগস্ট - সেপ্টেম্বর) মধ্যম উঁচু জমিতে মাসকলাই চাষ করা হয়। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে খরিফ - ১ মৌসুমে (মার্চ-এপ্রিল) এর চাষ করা যায়।

মাটি ও আবহাওয়া

> পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী।

পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী। আগে বাংলাদেশে কেবল প্রধানত খরিফ-২ মৌসুমেই মাসকলাই এর চাষ করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বেশ কিছু আলো নিরপেক্ষ জাত উদ্ভাবন করাতে এখন বছরের যে কোন সময় এর চাষ করা যায়। গ্রীষ্ম (খরিফ-১) মৌসুমে মাসকলাই -এর চাষ করা ভালো। কারণ এ সময়ে উচ্চ তাপমাত্রা থাকার কারণে গাছ বড় এবং ফলন বেশি হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় মার্চের শেষ থেকে মধ্য এপ্রিল।

জাত

ম্যাক -১ (বারিমাস) একটি অনুমোদিত জাত।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

> **মাসকলাই চাষের জন্য খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। দুই-তিনটি চাষ ও মই দিলেই হয়।**

মাসকলাই চাষের জন্য খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। দুই-তিনটি চাষ ও মই দিলেই হয়। বর্ষার পর অর্থাৎ খরিফ-২ মৌসুমে জমির পানি সরে যাওয়ার পর পলি অঞ্চলে বিনা চাষেও মাসকলাই চাষ করা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত মাসকলাইয়ের জন্য কোন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। তবে হেক্টর প্রতি ২০-৪০-২০ কেজি হারে যথাক্রমে ইউরিয়া, টি,এস,পি এবং এম,পি সার প্রয়োগ করলে ভালো করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বীজ বপন

সারি এবং ছিটানো উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যেতে পারে। সারি পদ্ধতিতে প্রায় ৩০ সে.মি.

দ রে দ রে সারিতে ২-৩ সে.মি গভীরে বীজ বপন করা হয়। ছিটানো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় বীজ ছিটিয়ে মই দিতে হবে। সারি পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ২০-২৫ কেজি এবং ছিটানো পদ্ধতিতে ৩০-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম ইনোকুলাম

(Inoculum) প্রয়োগ করে ফলন ১.৫ থেকে ২.০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

আন্ত পরিচর্যা

> **সারি পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি সারিতে ৮-১০ সে.মি. দূরত্বে গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হয়।**

সারি পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি সারিতে ৮-১০ সে.মি. দূরত্বে গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হয়। বীজ বপনের ২-৫ সপ্তাহের মধ্যে ২/১ বার আগাছার প্রকোপ অনুযায়ী নিড়ানীর ব্যবস্থা করলে ফলন ভালো হয়। বৃষ্টি ও মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী নিকাশ ও সেচের ব্যবস্থা করা ভালো। হলুদ

মোজাইক ভাইরাস, পাতার দাগ পড়া এবং পাউডারী মিলডিউ রোগ মাসকলাই এর ক্ষতি করে থাকে। মাসকলাই এর ক্ষতিকারক পোকার মধ্যে বিছা পোকা (Hairy caterpillar) এবং ছিদ্রকারী পোকা (Pod borer) অন্যতম। টিল্ট - ২৫০ ইসি (০.০৫%) ১০-১২ দিন অন্তর তিন বার স্প্রে করে পাউডারী মিলডিউ রোগ দমন করা যায়। পাতায় দাগ পড়া রোগ দমনে ব্যাভিষ্টিন নামক ছত্রাকনাশক (০.২%) ১০-১২ দিন অন্তর অন্তর তিন বার স্প্রে করতে হয়। বিছা পোকা দমনে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃলিঃ নগস ১০০ ই.সি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

মাসকলাই এর ক্ষতিকারক পোকার মধ্যে বিছা পোকা (Hairy caterpillar) এবং ছিদ্রকারী পোকা (Pod borer) অন্যতম।

ফসল মাড়াই ও সংরক্ষণ

শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ফল পাকলে গাছ কেটে নিয়ে এসে ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

খরিফ-২ মৌসুমে সাধারণত কার্তিকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এ ফসল পাকে। তখন জমিতে রস কমতে থাকায় সব ফল একসঙ্গে পেকে যায়। এ সময় শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ফল পাকলে গাছ কেটে নিয়ে এসে ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহ করার পর ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে মাটির পাত্রে, টিনে বা ড্রামে এমন ভাবে সংরক্ষণ করতে হয় যাতে বাতাস বা কীটপতঙ্গ প্রবেশ করতে না পারে। সংরক্ষণ অবস্থা ভাল না হলে বিটল পোকা বীজের সমূহ ক্ষতি করতে পারে।

খেসারী চাষ পদ্ধতি

ডাল জাতীয় ফসলের মধ্যে খেসারী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি জমিতে আবাদ হয়ে থাকে। এদেশে প্রতি বছর প্রায় ২,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে খেসারীর চাষ করা হয়। ষাটের দশকের পর হতে এ দেশে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান এবং গম আবাদের প্রচলন হওয়ার পর খেসারীর আবাদ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

মাটি ও আবহাওয়া

জলবায়ুগত চাহিদা অনুযায়ী খেসারী ডাল বাংলাদেশে রবি মৌসুমে উৎপাদনের উপযোগী এবং বীজ বপনের উত্তম সময় হলো অক্টোবর - ______

পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি খেসারী চাষের উপযোগী। জলবায়ুগত চাহিদা অনুযায়ী খেসারী ডাল বাংলাদেশে রবি মৌসুমে উৎপাদনের উপযোগী এবং বীজ বপনের উত্তম সময় হলো অক্টোবর - নভেম্বর। তবে রোপা আমন ধানে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করলে ডিসেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

জাত

জামালপুর - ১ একটি অনুমোদিত জাত।

জমি তৈরি

খেসারী চাষের জন্য জমি তেমন মিহি করে তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। খরিফ মৌসুমের ফসল কাটার পর জমিতে 'জো' আসলে ৩-4 টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হয়। আগের ফসলের অবশিষ্টাংশ ও আগাছা পরিস্কার করে জমির উপরিভাগ সমান করে বীজ বুনতে হয়। বাংলাদেশে রোপা আমন জমিতে প্রয়োজনীয় রস থাকা অবস্থায় জমি প্রস্তত না করেই সরাসরি বীজ বপন করা যায়।

সার প্রয়োগ

বাংলাদেশে খেসারীর জমিতে সাধারণত কোন সার ব্যবহার করা হয় না। তবে একক ফসল হিসেবে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ১০-২০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ২০-৪০ কেজি ফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

বীজ বপন

সারি পদ্ধতিতে সারি থেকে সারির দ রত্ব ২৫-৩০ সে.মি। হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সারি এবং ছিটানো উভয় পদ্ধতিতে চাষ করা গেলেও সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। এতে শেষ চাষের সময় বীজ বপন করে মই এর সাহায্যে মাটি ঢেকে দিতে হয়। সারি পদ্ধতিতে সারি থেকে সারির দ রত্ব ২৫-৩০ সে.মি। হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বপনের পুর্বে ধানের

ন্যায় বীজ জাক দিয়ে নিলে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। এ ছাড়া উপযুক্ত ইনোকুলাম (Inoculum) বীজ বপনের পূর্বে বীজে মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আন্তপরিচর্যা

খেসারীর জমিতে সাধারনত সেচের ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। বেশ কয়েকটি রোগ যেমন ছাতা পড়া, মরিচা, নেতিয়ে পড়া খেসারীর বেশ ক্ষতি করে। থ্রিপস পোকা গাছের ও ফলের রস চুষে খায়। রোগ বালাই এবং পোকামাকড় দমনের জন্য সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ

গুদামজাত করণের জন্য বীজের উত্তম আর্দ্রতা ১০-১২%।

খেসারীর পরিপক্কতা আসতে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। মাঠের ৮০% ফল পরিপক্ক হলে ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে। গাছ গোড়া থেকে কাটা উত্তম, কারণ এতে ম লের নাইট্রোজেন গুটি মাটিতেই থেকে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ফসল সংগ্রহের পর কয়েকদিন গাছ রোদে শুকিয়ে সাধারণত গর€ দ্বারা মাড়াই করা হয়। মাড়াই করার পর বীজ রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়। গুদামজাত করণের জন্য বীজের উত্তম আর্দ্রতা ১০-১২%।

গোমটর (Cow pea) চাষ পদ্ধতি

গোমটর বাংলাদেশে একটি অপ্রধান ডাল ফসল হলেও চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ফেনী উপকূলীয় অঞ্চল, বরিশাল এবং ভোলায় এ ফসলের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। এই ফসলকে স্থানীয় ভাবে “ফেলনচ বলা হয়। গোমটর একটি স্বল্প মেয়াদী ফসল। এর ফুল ফুটতে ছোট দিনের প্রয়োজন হয়।

মাটি ও আবহাওয়া

ডাল কিংবা সবজী হিসেবে চাষ করলে ফেব্র€য়ারী থেকে মার্চ, গোখাদ্য ও আˆছাদন ফসল হিসেবে যে কোন সময় এবং সবুজ সার হিসেবে চাষ করলে মে-জুন মাসে গোমটরের বীজ বপন করা যেতে পারে।

বেলে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে গোমটর ভালো জন্মে। সাধারণত অম্লক মাটিতে এর ফলন ভালো হয়। রোপা আমনের জমিতেও এ ফসলের চাষ করা যায় তবে এই ফসল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বাংলাদেশে তিনটি মৌসুমেই গোমটর উৎপাদন করা যায়। তবে গ্রীষ্মকালে উৎপাদন ভালো হয়। ডাল কিংবা সবজী হিসেবে চাষ করলে ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ, গোখাদ্য ও আˆছাদন ফসল হিসেবে যে কোন সময় এবং সবুজ সার হিসেবে চাষ করলে মে-জুন মাসে গোমটরের বীজ বপন করা যেতে পারে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

সাধারণত ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তেরি করতে হয়। উর্বর জমিতে নাইট্রোজেনের প্রারম্ভিক প্রয়োগ (১০-২০ কেজি/হেক্টর) সহ ৪০-৬০ কেজি ফসফেট প্রয়োগ করা যেতে পারে। পলিমাটিতে চাষ করলে গোমটরে পটাশ সার প্রায়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না।

বীজ বপন

উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছিটানো বা সারি উভয় পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যেতে পারে। গোখাদ্য, সবুজ সার বা অচ্ছাদন ফসলের জন্য ছিটানো পদ্ধতিই উত্তম। সারি পদ্ধতিতে ৪০-৫০ সেঃমিঃ দূরে দূরে সারি এবং প্রতি সারিতে ১৫-২০ সেঃমিঃ দ রে দ রে ২-৩ টি বীজ বপন করা যায়। হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আন্ পরিচর্যা

গোখাদ্য, সবুজ সার বা আচ্ছাদন ফসল হিসেবে চাষ করলে তেন কোন যত্ন করার দরকার হয় না। ডাল ফসল হিসেবে চাষ করলে অঙ্কুরোদগমের ৪-৫ দিন পরে একবার নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন এবং মাটি ঝুরঝুরে করে দেওয়া ভাল। সবজী হিসেবে চাষ করলে মটরের ন্যায় বাউনি দিলে ফসল সংগ্রহের সুবিধা হয় এবং শুটির বর্ণ আকর্ষণীয় হয়। প্রয়োজনবোধে ২/১ বার সেচ দেওয়া উত্তম।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে রিপকর্ড-১০ ই.সি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃলিঃ মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গোমটর গোড়া পচা, মোজাইক, পাতার দাগ, পাউডারী মিলডিউ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া ফল ছিদ্রকারী পোকা গোমটরের ক্ষতি করতে পারে। পাতার দাগ রোগ দমনে ছত্রাক নাশক ঔষধ "বেভিষ্টিন" প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে প্রতি ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করা যায়। প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম হারে ভিটাভ্যাক্স দ্বারা শোধন করে বুনলে গোড়া পচা রোগ দমন হয়। ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে রিপকর্ড-১০ ই.সি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃলিঃ মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ

গোখাদ্য হিসেবে চাষ করলে প্রথম বারে ফুল আসা শুরু হলে গাছের গোড়া কেটে সংগ্রহ করা হয়। সবজী হিসেবে কাচা শুটি সংগ্রহ করতে চাইলে কয়েক ধাপে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়। সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে গোখাদ্যের ন্যায় গাছে ফুল আসা শুরু হলে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। ডাল হিসেবে চাষ করলে পরিপক্ক ফল কয়েকবারে সংগ্রহ করতে হয়। পরিপক্ক ফল কয়েকদিন রৌদ্রে শুকিয়ে মাড়াই করতে হয়। মাড়াই এর পর বীজ ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে মাটির পাত্রে, টিনে বা ড্রামে সংরক্ষণ করতে হয়। পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে রাখলে বীজ ভালো থাকে।

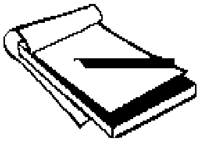

অনুশীলন (Activity): *মাসকলাই, খেসারী ও গোমটর চাষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করুন:*

i. *মৌসুম নির্বাচন*
ii. *জমি নির্বাচন*
iii. *জাত*
iv. *বীজ বপন*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কোন ধরনের মাটিতে মাসকলাই ভাল জন্মে?

ক) এঁটেল খ) বালি

গ) পলি ঘ) দোআঁশ

২। ছিটানো পদ্ধতিতে মাসকলাই চাষ করতে হেক্টর প্রতি কত কেজি বীজের প্রয়োজন হয়?

ক) ১৫-২০ কেজি খ) ২০-২৫ কেজি

গ) ৩০-৩৫ কেজি ঘ) ৩৫-৪০ কেজি

৩। এদেশে কোন মৌসুম গোমটর চাষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত?

ক) গ্রীষ্মকাল খ) শীত কাল

গ) বসন্ত কাল ঘ) বর্ষা কাল

৪। খেসারী চাষে কোন ধরনের সার কম ব্যবহার করতে হয়?

ক) ফসফেট খ) নাইট্রোজেন

গ) পটাশ ঘ) দস্তা

1| এদেশে ডালজাতীয় ফসলের চাষাবাদ দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন?

2| এদেশে ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা কম কেন?

3| সেচের আওতাভূক্ত জমিতে কৃষকগন ডালজাতীয় ফসল বাদ দিয়ে ধান ও গম চাষে বেশি আগ্রহী কেন?

4| পুষ্টিমানের বিচারে চালের চেয়ে ডালের স্থান উপরে কেন?

5| ডাল ফসল কীভাবে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে?

6| ডাল গরীবের মাংস - ব্যাখ্যা করুন।

7| ডাল ফসলের চাষ করলে জমিতে কোনজাতীয় সার যোগ হয়?

8| ডাল ফসলে সার কীভাবে ব্যবহার করতে হয়?

9| মসুর চাষে জমিতে সামান্য পরিমাণ কোবাল্ট ও মলিবডেনাম ব্যবহার করতে হয় কেন?

10| পলি মাটিতে বিনা সেচেই মসুর চাস করা যায় কেন?

11| মসুর চাষের জমি উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি নরম করতে হয় কেন?

12| ফসল সংগ্রহের পর মসুর বীজ ভালভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ না করলে কী অসুবিধা হয়?

13| মুগ ডালের প্রধান প্রধান রোগ বালাই এর নাম লিখুন।

14| মুগ ডালের বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ না করলে কী অসুবিধা হতে পারে?

15| মুগ ডাল চাষে কী কী সার ব্যবহার করা হয়?

16| এদেশে কয় ধরনের মুগ ডালের চাষ হয়?

17| ছোলার প্রধান প্রধান রোগবালাই এর নাম লিখুন।

18| এদেশে ছোলার চাষ দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন?

19| ছোলা চাষে বেশি ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয় না কেন?

20| ছোলা বীজ ভালোভাবে সংরক্ষণ না করলে কী কী অসুবিধা হতে পারে?

21| বাংলাদেশে খেসারীর আবাদ দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন?

22| মাসকলাই এর ক্ষতিকারক রোগবালাই এবং পোকা মাকড়ের তালিকা তৈরি কর€েন।

23| গ্রীষ্ম মৌসুমে মাসকলাই এর ফলন বেশি হয় কেন?

উত্তর মালা

পাঠ ১

১। ক, ২। ক, ৩। গ, ৪। ক, ৫। গ

পাঠ ২

১। গ, ২। গ, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। খ

পাঠ ৩

১। খ, ২। খ, ৩। গ,

পাঠ ৪

১। খ, ২। গ, ৩। গ, ৪। খ,

পাঠ ৫

১। খ, ২। ক, ৩। ক, ৪। ক, ৫। খ

পাঠ ৬

১। ঘ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। গ

পাঠ ৭

১। ঘ, ২। গ, ৩। ক, ৪। খ,

ইউনিট ৪ তৈল ফসলের চাষ

ইউনিট ৪ তৈল ফসলের চাষ

তৈল ফসলের মধ্যে সরিষার স্থান সর্বোচ্চ। এদেশে বিভিন্ন ধরনের তৈল ফসলের চাষাবাদ হয়ে আসছে। সয়াবীন তৈল ফসল হিসেবে পৃথিবীর অনেক দেশেই খ্যাতি লাভ করেছে। এদেশেও সয়াবীন উপযুক্ত তৈল ফসল বিবেচিত হতে পারে। ডাল ফসলের ন্যায় এসব ফসলও বোরো ধান এবং গমের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এদেশের কৃষিতে সরিষা এবং সয়াবীনের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ ইউনিটে সরিষা ও সয়াবীনের জাত এবং এসব ফসলের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

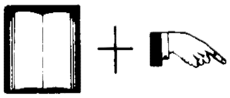

পাঠ ৪.১ তৈল ফসলের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- তৈল ফসল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন তৈল ফসলের জাত শনাক্ত করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন তৈল ফসলের ফলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- এজাতীয় ফসল সমূহের চাষাবাদ সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

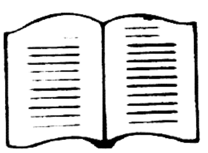

তৈল বা চর্বি শরীরে কর্মশক্তি সরবরাহ করে থাকে।

তৈল শস্য ভোজ্য তৈলের প্রধান উৎস। ভোজ্য তৈল আমাদের নিত্যকার খাবার তালিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তৈল বা চর্বি শরীরে কর্মশক্তি সরবরাহ করে থাকে। প্রাণী থেকে প্রাপ্ত চর্বি যথেষ্ট ব্যয়বহুল বিধায় উদ্ভিদ জাত তৈলই বাঞ্ছনীয়। উদ্ভিদ জাত তৈল সহজ পাচ্য এবং এর পুষ্টিমানও প্রাণীজ তৈল থেকে বেশি। তৈল বীজ থেকে চর্বি ছাড়া উপজাত হিসেবে খৈল পাওয়া যায় যা গবাদি পশু এবং হাস-মুরগি এমনকি মাছেরও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রায় সকল প্রকার খৈল জমির উত্তম জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সয়াবীন এবং চীনাবাদামের খৈল থেকে দুধ তৈরি করা যায়। চীনাবাদাম এবং সয়াবীন চাষ করলে তাদের মূলের গুটি (Nodule) থেকে জমিতে নাইট্রোজেন সার যোগ হয়। সরিষা, সূর্যমূখী, তিল এবং গর্জন তিলের ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে থাকে। এগুলোর চাষ করে ফুল ও সৌন্দর্য্যের চাহিদা মিটানো যায়। তাই দেখা যাচ্ছে তৈল ফসলের চাষ করে তৈল বা চর্বি, দুধ, মধু, সার এবং সৌন্দয্যের চাহিদা পুরণ করা যায়।

বিভিন্ন তৈল ফসলের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির সরিষা (টরি, শ্বেত এবং রাই, চীনাবাদাম, তিল, স র্যমুখী, কুসুম, তিসি, বেড়ী, সয়াবীন ইত্যাদি তৈল ফসলের আবাদ হয়ে থাকে (সারণী - ৭)। সরিষা, তিল, চীনাবাদাম,

স র্যমুখী, কুসুম বীজ থেকে উৎপন্ন তেল, ভোজ্য তেল হিসেবে গৃহীত হয়। অপর পক্ষে তিসি ও বেড়ীর তৈল বার্নিস বা পিছল তৈল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চীনাবাদাম বীজ তৈল তৈরিতে এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এদেশে তৈল ফসলের মধ্যে সরিষাই প্রধান। তৈল ফসলের আবাদি জমির শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে সরিষার চাষ করা হয়।

এদেশে তৈল ফসলের মধ্যে সরিষাই প্রধান। তৈল ফসলের আবাদি জমির শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে সরিষার চাষ করা হয়। মোট তৈল বীজ উৎপাদনের শতকরা ৪৮ ভাগই সরিষা থেকে আসে। টরি,

শ্বেত এবং রাই এই তিন ধরনের সরিষা এদেশে আবাদ করা হয়। অতি সম্প্রতি নেপাসজাতীয় ন তন সরিষার আবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। সব ধরনের সরিষাই রবি মৌসুমে আবাদ হয়। উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান এবং গমের জাত উদ্ভাবন এবং সেচ সুবিধার সৃষ্টি হওয়ার ফলে এদেশে সরিষার আবাদ সমস্যার সম্মুখীন। তবে ইদানীং উচ্চ ফলনশীল সরিষার জাত উদ্ভাবনের ফলে এর ফলন বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তিল এদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তৈল ফসল। মোট তৈল ফসলের শতকরা ১৩.৫ ভাগ জমিতে তিলের চাষ করা হয়। মোট তৈল বীজ উৎপাদনের শতকরা ১০.৫ ভাগ তিল থেকে আসে। এদেশের মাটি ও আবহাওয়া তিল চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। সারা বছরই প্রায় সব রকম জমিতেই তিলের চাষ করা যায়। উচ্চ ফলনশীল তিলের জাত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এর ফলন বাড়ানোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

চীনাবাদাম মোট তৈল ফসলের শতকরা ৬.৩ ভাগ জমিতে চাষ করা হয়। মোট তৈল বীজ উৎপাদনের শতকরা ১০.৩ ভাগ চীনাবাদাম থেকে আসে। রবি এবং খরিফ উভয় মৌসুমেই চীনাবাদাম চাষ করা যায়।

এদেশের মাটি ও আবহাওয়া সয়াবীন চাষের সম্পর্ণ উপযোগী। এর ফলনও আশাপ্রদ। রবি এবং খরিফ উভয় মৌসুমেই এর চাষ করা যায়। তৈল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারলে সয়াবীন এদেশের একটি সম্ভাবনাময় তৈল ফসল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অন্যান্য তৈল ফসল যেমন - তিসি, কুসুম, রেড়ী এবং গর্জন তিল সাধারণত রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। উপযুক্ত উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব ফসলের ফলন বাড়ানো যেতে পারে।

সারণী ৭: বাংলাদেশের কয়েকটি তৈলবীজ ফসলের বাংলা, ইরেজি এবং বৈজ্ঞানিক নাম।

বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলাদেশে মর্যাদা
সরিষা (টরি, শ্বেত, রাই,)	Rapeseed & Mustard	*Brassica campestris* L. *B. juncea*, Cass. *B. napus* L.	প্রথম
তিল	Sesame	*Sesamum indicum* L.	দ্বিতীয়
চীনা বাদাম	Groundnut	*Arachis hypogaea* L.	তৃতীয়
তিশি	Linseed	*Linum usitatissimum* L.	নগন্য
কুসুম ফুল	Safflower	*Carthamus tinctorius* L.	নগন্য
ভেরেন্ডা	Castor	*Ricinus communis* L.	নগন্য
গর্জন তিল	Nizer	*Guizotia abyssinica* Cass	নগন্য
সূর্যমুখী	Sunflower	*Helianthus annus* L.	সম্ভাবনাময়
সয়াবীন	Soybean	*Glycine max* (L) Merrill.	সম্ভাবনাময়

সারণী ৮: বাংলাদেশে বিভিন্ন তৈল শস্যের চাষ ও উৎপাদন (১৯৯৩-৯৪)।

তৈলবীজের নাম	জমির পরিমান (হেক্টর)	তৈলবীজ চাষের মোট জমির শতকরা হার	বীজ উৎপাদনের পরিমান (টন)	ফলন কেজি/হেক্টর	তেলের পরিমান (%)
সরিষা	৩,৩৬,৫০০	৬০.৭০	২,৩৯,১০০	৬৩০	৪০-৪৪
তিল	৬৫,৯০০	১৩.৪০	৩৮,৪০০	৫৪৫	৪১-৪৪
চীনাবাদাম	৩৫,৫০০	৬.৩০	৪১,০০০	১১০২	৪৯-৫০
তিসি	৭৪,৫০০	৯.৩০	৪৮,৩০০	৫৫০	৩৮-৪০
অন্যান্য	৮০০	১২.৪০	৩০০	৪৭৩	৩৯-৪০
মোট	৫,১৩,২০০				

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চাষাবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা

ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশে তৈল ফসল উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান এবং গম চাষের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। আর্থিক সুবিধার কারণে কৃষকগণ তৈল ফসল চাষের পরিবর্তে বোরো ধান এবং গম চাষে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে তৈল ফসলের আবাদি জমির পরিমান কমতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ইং সন থেকে উন্নত জাতের সরিষা এবং অন্যান্য তৈল ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতির কারণে তৈল বীজ উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পায় (সারণী-৮)। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ঘাটতির পরিমান অনেকটা প্রকটই থেকে যায়। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদাও বেড়ে যায়। বর্তমানে দৈনিক ৪.২ গ্রাম হারে ভোজ্য তৈল খেয়েও দেশে প্রায় ৬৪% ঘাটতি রয়েছে। প্রতি বছর এ ঘাটতি পুরনের জন্য তৈল আমদানী করতে হয় এবং এ জন্য কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। এদেশে তৈল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। উফশী জাতের তৈল ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং উৎপাদন প্রযুক্তি যেমন সহশস্য চাষ (Inter cropping) এবং মিশ্রশস্য চাষ (Mixed cropping) ইত্যাদি ব্যবহার করে তৈল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বর্তমানে দৈনিক ৪.২ গ্রাম হারে ভোজ্য তৈল খেয়েও দেশে প্রায় ৬৪% ঘাটতি রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কোন তৈল ফসলে সবচেয়ে বেশি আমিষ বিদ্যমান?

ক) সরিষা খ) তিল

গ) সয়াবীন ঘ) তিসি

২। এদেশে কোন তৈল ফসল সকল মৌসুমে চাষাবাদ করা যায়?

ক) সুর্যমূখী খ) বাদাম

গ) সরিষা ঘ) তিসি

৩। কোন তৈল ফসল মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?

ক) সরিষা খ) বাদাম

গ) তিল ঘ) তিসি

৪। সরিষাতে শতকরা কত ভাগ তৈল থাকে?

ক) ৪০-৪৪ ভাগ খ) ৩০-৩৪ ভাগ

গ) ২০-২৪ ভাগ ঘ) ৫০-৫৪ ভাগ

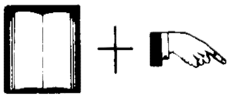

পাঠ ৪.২ সরিষার পরিচিতি ও গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে আবাদকৃত সরিষার জাত সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- এদেশের কৃষিতে সরিষার গুরুত্ব ব্যখ্যা করতে পারবেন।
- ভোজ্য তৈল উৎপাদনে সরিষার অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

সরিষার জাতসম হের পরিচিতি

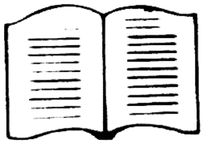

সরিষা বাংলাদেশের প্রধান তৈলবীজ ফসল। রবি মৌসুমে এর চাষ হয়। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ হয় এবং ২.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন সরিষা উৎপাদিত হয়। মোট তৈলবীজ উৎপাদনের দিক থেকে সরিষার অবদান প্রায় ৪৮%। সরিষার তৈল আবহমান কাল থেকে এদেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীরা মাথায় এবং গায়ে

মোট তৈলবীজ উৎপাদনের দিক থেকে সরিষার অবদান প্রায় ৪৮%।

সরিষার তৈল মাখতে অভ্যস্ত । সর্দি-কাশি হলে অনেকে সরিষার তৈল নাকে-মুখে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই তৈলের একটি বড় অসুবিধা হলো এতে প্রায় ৪০-৪৫% ইরোসিক এসিড নামক একটি ক্ষতিকারক ফ্যাটি এসিড আছে যা হৃৎপিন্ডের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে আমরা যে পরিমান সরিষার তৈল দৈনিক আহার করি তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাষনের পর যে খৈল পাওয়া যায় তাতে প্রায় ৩৫% আমিষ থাকে। এই খৈল গৃহপালিত পশুর উপাদেয় খাদ্য। খৈল এক ধরনের ভালো জৈব সারও বটে। এতে ৬.৪% নাইট্রোজেন থাকে।

এদেশে তিন ধরনের সরিষা যেমন - টরি, শ্বেত এবং রাইজাতীয় সরিষার আবাদ হয়ে থাকে। সারণী - ৯ এ বিভিন্ন ধরনের সরিষার বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো।

সারণী ৯: সরিষার বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য।

জাত	বপনের সময়	পরিপক্কতার সময় (দিন)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	বীজে তৈলের পরিমান (%)	এন্তব্য
টরী-৭ (মাঘী সরিষা)	মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর	৭০-৮০	৯৫০-১১০০	৩৮-৪০	স্থানীয় জাত
টি,এস-৭২ (কল্যানি সরিষা)	মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর	৭৫-৮৫	১৫০০-১৬০০	৩৪-৪০	উফশী জাত
এস,এস-৭৫ (সোনালী সরিষা)	মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর	৯০-১০০	১৮০০-২০০০	৪২-৪৪	উফশী জাত
এম-১২ (সম্পদ)	মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর	৯০-১২০	১৬০০-১৮০০	৪২-৪৪	উফশী জাত
রাই-৫	মধ্য অক্টোবর-নভেম্বরের শেষ	৯০-১০০	৯৫০-১১০০	৩৮-৪০	স্থানীয় জাত

গুরুত্ব

সরিষার জীবনকাল কম, প্রজাতি এবং জাত অনুযায়ী বপনের ৭০-১০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য তৈলবীজের তুলনায় এদেশের কৃষিতে সরিষার বেশ গুরুত্ব আছে। সরিষার জীবনকাল কম, প্রজাতি এবং জাত অনুযায়ী বপনের ৭০-১০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। সরিষার তৈল নিষ্কাশনের পদ্ধতি সহজ - দেশীয় ঘানিতেই তৈল নিষ্কাশন করা যায় এবং এর উৎপাদন খরচ কম। সরিষা মিশ্র ফসল হিসেবে ডাল ফসলের সাথে চাষ করা যায়। যে সব স্থানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে আগাম সরিষা উৎপাদন করে বোরো ধানের চাষ করা যায়। একই ক্ষেতে সরিষা মিশ্র শস্য

হিসেবে অন্য ফসলের সাথে অথবা অন্য সব শস্যের সাথে সাথী ফসল হিসেবেও চাষ করা যায়। যদিও সরিষা গুরুত্বপূর্ণ ফসল কিন্তু স্থানীয় জাতের সরিষার ফলন খুব কম বলে বাংলাদেশে বাহির হতে বিপুল পরিমাণ ভোজ্য তৈল আমদানি করতে হয়। উন্নত জাতের ভালো বীজ ব্যবহার, সময় মত বীজ বপন এবং সার ও সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে সরিষার ফলন বাড়ানো সম্ভব।

এ ছাড়া সরিষার ফুলে প্রচুর পরিমানে নেকটার থাকে। তাই জমিতে কৃত্রিমভাবে মৌমাছি পালন করলে একদিকে যেমন প্রায় বিনা খরচায় মধু সংগ্রহ করা যায়, অপরদিকে পরাগায়নের জন্য অধিক বীজ উৎপাদিত হয়। এ কারণে সরিষাকে মধু উদ্ভিদ (Honey Plant) বলা হয়।

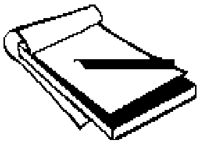

অনুশীলন (Activity): *সরিষার বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট লিখুন। এ জাতগুলোর মধ্যে যেটি যেগুলো আপনার এলাকায় চাষ করা হয় সেটির/সেগুলোর মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ করে বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিন। কোন পার্থক্য থাকলে তা উল্লেখ করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সরিষা বীজে শতকরা কত ভাগ তৈল থাকে?

ক) ৪০-৪৪ ভাগ   খ) ৫০-৫৪ ভাগ

গ) ৩০-৩৪ ভাগ   ঘ) ২০-২৪ ভাগ

২। বাংলাদেশে প্রধানত কত প্রকার সরিষার চাষ হয়?

ক) ৪ প্রকার   খ) ৩ প্রকার

গ) ৫ প্রকার   ঘ) ৭ প্রকার

৩। সরিষার তৈলে শতকরা কত ভাগ ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড বিদ্যমান?

ক) ৩০-৩৫ ভাগ   খ) ৪০-৪৫ ভাগ

গ) ৫০-৫৫ ভাগ   ঘ) ৬০-৬৫ ভাগ

৪। সরিষার খৈলে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন বিদ্যমান?

ক) ৬.৪ ভাগ   খ) ১০.৪ ভাগ

গ) ১৫.৪ ভাগ   ঘ) ২০.৪ ভাগ

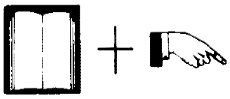

পাঠ ৪.৩ সরিষার জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ বপন ও পরিচর্যা

এ পাঠ শেষে আপনি

- সরিষা চাষের জমি নির্বাচন বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরিষার জমিতে সার প্রয়োগ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরিষা চাষের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

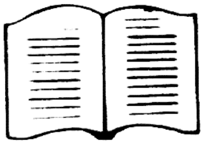

জমি তৈরি

সরিষার বীজ ছোট বলে বীজ বোনার উপযোগী মাটি বেশ মিহি হওয়া আবশ্যক। পূর্বেকার আগাম জাতের আমন ধান, পাট বা সবজি তুলে নেওয়ার পর জমিতে জো আসলে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি এমন ভাবে সমতল করতে হয় যাতে অতিরিক্ত পানি সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। পানি নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত স্থানে নালারও ব্যবস্থা রাখতে হয়।

সার প্রয়োগ

বিভিন্ন জাত, মাটি এবং জমিতে রসের তারতম্য অনুসারে সরিষার জমিতে বিভিন্ন পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগ করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পায়। সার প্রয়োগ করার পর প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ফলন আরও বৃদ্ধি পায়। জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ৭-৮ টন খামারের সার প্রয়োগ করা উত্তম। এ ছাড়া হেক্টর প্রতি ২০০-২৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০-১৭০ কেজি টি,এস,পি এবং ৭০-৮০ কেজি এম,পি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরোক্ত পরিমাণ ইউরিয়া সারের অর্ধেক ও টি,এস,পি এবং এম,পি সারের সবটুকু জমি প্রস্তুতির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া গাছে ফুল আসার সময় উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্ছনীয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, দস্তা, গন্ধক এবং বোরণ জাতীয় সার ব্যবহারে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পায়। উলি-খিত সারের মাত্রা কৃষি অঞ্চল ভেদে কম বেশি হতে পারে।

বীজ বপন

অক্টোবর - নভেম্বর মাসই সরিষার বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে শেষ অক্টোবর - এর মধ্যে বীজ বপন করতে পারলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

অক্টোবর - নভেম্বর মাসই সরিষার বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে শেষ অক্টোবর - এর মধ্যে বীজ বপন করতে পারলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। সাধারণত সরিষা ছিটিয়ে বোনা হয়। জমিতে সমানভাবে ছিটানোর জন্য বীজের সাথে ছাই, বালি, গুঁড়া মাটির যে কোন একটি মিশিয়ে বপন করা ভাল। লাইন করে বুনলে সার, সেচ ও নিড়ানী দেওয়ার সুবিধা হয়। লাইন থেকে লাইনের দ রত্ব ৩০ সেঃমিঃ হওয়া বাঞ্চনীয় এবং প্রতি লাইনে পরিমাণ মত বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়। বপনের সময় জমিতে বীজ অংকুরোদগমের উপযোগী রস অবশ্যই থাকতে হয়। টরী-৭ এবং টি এস-৭২ এর জন্য প্রতি হেক্টরে বীজের হার হচ্ছে ৮ কেজি। সোনালী, সরিষার বীজ আকারে বড় বিধায় প্রতি হেক্টরে ৯ কেজি বীজ লাগে। রাই সরিষার বীজ ছোট বলে প্রতি হেক্টরে ৭.৫ কেজি বীজ লাগে।

আন্ত পরিচর্যা

একবার সেচ দিলে সাধারণত বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর (ফল ফোটার প্রারম্ভে) দিতে হয়।

চারা গজানোর ১৫ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফেলতে হয় অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ টি চারা রাখা প্রয়োজন। জমিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে বিশেষ করে উঁচু জমিতে ১-২ বার সেচের প্রয়োজন হয়। একবার সেচ দিলে সাধারণত বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর (ফল ফোটার প্রারম্ভে) দিতে হয়। সেচের প্রয়োজন হলে দু' বার বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর এবং ৪৫-৬০ দিন পর (শুটি বৃদ্ধির সময়) সেচ দেওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে অরোবাংকি নামক এক প্রকার পরগাছা সরিষার বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। সরিষার জমিতে এ পরগাছা দেখা দিলে নিড়ানী দিয়ে উঠিয়ে এগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

অলটারনেরিয়া ব-াইট বা পাতার দাগ পড়া রোগ হলে গাছের পাতায় প্রথমে বাদামি অথবা গাঢ় বাদামি রং এর দাগ দেখা যায়। রোগ প্রকট হলে দাগ গাছের কান্ডে এমনকি শুটি বা বীজেও দেখা দিতে পারে। এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ক্যাপটান বা ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন করতে হয়। এ রোগের আক্রমণ বেশি হলে রোভরাল-৫০ডচ, ডাইথেন এম-৪৫ ঔষধ ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২ দিন পর পর ৩ বার সিঞ্চন যন্ে র সাহায্যে সরিষার ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হয়।

জাব পোকা সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকার আক্রমণ হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা জুলন ৩৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলিলিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হয়। কীটনাশক অবশ্যই অপরাহ্নে স্প্রে করতে হয়। সকালের দিকে কীটনাশক স্প্রে করলে মৌমাছির ক্ষতি হয়। মৌমাছি পরাগায়ণের জন্য উপকারী। তাই কীটনাশক বিকালের দিকে স্প্রে করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও বীজ সংরক্ষণ

টরি সরিষা পাকতে ৭০-৮০ দিন সময় লাগে। অন্যান্য সরিষা পাকতে ৯০-১১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। গাছের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ শুটি পাকলে সকালের দিকে শুটিসহ গাছ কেটে মাড়াই করার স্থানে নিতে হয়। দু'তিন দিন রোদে গাছ শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়াই করতে হয়। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে রোদে ভালভাবে ৩-৪ দিন শুকিয়ে নেবার পর শুষ্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। নেপাস -এর শুটি ফেটে বীজ ঝরা সমস্যা এড়ানোর জন্য ৬০-৭০% শুটি যখন খড়ের রং ধারণ করে তখনই ফসল কাটতে হয়। সরিষার শুকনো বীজ যে কোন পরিস্কার শুকনো পাত্রে আর্দ্রতা কম এমন ঘরের শীতল স্থানে রাখলে এক বছর এমনকি দু' বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

গাছের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ শুটি পাকলে সকালের দিকে শুটিসহ গাছ কেটে মাড়াই করার স্থানে নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। প্রতি হেক্টর জমিতে টরি সরিষার চাষ করতে কত কেজি বীজের প্রয়োজন?

ক) ১২ কেজি	খ) ৮ কেজি
গ) ১৫ কেজি	ঘ) ২০ কেজি

২। সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা কোনটি?

ক) কাটুই পোকা	খ) জাব পোকা
গ) লেদা পোকা	ঘ) শুয়া পোকা

৩। টরি সরিষা কত দিনে পাকে?

ক) ১০০-১১০ দিনে	খ) ৯০-১০০ দিনে
গ) ৪০-৪৫ দিনে	ঘ) ৭০-৮০ দিনে

৪। লাইনে সরিষার বীজ বপন করলে দুই লাইনের দূরত্ব কত সেঃমিঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

ক) ১৫ সেঃমিঃ	খ) ২০ সেঃমিঃ
গ) ৩০ সেঃমিঃ	ঘ) ৪০ সেঃমিঃ

পাঠ ৪.৪ সয়াবীন চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- সয়াবীন চাষের জমি এবং মৌসুম নির্বাচন বর্ণনা করতে পারবেন।
- সয়াবীন বীজ বপন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সয়াবীন চাষের অন্তরায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

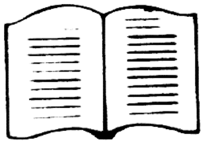

তৈলবীজ হিসেবে সয়াবীন বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী হলেও বাংলাদেশে এটি নগন্য পর্যায়ের ফসল। কিন্তু এ দেশে সয়াবীন তৈলের ব্যবহার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অর্থাৎ সরিষার পরেই এর স্থান।

দেশের ভোজ্য তৈলের ঘাটতি প রনের জন্য প্রধানত সয়াবীন তৈলই আমদানি করা হয়। আমিষ ও ভোজ্য তৈল উৎপাদনে সয়াবীন এখন অধিকাংশ দেশেই একটি প্রধান ফসল। কারণ এতে রয়েছে জাত ভেদে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ এবং ১৯-২২ ভাগ তৈল। অন্যান্য ডাল ও শুটিজাতীয় শস্যের তুলনায় সয়াবীন দামে প্রায় অর্ধেক কিন্তু দ্বিগুণ আমিষসমৃদ্ধ। আমাদের খাদ্য তালিকায় সয়াবীন

> তৈলবীজ হিসেবে সয়াবীন বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী হলেও বাংলাদেশে এটি নগন্য পর্যায়ের ফসল। কিন্তু এ দেশে সয়াবীন তৈলের ব্যবহার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অর্থাৎ সরিষার পরেই এর স্থান।

অন্তর্ভ ক্ত করে এ দেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে সয়াবীন একটি নুতন ফসল। এদেশের মাটি ও আবহাওয়া সয়াবীন চাষের উপযোগী। কিন্তু তৈল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এদেশে সয়াবীনের আবাদ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

মাটি ও আবহাওয়া

> এ দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় রবি এবং খরিপ উভয় মৌসুমই সয়াবীন চাষ করার উপযোগী।

সয়াবীন দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে চাষ করা যায়। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় রবি এবং খরিপ উভয় মৌসুমই সয়াবীন চাষ করার উপযোগী। খরিপ বা বর্ষা মৌসুমে জমি অবশ্যই উঁচু ও পানি নিষ্কাশনযোগ্য হতে হবে। রবি মৌসুমে মাঝারী থেকে নিচু জমিতে সয়াবীন চাষ করা যায়। আমন ধান কাটার পর কোন কোন অঞ্চলের বিরাট এলাকা পতিত থাকে। ঐ সব পতিত জমিতে সয়াবীন চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

জাত

ব্রাগ, ডেভিস এবং সোহাগ অনুমোদিত সয়াবীন জাত।

জমি তৈরি

মাটির প্রকার ভেদে সয়াবীনের জমিতে ৪-৫ টি চাষের প্রয়োজন হয়। মাটি ভালভাবে চাষ দিয়ে ঝুরঝুরে এবং আগাছা মুক্ত করে বীজ বপন করা উচিত। মই দিয়ে জমি সমান করার পর ছোট ছোট

প-ট তৈরি করলে পরবর্তীতে জমিতে সেচ দেওয়া, পানি নিষ্কাশন ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার সুবিধা হয়।

বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি

> সয়াবীন সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দ রত্ব রবি মৌসুমে ৩০ সেঃমিঃ এবং খরিপ মৌসুমে ৪০ সেঃমিঃ হওয়া উচিত।

সয়াবীন রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে সয়াবীনের বীজ ডিসেম্বরের

মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ বপন করা ভাল। খরিপ মৌসুমে জুলাই থেকে আগষ্ট মাস এর মধ্যে বীজ বপন করা উচিত। সয়াবীন সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপন করলে সারি

থেকে সারির দ রত্ব রবি মৌসুমে ৩০ সেঃমিঃ এবং খরিপ মৌসুমে ৪০ সেঃমিঃ হওয়া উচিত। সারিতে

৩-৪ সেঃমিঃ গভীর লাইনে ৪-৫ সেঃমিঃ দ রত্বে বীজ বপন করতে হয়। এভাবে বীজ বুনলে হেক্টর প্রতি ৫০-৬০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ

জমির উর্বরতার তারতম্যের কারণে এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভেদে সারের মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়।

সারণী - ১০ এ সয়াবীন চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সাধারণ ভাবে অনুমোদিত সারের মাত্রা উলে-খ করা হলো।

সারণী ১০: সয়াবীন চাষে রাসায়নিক সারের মাত্রা।

সার	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৫০-৬০
টি,এস,পি	১৫০-১৭৫
এম,পি	১০০-১২০
জিপসাম	৮০-১১৫

রাসায়নিক সারের সাথে পচা গোবর বা কম্পোস্ট হেক্টর প্রতি ২০ টন হারে জমিতে প্রয়োগ করলে

ফলন বৃদ্ধি পায়। সমস্ত সার জমিতে ছিটিয়ে শেষ চাষ ও মই দিয়ে মাটি সমান করে বীজ বপন করা উচিত। সয়াবীনের বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজে ২০ গ্রাম ইনোকুলাম/জীবাণু সার মিশিয়ে লাগালে গাছের শিকড়ে নডিউল (Nodule) বা গুটি সহজে সৃষ্টি হয়, ফলে নাইট্রোজেন যোগ সাধনের কাজ সহজতর হয়। ইনোকুলাম ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

আন্ত পরিচর্যা

প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিপ মৌসুমে ৪০-৫০ টি গাছ রাখা উত্তম।

চারা গজাবার ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হয়। চারা খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হয়। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিপ মৌসুমে ৪০-৫০ টি গাছ রাখা উত্তম। খরিফ মৌসুমের আবহাওয়া গাছের বৃদ্ধির জন্য বেশি সহায়ক। রবি মৌসুমে বৃষ্টি না হলে প্রথম সেচ বীজ গজানোর ২০-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ ৫০-৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। গাছের ফল ধরা এবং শুটি গঠনের সময় সম্পুরক সেচের প্রয়োজন হতে পারে। খরিপ মৌসুমে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না বরং সে সময় জমির পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়। তবে শুটি গঠনের সময় জমিতে রস কম থাকলে সম্পুরক সেচ প্রয়োগ করা ভালো।

বিছা পোকা সয়াবীনের মারাত্তক ক্ষতি করে। এ পোকার আক্রমণ বেশি হলে অথবা ছড়িয়ে পড়লে নগস ১০০ ইসি, এলসান ৫০ ইসি, মার্শাল ২০ ইসি -এর যে কোন একটি কীটনাশক প্রতি ১ লিটার

পানিতে ২ মিলি হিসেবে মিশিয়ে আক্রান্ গাছে ছিটাতে হয়। এ ছাড়া কান্ডের মাছি পোকা কান্ড ছিদ্র

করে ভিতরের নরম অংশ খেয়ে ফেলে। শতকরা ১০ ভাগ গাছ এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে

ডাইমেক্রন ১০০ ডবি-উ ইসি প্রতি ১ লিটার পানিতে ২ মিঃলিঃ হিসাবে মিশিয়ে ছিটাতে হয়।

সয়াবীন ক্ষেতে মাঝে মধ্যে ২-১ টা গাছে গোড়া পচা এবং পাতার হলুদ রোগ বা মোজাইক দেখা

দিতে পারে। জমি যদি স্যাঁতসেঁতে না থাকে তবে গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত হয় নাএব পাতায় হলুদ

রোগ বা মোজাইক দেখা দিলে আক্রান্ত গাছটি উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।

ফসল সংগ্রহ

সাধারণত মৌসুম ও এলাকা ভেদে হেক্টর প্রতি ১৫০০-২০০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

সয়াবীন বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ৯০-১২০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ক হলে গাছগুলো শুটিসহ হলুদ হয়ে আসে ও পাতাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করে। এ সময় গাছ কেটে ২-১ দিন

রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে পিটিয়ে দানাগুলো আলাদা করা যায়। মাড়াই করা বীজ রোদে

ভালো করে শুকিয়ে ঠান্ডা হলে গুদামজাত করতে হয়। সাধারণত মৌসুম ও এলাকা ভেদে হেক্টর প্রতি ১৫০০-২০০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

বীজ সংরক্ষণ

সয়াবীন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বেশী দিন বজায় থাকে না। সাধারণত ২-৩ মাস পরই বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমতে শুরু করে। তাই রোদের উত্তাপ খুব বেশি প্রখর হলে বীজ এক নাগারে ৩-৪ ঘন্টার বেশি রোদে রাখা ঠিক নয়। বীজ এমনভাবে শুকাতে হয় যাতে বীজে আর্দ্রতা ১০-১২% এর বেশি না থাকে। বীজ রাখার জন্য পলিথিনের ব্যাগ, টিনের ড্রাম, আলকাতরা মাখা মাটির মটকা বা কলসী, কেরোসিন বা বিস্কুটের টিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। বীজের পাত্র অবশ্যই ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে এবং সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচা বা কাঠের তক্তার উপর রাখলে ভাল হয়।

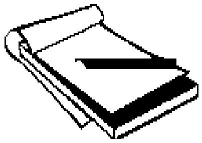

অনুশীলন (Activity): *সরিষা কিংবা সয়াবীনের বিস্তারিত চাষ পদ্ধতি লিখুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সয়াবিন বীজে শতকরা কত ভাগ আমিষ বিদ্যমান?

ক) ৩০ ভাগ　　খ) ৪০ ভাগ

গ) ৬০ ভাগ　　ঘ) ২০ ভাগ

২। সয়াবিন বীজে শতকরা কত ভাগ তেল বিদ্যমান?

ক) ৩০ ভাগ　　খ) ২০ ভাগ

গ) ১৫ ভাগ　　ঘ) ৪০ ভাগ

৩। কোন পোকা সয়াবিনের বেশি ক্ষতি করে?

ক) বিছা পোকা　　খ) কাটুই পোকা

গ) জাব পোকা　　ঘ) লেদা পোকা

১। তৈল ফসলের উৎপাদন বাড়লেও ঘাটতি কমছে না কেন?

২। তৈল ফসলের চাষ করে তৈল, দুধ, মধু, সার এবং সৌন্দর্য্যের চাহিদা পুরণ করা যায় - ব্যাখ্যা কর€ন।

৩। সরিষাকে মধু উদ্ভিদ বলা হয় কেন?

৪। এ দেশে সরিষার আবাদ কীভাবে বৃদ্ধি করা যাবে?

৫। সরিষার খৈল কী কী কাজে ব্যবহার করা যায়?

৬। সরিষার জমিতে মৌমাছি চাষ করলে ফলন বৃদ্ধি পায় কেন?

৭। সরিষার জমি মিহি করে তৈরি করতে হয় কেন?

৮। সরিষার জমিতে হেক্টর প্রতি কতটুকু রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়?

৯। সরিষার জমিতে কতবার সেচ দিলে ফলন ভাল হয়?

১০। এদেশের মানুষকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে সয়াবীন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে - ব্যাখ্যা করুন।

১১। রবি মৌসুমে সয়াবীনের চাষ করতে প্রতি বর্গ মিটারে গাছের সংখ্যা গ্রীষ্মকালের তুলনায় বেশি রাখতে হয় কেন?

১২। এদেশে সয়াবীন চাষের প্রধান অন্তরায় কী?

উত্তরমালা

পাঠ ৪.১

১। ক, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। ক

পাঠ ৪.২

১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক

পাঠ ৪.৩

১। খ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। গ

পাঠ ৪.৪

১। খ, ২। খ, ৩। ক

ইউনিট ৫ তৈল ফসলের চাষ - ২

ইউনিট ৫ তৈল ফসলের চাষ - ২

তৈল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী অপ্রধান তৈল ফসল হিসেবে এদেশে বহুকাল যাবত আবাদ হয়ে আসছে। উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের তৈল ঘাটতি মিটাতে এসব ফসলও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ইউনিটে অপ্রধান তৈল ফসলের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র ইউনিটে এদেশের প্রধান তৈল ফসল সরিষা এবং তিলের গাছের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য দু’টি ব্যবহারিক পাঠের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

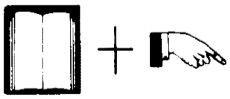

পাঠ ৫.১ তিল ও তিসির চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- তিল ও তিসি চাষের উপযুক্ত জমি নির্বাচন ও বীজ বপন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- তিল ও তিসির উপযুক্ত চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তিল ও তিসির জমিতে সার প্রয়োগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তিল চাষ পদ্ধতি

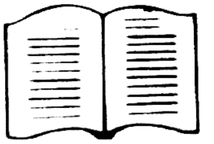

> তিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভোজ্য তৈলবীজ ফসল। উৎপাদন এলাকার দিক হতে সরিষার পরই এর স্থান।

তিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভোজ্য তৈলবীজ ফসল। উৎপাদন এলাকার দিক হতে সরিষার পরই এর স্থান। তবে বাংলাদেশে এর তৈল ভোজ্য তৈল হিসেবে সরিষার তৈলের মত তত জনপ্রিয় নয়। মাথায় ব্যবহারের তৈল হিসেবে এর কিছু কদর আছে। তিলের বীজে শতকরা ৪২-৪৫ ভাগ তৈল এবং শতকরা ২০ ভাগ আমিষ থাকে। খাদ্যমানের দিক থেকে তিলের তৈল অনেক উন্নত। সুষ্ঠু পরিচর্যার মাধ্যমে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ১২০০ কেজি ফলন পাওয়া যেতে পারে। তবে এদেশে বেশির ভাগ কৃষক এ ফসল যত্ন সহকারে চাষ করে না বলে হেক্টর প্রতি ৫৫০ কেজির বেশি ফলন পায় না।

মাটি ও আবহাওয়া

> ২৫-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিলের আবাদ ভাল হয়।

পানি জমে না এমন সব ধরনের মাটিতে তিলের চাষ করা যায়। উঁচু বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি তিল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তিল ফসল তাপ ও আলো সংবেদনশীল নয় বলে সারা বছর এর চাষ করা যায়। আমাদের দেশে রবি এবং খরিপ উভয় মৌসুমেই তিলের আবাদ করা যায়, তবে বর্তমানে দুই তৃতীয়াংশ তিলের আবাদ খরিপ মৌসুমে হয়। ২৫-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিলের আবাদ ভাল হয়।

জাত

টি-৬ তিলের অনুমোদিত জাত।

জমি তৈরি

তিলের জমি হালকা বলে বেশি চাষ - মইয়ের প্রয়োজন হয় না। ৩-৪ টি চাষ ও মই দিলেই জমি প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে যায়। বীজ বপনের পূর্বে জমি মই দিয়ে অবশ্যই সমান করতে হয়। তিলের জমিতে বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি সহজে নিষ্কাশনের জন্য জমিতে মাঝে মাঝে নালা রাখতে হয়।

বপনের সময়

> খরিপ-১ মৌসুমে মধ্য ফেব্রুয়ারী হতে মধ্য এপ্রিল, খরিপ-২ মৌসুমে মধ্য আগষ্ট হতে মধ্য সেপ্টেম্বর এবং রবি মৌসুমে অক্টোবর হতে নভেম্বরের মাঝামাঝি তিলের বীজ বপনের উত্তম সময়।

খরিপ-১ মৌসুমে মধ্য ফেব্রুয়ারী হতে মধ্য এপ্রিল, খরিপ-২ মৌসুমে মধ্য আগষ্ট হতে মধ্য সেপ্টেম্বর এবং রবি মৌসুমে অক্টোবর হতে নভেম্বরের মাঝামাঝি তিলের বীজ বপনের উত্তম সময়। তিলের বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। তবে সারিতে বপন করলে অন্তর্বতীকালীন বিভিন্ন পরিচর্যার সুবিধা হয়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরুত্ব ৩০ সেঃমিঃ রাখতে হয়। এতে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। তিলের বীজ অত্যন্ত ছোট বলে বীজ ছিটানোর পূর্বে তা বালি, মাটি বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে ছিটালে জমিতে সমান ও ভালভাবে বীজ পড়ে। একক ফসল ছাড়াও তিল অন্যান্য ফসল যেমন ধান, কাউন, পাট, আখ, চীনাবাদাম, মুগকলাই প্রভৃতি ফসলের সাথে মিশ্রভাবে চাষ করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুসারে সারের মাত্রার তারতম্য হয়। সঠিক সময়ে পরিমিত সার প্রয়োগ করে তিলের ফলন বাড়ানো যায়। সারণী - ১১ এ বর্ণিত হেক্টর প্রতি ১০০ - ১২৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩০ - ১৫০ কেজি টি,এস,পি এবং ৪০-৫০ কেজি এম,পি সার ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। জমি তৈরীর সময়

ইউরিয়া সারের অর্ধেক ও বাকি সব সার শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর গাছে ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন জমিতে রস থাকে। রস না থাকলে সেচ দেওয়ার পর সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারণী ১১: তিল ফসলের জন্য অনুমোদিত সারের মাত্রা

সার	মাত্রা (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	১০০-১২৫
টি,এস,পি	১৩০-১৫০
এম,পি	৪০-৫০
জিপসাম	১০০-১১০
জিংক সালফেট	৫
বরিক এসিড	১০

আন্ পরিচর্যা

চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর জমিতে অতিরিক্ত চারা থাকলে তা তুলে ফেলতে হয়। বীজ বোনার ১০-১৫ দিন পর জমিতে আগাছা থাকলে নিড়ানী দিয়ে তা অবশ্যই পরিস্কার করা উচিত। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর সেচের প র্বে আরও একবার আগাছা পরিস্কার করার প্রয়োজন হতে পারে।

কান্ড পচা রোগ তিলের জন্য একটি বিশেষ রোগ। জমিতে জলাবদ্ধতার কারনে এ রোগের প্রাদ র্ভাব বৃদ্ধি পায়। এ রোগটি বীজ বাহিত ছত্রাক দ্বারা সৃষ্টি হয় বলে বেভিষ্টিন, ক্যাপ্টান, হোমাই বা ভিটাভেক্স-২০০ এর যে কোন একটি ছত্রাক নাশক দ্বারা প্রতি কেজি শুকনো বীজে ২-৩ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে বীজ শোধন করে বীজবাহিত ছত্রাক প্রাথমিক পর্যায়েই দমন করা যায়। তিলে কখনও কখনও পাতার দাগজনিত রোগ দেখা যায়। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে বেভিষ্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম অথবা ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হিসেবে প্রতি ১০ দিন পর পর তিনবার জমিতে ছিটালে রোগের প্রকোপ কমে যায়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

তিল ফসলের ফসলকাল ৮৫-৯০ দিন।

তিল ফসলের ফসলকাল ৮৫-৯০ দিন। নিচের শুটি পাকা শুরু করলেই কাঁচি দিয়ে গাছের গোড়া বা ফলসহ কান্ড কেটে আটি বেঁধে মাড়াই করার স্থানে দু' তিন দিন স্তুপ করে রাখতে হয়। পরে আটি খুলে গাছগুলো শুটিসহ রোদে ভাল করে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা মাড়াই করে শুটি থেকে বীজ আলাদা করা হয়। তারপর কুলো দিয়ে ঝেড়ে বীজ আবর্জনা মুক্ত করে তিন চার দিন ভাল করে রোদে শুকিয়ে বীজ সংরক্ষন করতে হয়।

তিসির চাষ পদ্ধতি

তিসি এমনই একটি শস্য যা হতে তৈল এবং আঁশ দুটোই পাওয়া যায়। তৈল ফসল হিসেবে আয়তনের দিক হতে সরিষা, তিল এবং চিনাবাদামের পর তিসির স্থান। বাংলাদেশে যে তিসির আবাদ করা হয় তা হতে প্রধানতঃ তৈলই প্রস্তুত করা হয়।

মাটি ও আবহাওয়া

ভারী অর্থাৎ এঁটেল মাটি তিসি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে পলি দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতেও তিসির চাষ করা যায়। নাতিশীতো* ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় তিসি ভাল জন্মে। তবে অত্যধিক ঠান্ডায় (১০-১৫ ডিগ্রী সেঃ) তিসি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিক বৃষ্টিপাত তিসির জন্য মোটেই ভাল নয়। বাংলাদেশে রবি মৌসুমে জমিতে সঞ্চিত রসেই ফসলটি জন্মাতে পারে।

জাত

নীলা - ১ অনুমোদিত তিসির জাত।

জমি তৈরি

তিসি যেহেতু ছোট দানাদার বীজ সেহেতু সরিষা এবং তিলের মত ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়।

তিসি যেহেতু ছোট দানাদার বীজ সেহেতু সরিষা এবং তিলের মত ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। চার-পাঁচটি আড়াআড়ি চাষ ও দু-তিনটি মই দিয়ে জমি মসৃণ ভাবে তৈরী করা যায়।

বীজ বপনের সময় ও বপন পদ্ধতি

নভেম্বর মাস তিসি বপনের উপযুক্ত সময়।

নভেম্বর মাস তিসি বপনের উপযুক্ত সময়। কৃষকেরা সাধারণত বীজ ছিটিয়ে বপন করে, তবে সারি করে বীজ বপন করাই উত্তম। প্রতি সারির মধ্যে ৩০ সেঃমিঃ ও সারিতে চারার মধ্যে ৫-১০ সেঃমিঃ দ রত্ব থাকা উচিত। বীজ ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টর প্রতি ১৫-১৭ কেজি, আর সারিতে বুনলে হেক্টর প্রতি ১০-১৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ

সাধারণত কৃষকগন তিসির ক্ষেতে সার প্রয়োগ করেন না। তবে প্রতি হেক্টরে ৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১২০ কেজি টি,এস,পি এবং ৪৬ কেজি এম,পি সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

আন্ পরিচর্যা

তিসি আগাছার সঙ্গে মোটেই প্রতিযোগিতা করতে পারে না। সেজন্য তিসি ক্ষেতে আগাছা সময়মত পরিস্কার করা খুবই দরকার।

তিসি আগাছার সঙ্গে মোটেই প্রতিযোগিতা করতে পারে না। সেজন্য তিসি ক্ষেতে আগাছা সময়মত পরিস্কার করা খুবই দরকার। হঠাৎ বৃষ্টি অথবা সেচের কারণে জমিতে পানি জমে গেলে তা যথাশীঘ্র নিষ্কাশন করা উচিত। তিসি ফসলে কোন কোন সময় জাব পোকার আক্রমণ হতে পারে। উক্ত পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ৫.৭৬ গ্রাম মেলাথিয়ন ৫৫০ লিটার পানির সংগে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ র সাহায্যে ক্ষেতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও মাড়াই

তিসির ফসলকাল ১২০-১৩০ দিন।

তিসির ফসলকাল ১২০-১৩০ দিন। ফল ভালভাবে পাকার পর যখন ফাটার উপক্রম হয় তখন গাছ কেটে আটি বেধে স্তুপ করে রাখা উচিত। কয়েকদিন রোদ দিয়ে গাছ ভালভাবে শুকাবার পর হাত দিয়ে বা লাঠির সাহায্যে আস্তে আস্তে আঘাত করলেই ফল ফেটে বীজ বের হয়ে আসে। তখন গাছগুলো ঝাড়া দিলে বীজ আলাদা হয়ে যায়। পরে বীজ কুলা অথবা চালনী দিয়ে পরিস্কার করতে হয়। তিসির বীজ দু’ তিন দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ঢাকনাযুক্ত কেরোসিনের টিনে অথবা পলিথিন ব্যাগে বীজ রেখে তা গুদামজাত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। তিল বীজে শতকরা কত ভাগ তৈল বিদ্যমান?

ক) ৪২-৪৫ ভাগ খ) ৫২-৫৫ ভাগ

গ) ৩২-৩৫ ভাগ ঘ) ৬২-৬৫ ভাগ

২। এক হেক্টর জমিতে তিলের আবাদ করতে কত কেজি বীজ বপন করতে হয়?

ক) ৮-১০ কেজি খ) ১২-১৫ কেজি

গ) ১৫-২০ কেজি ঘ) ২৪-২৫ কেজি

৩। তিসি চাষের জন্য কোন ধরনের জমি সবচেয়ে উপযোগী?

ক) এঁটেল মাটি খ) দোআঁশ মাটি

গ) বালি মাটি ঘ) পলি মাটি

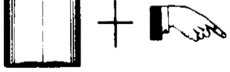

পাঠ ৫.২ চিনাবাদামের চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- চিনাবাদামের উন্নত জাত সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- চিনাবাদাম চাষের মৌসুম, জমি নির্বাচন এবং চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- চিনাবাদামের ফলন বৃদ্ধির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

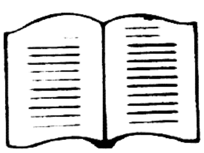

খোসা ছাড়ানো বাদাম বীজে শতকরা ৪৮-৫২ ভাগ তৈল ও ২৪ - ২৬ ভাগ প্রোটিন থাকে।

চিনাবাদাম একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য তৈলবীজ এবং পুষ্টিকর খাদ্য। খোসা ছাড়ানো বাদাম বীজে শতকরা ৪৮-৫২ ভাগ তৈল ও ২৪ - ২৬ ভাগ প্রোটিন থাকে। আমাদের দেশে আবাদকৃত তৈলবীজ ফসলের মধ্যে এটিই কেবল লিগুমিনোসী (Leguminosae) পরিবারভূক্ত এবং ম লে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদন করে প্রতি ঋতুতে হেক্টর প্রতি ৮০-১৬০ কেজি নাইট্রোজেন জমা করতে পারে। যে পরিমাণ চিনাবাদাম এদেশে উৎপন্ন হয় তার বেশির ভাগই ভেজে সরাসরি খাওয়া হয়। এদেশে ভোজ্যতৈল হিসেবে সরিষা বা সয়াবীন তৈলের মতো চিনাবাদাম তৈল তেমন সমাদর লাভ করতে পারেনি। রবি মৌসুমে নদীর চর এলাকায় চিনাবাদামের চাষ বৃদ্ধি করার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

মাটি ও আবহাওয়া

যে অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০৭০-১১৪০ মিঃমিঃ সেখানে খুব ভাল চিনাবাদাম জন্মে।

চিনাবাদাম চাষের জন্যে বেলে দোআঁশ, দোআঁশ বা বেলে মাটি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু চিনাবাদামের প্যাগ বা বর্ধিত গর্ভাশয় (Gynophore) যাতে সহজেই মাটি ভেদ করে নিচে যেতে পারে সেজন্য মাটি বেশ নরম ও হালকা হওয়া চাই। চিনাবাদাম গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে হালকা বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত স র্যকিরণ ও তাপমাত্রা বিশেষভাবে উপযোগী। রবি মৌসুমে চিনাবাদামের চাষ ভাল হয়। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকলে উঁচু জমিতে খরিপ মৌসুমেও চিনাবাদামের আবাদ করা যায়। যে অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০৭০-১১৪০ মিঃমিঃ সেখানে খুব ভাল চিনাবাদাম জন্মে।

জাত

ঢাকা-১, বাসন্তী বাদাম, ত্রিদানা বাদাম এবং ঝিংগা বাদাম অনুমোদিত বাদামের জাত।

জমি তৈরি

জমির প্রকারভেদে ৪-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। চিনাবাদামের মূল ও গাছের প্যাগ মাটির গভীরে প্রবেশ করে, তাই চাষের গভীরতা ৩০ সেঃমিঃ পর্যন্ত করলে ফলন বেশ বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগ

চিনাবাদাম চাষে সার প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে খরিপ মৌসুমে সাধারণত চিনাবাদাম বেশ উঁচু জমিতেও চাষ করা হয়। এরূপ জমিতে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদানের অভাব থাকতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে সারণী-১২ তে বর্ণিত সারগুলো উল্লিখিত হারে ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সারণী ১২: ডচনাবাদাম ফসলের জন্য অনুমোদিত সারের মাত্রা।

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২৫
টি,এস,পি	১৬০
এম,পি	৮৫
জিপসাম	১৭০
জিংক অক্সাইড	৫
বোরাক্স	১০

অর্ধেক ইউরিয়া এবং জিপসাম এবং বাকি সকল সারের সবটুকু বীজ বপনের পূর্বে শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। সেই সময় জমিতে রস না থাকলে প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়ার পর জমিতে জো আসলে সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। চিনাবাদাম গাছ সীম জাতীয় বলে শিকড়ে গুটি তৈরি করে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নিজের চাহিদা মিটাতে পারে। তাই জীবাণু সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেও চলে।

> চিনাবাদাম গাছ সীম জাতীয় বলে শিকড়ে গুটি তৈরি করে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নিজের চাহিদা মিটাতে পারে। তাই জীবাণু সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেও চলে।

বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি

রবি মৌসুমে (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর) চিনাবাদাম চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বীজ বপনের আগে বাদামের খোসা হতে বীজ ছাড়িয়ে নিতে হয়। নিম্নে জাত অনুযায়ী বীজের পরিমাণ ও বীজ বপনের সময় উল্লেখ করা হলো (সারণী - ১৩)।

সারণী ১৩: চিনাবাদামের জাত, বীজের পরিমাণ এবং বপনের সময়

জাত	খোসাসহ বীজের পরিমাণ	বীজ বপনের সময়		
		রবি মৌসুম	**খরিপ-১ মৌসুম**	**খরিপ-২ মৌসুম**
	(কেজি/হেক্টর)	মধ্য অক্টেবর হইতে মধ্য নভেম্বর	মধ্য ফেব্রুয়ারী হইতে মধ্য মার্চ	মধ্য মে হইতে মধ্য জুন
মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১)	৯৫-১০০	চ	চ	চ
ঝিংগা বাদাম (এসিসি-১২)	১০৫-১১০	চ	চ	চ
বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২)	১০৫-১১০	চ	চ	চ
ত্রিদানা বাদাম (ডি.এম-১)	১১০-১১৫	চ	চ	চ

চিনাবাদামের বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেঃমিঃ এবং প্রতি সারিতে গাছের দ রত্ব ১৫ সেঃমিঃ। শুধুমাত্র ত্রিদানা জাতের সারি থেকে সারির দ রত্ব ২৫ সেঃমিঃ এবং সারিতে গাছের দ রত্ব ১০ সেঃমিঃ রাখা প্রয়োজন। বীজ হালকা মাটিতে ২.৫-৪.০ সেঃমিঃ গভীরে বপন করতে হয়।

আন্ত পরিচর্যা

> টিক্কা বা পাতায় বাদামি দাগপড়া রোগ বাদাম ফসলের প্রধান সমস্যা। রোগ দেখা মাত্র প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ব্যভিষ্টিন ঔষধ মিশিয়ে পাতায় ছিটাতে হয়।

বীজ লাগানোর দু'সপ্তাহের মধ্যেই চিনাবাদাম বীজগুলো গজায় এবং একমাস থেকেই ফুল ধরা শুরু হয়। শক্ত মাটি হলে ফুল আসার পর গাছে বাদাম ধরার প্রাক্কালে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়।

চীনা বাদাম ফসলে বিছা পোকার আক্রমণই বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক পর্যায় আক্রান্ত পাতা ছিড়ে ফেলে বিছা পোকার ডিম ও অল্প বয়স্ক কীড়া দমন করা যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত বিছাপোকা দমনের জন্য রিপকর্ড ১০ ইসি বা নগস ১০০ ইসি ১ মিঃলিঃ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। টিক্কা বা পাতায় বাদামি দাগপড়া রোগ বাদাম ফসলের প্রধান সমস্যা। রোগ দেখা মাত্র প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ব্যভিষ্টিন ঔষধ মিশিয়ে পাতায় ছিটাতে হয়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

চিনাবাদাম গাছের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বাদাম যখন পরিপক্ক হয় তখন বাদামের খোসার শিরা উপ-শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। গাছের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে নিচের পাতা ঝরে পড়ে। কোদাল বা দেশী লাংগলের সাহায্যে চিনাবাদাম উঠানো যায়। বাদাম ক্ষেত হতে উঠানোর পর গাছ হতে আলাদা করে ফেলতে হয়। খোসাসহ বাদাম উজ্জল রোদ্রে দৈনিক ৭-৮ ঘন্টা করে ৫-৬ দিন শুকিয়ে (বীজের আর্দ্রতা ৮-১০%) সংরক্ষণ করতে হয়। বর্ষাকালে প্রতি মাসে এক বা দু' বার শুকিয়ে রাখলে বীজ ভাল থাকে। ফসল ভাল হলে প্রতি হেক্টর প্রতি ২০০০-২২০০ কেজি বাদাম উৎপন্ন হতে পারে।

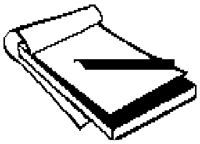

অনুশীলন (Activity) *চিনাবাদাম এবং সরিষা চাষের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় ভিন্নতা রয়েছে উল্লেখ করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। খোসা ছাড়ানো চিনাবাদামের বীজে শতকরা কত ভাগ আমিষ থাকে?

ক) ৪৫-৫০ ভাগ খ) ৬৫-৭০ ভাগ

গ) ৩৫-৪০ ভাগ ঘ) ২৪-২৬ ভাগ

২। খোসা ছাড়ানো চিনাবাদাম বীজে শতকরা কত ভাগ তৈল বিদ্যমান?

ক) ৪০-৪৫ ভাগ খ) ৪৮-৫২ ভাগ

গ) ৩৫-৪০ ভাগ ঘ) ১০-১৫ ভাগ

৩। বাসন্তী বাদামের বীজহার কত (কেজি/হেক্টর)?

ক) ৯৫-১০০ খ) ১০৫-১১০

গ) ১২০-১২৫ ঘ) ১৩০-১৩৫

৪। ভাল ফলন হলে হেক্টর প্রতি কত কেজি বাদাম উৎপন্ন হয়?

ক) ১০০০-১২০০ খ) ১২০০-১৪০০

গ) ১৬০০-১৮০০ ঘ) ২০০০-২২০০

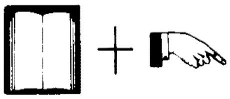

পাঠ ৫.৩ সূর্যমুখীর চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- তৈলবীজ হিসাবে সূর্যমূখী চাষের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সূর্যমুখী চাষের উপযুক্ত জমি এবং মৌসুম নির্বাচনে করতে পারবেন।
- এদেশে সূর্যমুখী চাষের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

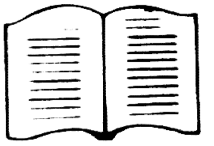

সূর্যমুখী বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তৈলশস্য। বীজে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল বিদ্যমান। সাধারণ তৈলঘানিতে এর বীজ ভাঙ্গানো যায়। এ তৈলে কোন ক্ষতিকারক ইরোসিক এসিড নেই বরং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী লিনোলিক এসিড বিদ্যমান। অনেক আগে থেকেই বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুল হিসেবে সূর্যমুখী এ দেশে পরিচিত তবে তৈলশস্য হিসেবে ইদানিং এর কিছু কিছু চাষ হচ্ছে। খরিপ এবং রবি এ দু' মৌসুমেই সূর্যমুখীর চাষ করা চলে। কাজেই দেশের তৈল ঘাটতির জন্য সূর্যমুখীর চাষ সহায়ক হতে পারে।

> সূর্যমুখী বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তৈলশস্য। বীজে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল বিদ্যমান।

মাটি ও আবহাওয়া

সূর্যমুখী উঁচু জমির বিভিন্ন প্রকার মাটিতে চাষ করা যায়। সাধারণত দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে সূর্যমুখী ভাল ফলন দেয়। সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতে সূর্যমুখী ভাল জন্মায়। সূর্যমুখী কিছুটা খরা সহনশীল কিন্তু বেশি বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো আবহাওয়া এর ব্যাপক ক্ষতি করে। এজন্য বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে এর চাষ করা উচিত নয়। বছরে প্রায় সব ঋতুতেই এর চাষ করা যায়।

জাত

কিরনী বা ডি-এস-১ সূর্যমুখীর একটি অনুমোদিত জাত।

জমি তৈরি

গূর্যমুখী চাষে মাটি খুব বেশি মিহি হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে মাটি বেশ গভীরভাবে চাষ হওয়া দরকার। জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও ভাল করে মই দিয়ে সমান করে তৈরি করতে হয়।

সার প্রয়োগ

সার ব্যবহার করলে এর ফলন বেশি পাওয়া যায়। হেক্টর প্রতি ১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি টি,এস,পি এবং ৬০ কেজি এস,পি সার প্রয়োগ করা ভাল। ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং বাকি সব সার শেষ চাষের সময় মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পরে পার্শ্ব প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়।

বীজ বপন

সাধারণত রবি মৌসুমে নভেম্বর মাসে এবং খরিপ মৌসুমে এপ্রিল মাসে বীজ বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। সূর্যমুখী সাধারণত সারিতে বোনা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সেঃমিঃ এবং সারিতে গাছের দূরত্ব ২০-২২ সেঃমিঃ দিলে ভাল হয়। এই হিসেবে ১৪-১৫ কেজি বীজ এক হেক্টরের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর অংকুরোদগম ক্ষমতা বেশি দিন থাকে না বলে বীজ বোনার আগে তা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

> সাধারণত রবি মৌসুমে নভেম্বর মাসে এবং খরিপ মৌসুমে এপ্রিল মাসে বীজ বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

আন্ত পরিচর্যা

বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং ফুল আসার আগে আর একবার জমিতে নিড়ানী দেওয়া প্রয়োজন হয়। খরিপ মৌসুমে সেচের পরিবর্তে পানি নিকাশের বিশেষ প্রয়োজন হয়। রবি মৌসুমে ২-

৩ বার সেচের আবশ্যক হয়। বিশেষ করে গাছে ফুল আসার সময় ও দানা বাধার সময়ে মাটিতে রসের টান পড়লে ফলন বেশ কমে যায়। সেচের পর ইউরিয়া সার গাছের সারিতে মাটিতে পার্শ্ব প্রয়োগ করা

বীজ পাকার সময় টিয়া পাখী বীজ খেতে পারে তাই পাহারা দিয়ে টিয়া পাখির হাত হতে ফসল রক্ষা করতে হয়।

যেতে পারে। স র্যমুখীতে রোগ ও পোকার আক্রমণ খুব কম হয়। বীজ পাকার সময় টিয়া পাখী বীজ খেতে পারে তাই পাহারা দিয়ে টিয়া পাখির হাত হতে ফসল রক্ষা করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল ভাল হলে প্রতি হেক্টরে ১৪০০-১৫০০ কেজি বীজ উৎপন্ন হতে পারে।

স র্যমুখী কাটার সময় হলে গাছের পাতা হলদে হয়ে যায় এবং গাছ নুয়ে পড়ে। এ ছাড়া বীজগুলো কালো রং ধারণ করে। মৌসুম এবং জাতভেদে ফসল পাকতে ৯০-১১০ দিন সময় লাগে। ফসল পাকলে গাছ থেকে মাথাগুলো কেটে দানা (বীজ) ছাড়িয়ে রোদে ভালো করে শুকিয়ে কেরোসিনের ড্রাম, টিন বা মাটির পাত্রে গুদামজাত করতে হয়। মাঝে মাঝে আবার বীজগুলো রোদে শুকালে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা অনেকদিন বজায় থাকে। ফসল ভাল হলে প্রতি হেক্টরে ১৪০০-১৫০০ কেজি বীজ উৎপন্ন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সূর্যমুখী বিশ্বের মধ্যে কোন স্থান অধিকারী তৈল ফসল?

ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়

গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

২। কোন পাখি সূর্যমুখীর খুব ক্ষতি করে থাকে?

ক) কাক খ) টিয়া

গ) ময়না ঘ) চড়ুই

৩। সূর্যমুখীতে কোন এসিড বিদ্যমান?

ক) ইরোসিক এসিড খ) লিনোলিক এসিড

গ) এসিটিক এসিড ঘ) সাইট্রিক এসিড

৪। ভাল ফসল হলে হেক্টর প্রতি কত কেজি সূর্যমুখীর বীজ উৎপন্ন হতে পারে।

ক) ৮০০-৯০০ কেজি খ) ১০০০-১১০০ কেজি

গ) ১৪০০-১৫০০ কেজি ঘ) ১৮০০-২০০০ কেজি

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৪ সরিষার জমি পরিদর্শন, গাছের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন পর্যবেক্ষণ

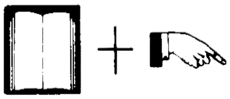

এ কাজ শেষে আপনি

- বিভিন্ন জাতের সরিষার গাছ চিনতে পারবেন।
- সরিষা গাছ কত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি লাভ করে তা বলতে পারবেন।
- কতদিনে সরিষা পরিপক্ক হয় সে সম্পূর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

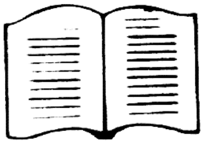

পাঠ্যজ্ঞান থেকে নিশ্চয়ই জেনেছেন যে বাংলাদেশে টরি, শ্বেত এবং রাই এই তিন ধরনের সরিষার আবাদ হয়ে থাকে। নিম্নে তিন ধরনের সরিষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলোঃ

ক) টরি সরিষা

এ জাতের সরিষা গাছের পাতার রং ফিকে সবুজ, পাতার গোড়ার দিকটা কান্ডের সাথে লাগানো। পাতা প্রায় ১০ সেঃমিঃ লম্বা ও ৫ সেঃমিঃ চওড়া। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ৭৬ সেঃমিঃ। প্রতি গাছে গড়ে ৪-৫ টি শাখা হতে পারে, শাখা কান্ডের সাথে ৩০-৪০ ডিগ্রী কোন উৎপন্ন করে। গাছে মোট ১৪-১৫ টি ফুলের গোছা হয়ে থাকে। শুটি লম্বায় ৪ সেঃমিঃ হতে ৬ সেঃমিঃ পর্যন্ত হতে পারে। পরিপক্ক বীজের রং কালচে বাদামি এবং বীজের মাঝামাঝি অংশে একটি ছোট ঘন বাদামি রংয়ের দাগ দেখা যায়। প্রতিটি শুটিতে ১০-১৫ টি বীজ জন্মে এবং প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ২.৫০ গ্রাম। গাছে ৭০-৮০ দিনের মধ্যে বীজ পরিপক্কতা লাভ করে।

> প্রতি গাছে গড়ে ৪-৫ টি শাখা হতে পারে, শাখা কান্ডের সাথে ৩০-৪০ ডিগ্রী কোন উৎপন্ন করে।

খ) রাই সরিষা

রাই সরিষার পাতা সবুজ আর নিচের পাতাগুলোতে বোটা আছে। পাতা লম্বায় প্রায় ১৬ সেঃমিঃ এবং প্রস্থে ৭ সেঃমিঃ। টরির পাতা যেখানে মসৃণ সেক্ষেত্রে রাইয়ের পাতা খসখসে। সমস্ত সরিষার মধ্যে রাই সরিষার গাছ সবচেয়ে উঁচু। গাছের উচ্চতা ১.২৫-১.৮০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি গাছে ৫-৬ টি শাখা হয়। শাখা কান্ডের সাথে ২০-৩০ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে। প্রতি শাখায় ২৪-২৫ টি ফুলের গোছা হয়। ফুলগুলো টরি সরিসার চাইতে কিছু ছোট। শুটি লম্বায় ৫ সেঃমিঃ পর্যন্ত হতে পারে, প্রতিটি শুটিতে ১২-১৮ টি বীজ হয়, পাকা বীজের রং ঘন বাদামি। রাইয়ের বীজগুলো টরির বীজ হতে কিছুটা ছোট। ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ১.৮০ গ্রাম। বীজ বপনের সময় হতে ফসল পাকা পর্যন্ত ৯৫-১০০ দিন সময় লাগে।

> ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ১.৮০ গ্রাম।

গ) শ্বেত সরিষা

গাছ দেখতে অনেকটা রাই সরিষার মত লম্বা, তবে টরি ও রাই সরিষার চাইতে মোটা ও ভিন্ন ধরনের। বীজ হলুদ রংয়ের, খোসা পাতলা ও আকারে বড়। অন্যান্য সরিষার চেয়ে ২-৩% তৈল বেশী থাকে। ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.৭৫ গ্রাম। বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত এতে মোট ৯৫-১০৫ দিন সময় লাগে।

ঘ) ব্রাসিকা নেপাস

ব্রসিকা নেপাস এদেশে নতুন ধরনের সরিষা। এ জাতের সরিষার গাছ অনেকটা টরি সরিষার মত। নেপাসের পাতার গোড়া কান্ডকে অর্ধেকটা ঘিরে রাখে এবং প্রস্ফুটিত ফুলগুলো ফুলকুঁড়ির নিচে থাকে। শাখাবহুল কোমল উদ্ভিদ, পাতা মসৃণ, দেখতে অনেকটা কপি পাতার মতো, নিচের পাতা সাধাণত খন্ডিত ও বোটাযুক্ত, কিন্তু উপরের পাতার কিনারা সোজা, বোটাহীন এবং কান্ডকে জড়িয়ে রাখে। ফুল ফ্যাকাসে হলুদ বর্ণের।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পেন্সিল, খাতা, স্কেল।

কাজের ধাপ

১। টরি, শ্বেত এবং রাই সরিষার চাষ করে এমন তিনজন কৃষক নির্বাচন করুন।

২। তিনজাতের সরিষার জমি প্রথম হতে পরিদর্শন করুন এবং নিু বর্ণিত উপাত্ত খাতায় লিপিবদ্ধ কর€ন।

ক) বীজ বোনার তারিখ।

খ) চারা গজানোর তারিখ।

গ) সাত দিন পর পর ১০ টি গাছের উচ্চতা ।

ঘ) গাছে ফুল ফোটার তারিখ।

ঙ) গাছ পরিপক্ক হওয়ার তারিখ।

৩। প্রতি ৭ দিনে প্রতি জাতের গাছ কী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তা লিখে রাখুন।

৪। কতদিনে বিভিন্ন জাতের সরিষার গাছে ফুল ফোটে তা লিখে রাখুন।

৫। পরিপক্ক বয়সে কোন জাতের সরিষা গাছের উচ্চতা কত সেঃমিঃ হয় তা লিখে রাখুন।

৬। কতদিনে কোন জাতের সরিষা পাকে তা লিখে রাখুন।

৭। তিন জাতের সরিষার বীজ শনাক্ত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কোনজাতীয় সরিষায় স্বল্প সময়ে ফুল ফোটে?

ক) টরি খ) শ্বেত

গ) রাই ঘ) নেপাস

২। কোনজাতীয় সরিষা স্বল্প সময়ে পাকে?

ক) টরি খ) শ্বেত

গ) রাই ঘ) নেপাস

৩। কোনজাতীয় সরিষার গাছের উচ্চতা বেশী?

ক) টরি খ) শ্বেত

গ) রাই ঘ) নেপাস

৪। কোনজাতীয় সরিষার বীজের আকার বড়?

ক) টরি খ) শ্বেত

গ) রাই ঘ) নেপাস

পাঠ ৫.৫ তিলের জমি পরিদর্শন করে তিল গাছের সমস্ত অঙ্গ সম্পর্কে ধারণা লাভ

এ কাজ শেষে আপনি

- তিল গাছের বিভিন্ন অঙ্গ শনাক্ত করতে পারবেন।
- তিল গাছে কত দিনে ফুল ফোটে এবং ফল পরিপক্ক হয় তা নির্ণয় করে বলতে পারবেন।
- তিলের গাছ শনাক্ত করতে পারবেন।

প্রাথমিক তথ্য

তিল পেডালিয়েসি (Pedaliaceae) পরিবারভূক্ত বর্ষজীবি উদ্ভিদ। তিলগাছ সাধারনত ১Ñ১.২৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ তুলনামুলকভাবে এত বড় হয় যে তা তিল গাছ বলে বিশ্বাস হয় না।

তিল বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। জীবনকাল ৮০-১৮০ দিন।

ক) স্বভাব ঃ তিল বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। জীবনকাল ৮০-১৮০ দিন।

খ) মূল ঃ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান মুলতত্র , প্রায় ৯০ সেঃমিঃ পর্যন্ত গভীরে প্রবেশ করতে পারে। মুলের অধিকাংশ শাখা প্রশাখা মাটির উপরের স্তরে বিদ্যমান।

গ) কান্ড ঃ কান্ড সোজা এবং এতে চারিদিকে ছোট ছোট শাখা বের হয়। (১-৩) মিটার উঁচু, বৈশিষ্টপ র্ন গন্ধযুক্ত লোমে আবৃত। কান্ড প্রায় বর্গাকার, লম্বালম্বিভাবে শিরাযুক্ত, সাধারণত সবুজ, তবে কখনো পিঙ্গঁল (Pink) বর্ণেরও দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ) পাতা ঃ পাতা লম্বা ধরনের খাঁজকাটা, ঘন সবুজ, উভয়দিকে লোমে আবৃত, কিনারা পুঁছল বা শুঁয়াযুক্ত (Ciliate), নিচের পাতা বিপরীত এবং উপরের পাতা একান্ ্র ভাবে সাজানো।

ঙ) ফুল ঃ পত্রবৃন্তের গোড়ায় সাদা বা গোলাপী রংয়ের ঘন্টাকৃতির ফুল জন্মে। একসম (Zygomorphiপ), পত্রকক্ষে ১,২ বা একত্রে তিনটি পর্যন্ত ফুল থাকতে পারে। বৃন্ ছোট (৫ মিঃমিঃ), অনেকটা নলাকার। ক্লিষ্টোগামী হওয়ায় স্বপরাগায়ণ হয়।

চ) ফল ঃ ফলগুলো চার অথবা অধিক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ক্যাপসুল (Capsule), ৩ সেঃমিঃ × ১ সেঃমিঃ আকারের, খসখসে, সোজা, বাদামী থেকে পিঙ্গল, গভীরভাবে খাঁজ কাটা, বিদারী (Dehiscent) এবং অবিদারী।

প্রতি হাজার বীজের ওজন প্রায় ৩ গ্রাম।

ছ) বীজ ঃ ছোট, ৩ সেঃমিঃ × ১.৫ সেঃমিঃ আকারের, ডিম্বাকার (Ovate), বর্ণের দিক থেকে সাদা, হলদে, ধূসর, লাল, বাদামী বা কালো হতে পারে। প্রতি হাজার বীজের ওজন প্রায় ৩ গ্রাম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

স্কেল, পেন্সিল ও খাতা।

কাজের ধাপ

১। একজন তিল চাষী নির্বাচন করুন।

২। তিলের জমি পরিদর্শন করুন এবং গাছে ফুল ফোটার সময় প্রথমবার এবং ফল পাকার পর দ্বিতীয় বার নিুবর্ণিত উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

ক) একটি পূর্ণবয়স্ক গাছের মূল, কান্ড, শাখা - প্রশাখা, পাতা এবং ফুল আলাদা করুন। এসব অঙ্গের সংখ্যা এবং আকার খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

খ) ফল পরিপক্ক হওয়ার পর দ্বিতীয় বার একটি গাছের অঙ্গ আলাদা করুন। এসব অঙ্গের সংখ্যা এবং আকৃতি খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। এ সময় তিলের ফল ও বীজ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

৩। কাজের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। একটি পূর্ণবয়স্ক তিল গাছের ছবি এঁকে নামসহ বিভিন্ন অঙ্গ চিহ্নিত করুন।

২। একটি তিলের ফুল এঁকে বিভিন্ন অঙ্গ নামসহ চিহ্নিত করুন।

১। তিলের জমিতে পানি জমলে গাছ মরে যায় কেন?

২। তিল সারা বছর চাষ করা যায় কেন?

৩। তিলের ক্ষতিকারক বিছা পোকা কীভাবে দমন করা যায়?

৪। তিসির তৈল কী কাজে ব্যবহার করা যায়?

৫। নদীর চর অঞ্চলে চীনাবাদামের চাষ বেশী হয় কেন?

৬। তুলনামুলক হারে ডচনাবাদাম চাষে কম পরিমাণে ইউরিয়া সার প্রয়োজন হয় কেন?

৭। চীনাবাদামের প্রধান রোগ কী এবং তা কীভাবে দমন করা যায়?

৮। স র্যম খীর তেল উৎকৃষ্ট কেন?

৯। স র্যম খীর চাষ সারা বছর করা যায় কেন?

১০। সূর্যমূখী চাষের প্রধান সমস্যা কী?

উত্তরমালা

পাঠ ৫.১

১। ক, ২। ক, ৩। ক, ৪। গ

পাঠ ৫.২

১। ঘ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ঘ

পাঠ ৫.৩

১। খ, ২। খ, ৩। খ, ৪। গ

পাঠ ৫.৪

****

পাঠ ৫.৫

****

ইউনিট ৬ আঁশ ফসলের চাষ

ইউনিট ৬ আঁশ ফসলের চাষ

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্নের পরেই বস্ত্রের স্থান। বস্ত্রের জন্য প্রয়োজন হয় আঁশের। এই আঁশের কিছু অংশ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হলেও এর সিংহভাগই আসে উদ্ভিদ থেকে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে আঁশ থেকে বস্ত্র তৈরি করা ছাড়াও চট, থলে, কার্পেট, দড়ি, কাছি, গদি-তোষক, মাছ ধরার জাল, কাগজের মন্ড ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এক সময় আঁশজাতীয় ফসল হিসেবে পাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাটের ব্যবহার কৃত্রিম আঁশের সাথে নতুন প্রতিযোগিতার কারনে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় পাট দিয়ে বিকল্প দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে পাটের নুতন নতুন উপযোগিতা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। অন্যদিকে দেশীয় বস্ত্র মিলগুলোর চাহিদা মেটাতে প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ বেল তুলা আমদানি করতে হচ্ছে। তুলা উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভবনা থাকলেও তুলাচাষের অবস্থা এখনো এদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম থাকলেও শণ পাট, মেস্তা, কেনাফ ইত্যাদি দেশে চাষকৃত অন্যান্য আঁশ ফসলের মধ্যে উলে-খযোগ্য। এ ইউনিট পাঠ করলে আঁশ ফসলের পরিচিতি ও চাষাবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঁচটি তত্ত্বীয় পাঠে আঁশ ফসলের পরিচিতি, পাটের পরিচিতি ও গুরুত্ব, পাট চাষের জন্য জমি তৈরী, সার প্রয়োগ, বীজ বপন, পাট কাটা ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি এবং তুলা চাষ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি ব্যবহারিক পাঠে পাটের জমি তৈরী ও পাটবীজ বপন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ আঁশ ফসলের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- আঁশ ফসলকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- আঁশ ফসলের প্রকারভেদ উলে-খ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন আঁশ ফসলের তালিকা, বিশেষত বাংলাদেশে চাষকৃত আঁশ ফসলগুলোর নাম-পরিচয় বলতে ও লিখতে পারবেন।

মানুষ বস্ত্রের বা আঁশের ব্যবহার সম্ভবত মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই করেআসছে। আদিমকালে লজ্জা নিবারনের জন্য বস্ত এসেছে গাছের বাকল থেকে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সেই বাকল আঁশ হিসেবে পরিশিলিত হয়েছে। আর লজ্জা নিবারণের মতো আদি প্রয়োজন ছাড়াও আঁশের তৈরি পোষাক মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও আভিজাত্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আঁশ ফসলের সংজ্ঞা

যে সকল উদ্ভিদ থেকে মানুষের ব্যবহার্য বস্ র জন্য প্রয়োজনীয় আঁশ পাওয়া যায় তাদেরকে আঁশ ফসল বলে।

যে সকল উদ্ভিদ থেকে মানুষের ব্যবহার্য বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় আঁশ পাওয়া যায় তাদেরকে আঁশ ফসল বলে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে আঁশ পাওয়া যায়, যেমন- পাট, মেস্তা, কেনাফ ইত্যাদি উদ্ভিদের কান্ড থেকে; কার্পাস , শিমুল ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ থেকে এবং আনারস, এগেভ, সিসাম প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। আঁশজাতীয় ফসলগুলোর মধ্যে কোনটি থেকে মিহি, নরম ও মোলায়েম আঁশ পাওয়া যায়, যেমন- পাট ও তুলা; আবার কোন কোনটি থেকে অত্যন্ শক্ত এবং দৃঢ় আঁশ পাওয়া যায়, যেমন- নারিকেল ও হেম্প্।

উদ্ভিদ আঁশের শ্রেণীবিন্যাস

মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজে উদ্ভিদ আঁশকে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার অনুসারে তাই উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আঁশগুলোকে নিুলিখিত ৬ (ছয়) ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) বয়ন (Textile) আঁশ- বস্ত্রকল ও পাটকলগুলোতে বয়ন আঁশ ব্যবহৃত হয়। এই আঁশ দিয়ে কাপড় ও কাপড়জাতীয় দ্রব্যাদি- সুতা ও দড়ি এবং হোসিয়ারী সামগ্রী প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট মানের এই আঁশ নমনীয় অথচ শক্ত এবং সমান পুরু হয়ে থাকে। কার্পাস তুলা, পাট ইত্যাদি বয়ন আঁশের অর্ন্তভূক্ত।

(খ) বুরুশ (Brush) আঁশ- এই আঁশগুলো শক্ত তবে সামান্য নমনীয়। ঝাড়ু ও বুর€শ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের ডগা এবং ছোট কান্ড থেকে বুরুশ আঁশ পাওয়া যায়, যেমন, নারিকেল ও তালের আঁশ।

(গ) প্লেটিং ও স্থূল বুনন আঁশ (Plating and rough weaving fibre)- সাধারণত চ্যাপ্টা ও নমনীয় আঁশ। অপেক্ষাকৃত অধিক সম্প্রসারণক্ষম আঁশ দ্বারা মাদুর তৈরি হয় এবং কাষ্ঠল (ড়িড়ফু) আঁশ যেমন- বেত ও বাঁশ দ্বারা ঝুড়ি, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

(ঘ) ফিলিং (Filling) আঁশ- এ ধরনের আঁশ লেপ, তোষক, বালিশ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যেমন, শিম ল তুলা।

(ঙ) কাগজ প্রস্তুতকারী (Paper making) আঁশ- কাষ্ঠল ও টেক্সটাইল আঁশই কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত প্রায় সকল প্রকার আঁশ দিয়েই কাগজ প্রস্তুত করা যায়।

(চ) প্রাকৃতিক আঁশ (Natural fibres)- এটি এক ধরনের আঁশ যা উদ্ভিদের বাস্ট ফাইবার (Bast fibre) অর্থাৎ উদ্ভিদ বাকল হতে সংগৃহীত হয়।

উৎপত্তি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে আঁশ সংগৃহীত হয় এবং সেই অনুসারে উদ্ভিদ আঁশকে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়ঃ

(ক) ফ্লোয়েম (Phloem) আঁশ- উদ্ভিদ কান্ডের কর্টেক্স (Cortex) বা মাধ্যমিক ফ্লোয়েম (Secondary phloem) হতে প্রাপ্ত আঁশ, যথা পাট।

(খ) ত্বক (Surface) আঁশ- বীজের বহিঃত্বক বা ফলত্বকের আভ্যন্তরীন অংশ হতে প্রাপ্ত আঁশ, যেমন কার্পাস তুলা ও শিমূল তুলা।

(গ) কাষ্ঠল (Woody) আঁশ- পাতা, কান্ড, ফল ইত্যাদি অংশ থেকে প্রাপ্ত শক্ত আঁশ, যেমন- তাল, নারিকেল আঁশ ।

(ঘ) বান্ডেল (Bundle) আঁশ- ভাস্কুলার বান্ডেল (Vascular bundle) থেকে প্রাপ্ত আঁশ, যেমন- নারিকেল ও তাল পাতার প্রধান শিরা।

(ঙ) পাতার (Leaf) আঁশ- সরাসরি উদ্ভিদের পাতা থেকে যে আঁশ পাওয়া যায়, যেমন- আনারস, এগেভ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আঁশ ফসলসমূহ

বিশ্বে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ আছে যেগুলো থেকে আঁশ সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে Tiliaceae, Bombaceae, Malvaceae, Palmaceae, Musaceae, Liliaceae, Leguminosae এবং Bromiliaceae পরিবারের গাছসমূহ অন্যতম।

বাংলাদেশের আঁশ চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে পাট এবং তার পরেই আসে তুলা।

বাংলাদেশের আঁশ চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে পাট এবং তার পরেই আসে তুলা। এছাড়া, আরো কিছু আঁশজাতীয় ফসলের চাষ প্রচলিত আছে। নিম্নে এদের একটি তালিকা দেওয়া হলোঃ

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিবার
পাট	*Corchorus spp.*	Tiliaceae
তুলা	*Gossypium* spp.	Malvaceae
মেস্তা	*Hibiscus subderriffa*	Malvaceae
কেনাফ	*Hibisus cannabinus*	Malvaceae
শনপাট	*Crotalaria juncea*	Leguminosae
হেম্প	*Cannabis sativa*	Leguminosae

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাংলাদেশের প্রধান আঁশ ফসল কোন্‌টি ?

(ক) মেস্তা (খ) কেনাফ

(গ) পাট (ঘ) শনপাট।

২। এদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় আঁশ ফসল কোন্‌টি ?

(ক) পাট (খ) তুলা

(গ) মেস্তা (ঘ) শনপাট।

৩। বয়ন আঁশ কোন্‌টি ?

(ক) শিমূল তুলা (খ) বেত

(গ) কার্পাস তুলা (ঘ) তালের আঁশ।

৪। পাট কী ধরনের আঁশ ?

(ক) ত্বক আঁশ (খ) বান্ডেল আঁশ

(গ) ফ্লোয়েম আঁশ (ঘ) বুরুশে আঁশ।

৫। আমাদের দেশে চাষকৃত তিনটি আঁশ ফসল নিম্নের কোন পরিবারভূক্ত ?

(ক) লিগুমিনোসি (খ) টিলিয়েছি

(গ) ব্রোমলিয়াছি (ঘ) মালভেসি।

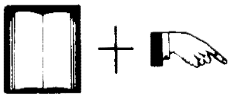

পাঠ ৬.২ পাটের পরিচিতি ও গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি

- পাটের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে চাষকৃত পাটের দু'টো প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- পাটের বিভিন্ন জাতের নাম বলতে পারবেন।
- পাটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

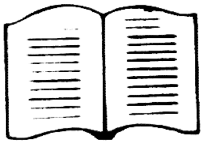

> পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় বলে একে সোনালী আঁশ বলে।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাট হলো অন্যতম। পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে নিকট অতীতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জিত হতো। ১৯৯২-৯৩ সালে দেশের পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমান ছিল ১২,৩৬,০০০ একর এবং মোট উৎপাদন ছিল ৮,০৮,০০০ মেট্রিক টন। আমাদের দেশে পাট চাষ এবং পাট উৎপাদনের সাথে প্রায় ৭০% কৃষক পরিবার এবং তিন লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারী ও ব্যবসায়ী জড়িত (গাফফার, ১৯৮৯)। পাটের আঁশ দিয়ে কারখানায় ছালা ও বস্তা তৈরি করা হয়। পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় বলে একে সোনালী আঁশ বলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদিও কৃত্রিম আঁশের উৎপাদন ও তার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাটের চাহিদা কিছুটা কমে গেছে, তথাপি উন্নতমানের পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করে বৈদেশিক বাজার প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। সেজন্যই পাট ফসল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

পাটের পরিচিতি

উৎপত্তি ও বিস্তার

> **Centres of diversity are the centres of origin - এই সূত্রে তাই অনেকে আফ্রিকাকে উৎপত্তিস্থল বলে মনে করেন।**

পাটের উৎপত্তিস্থল কোথায় সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। তবে অনেকেই মনে করেন যে, পাটের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপকূল। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই পাট চাষ হয়ে আসছে। পাটের বিভিন্ন প্রজাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিভিন্নতা পাওয়া যায় আফ্রিকায়। Centres of diversity are the centres of origin - এই সূত্রে তাই অনেকে আফ্রিকাকে উৎপত্তিস্থল বলে মনে করেন। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে তোষা পাট (*Corchorus olitorius*) এর উৎপত্তিস্থল হলো আফ্রিকায় এবং দেশী পাট (*Corchorus capsularis*) এর উৎপত্তিস্থল হলো এশিয়ায় - খুব সম্ভবত পাক-ভারত উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কিংবা দক্ষিন চীনে অথবা মায়ানমারে। প্রধানত ভারত এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম পাট উৎপাদনকারী দেশ হলেও অন্যান্য দেশ যেমন - চীন, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, পেরু, মায়ানমার, নেপাল, ভিয়েতনাম, মিশর, ফরমোজা, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও কিছু পাট উৎপাদিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ভারত এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় (Singh, ১৯৮৯)।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি

> **বাংলাদেশে যে প্রজাতি দুটি পাওয়া যায় তা হলো দেশী পাট** (*Corchorus capsularis*) এবং তোষা পাট (*Corchorus olitorius*)।

Tiliaceae পরিবারের অর্ন্তগত পাট হলো একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ যার গণ হলো *Corchorus*। এর অধীনে চল্লিশটি প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ভারতে আটটি এবং বাংলাদেশে দুটি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে প্রজাতি দুটি পাওয়া যায় তা হলো দেশী পাট (*Corchorus capsularis*) এবং তোষা পাট (*Corchorus olitorius*)। এ দুটি প্রজাতিই বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। আর বাকী আটত্রিশটি প্রজাতি বন্য উদ্ভিদ হিসেবে জন্মাতে পারে।

বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত পাটের প্রজাতি দুটির মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ

বৈশিষ্ট্য	দেশী পাট	তোষা পাট

বৈশিষ্ট্য	দেশী পাট	তোষা পাট
১. সাধারণ	গাছ ১.৫ থেকে ৩.৬ মিটার লম্বা হয়। বৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। বীরুৎজাতীয় একবর্ষজীবী, বপন কালের ওপর ভিত্তি করে মাঠে ৪-৫ মাস থাকে।	গাছ ১.৫ থেকে ৪.৫ মিটার লম্বা হয়। সাধারণভাবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বীর€ৎজাতীয় একবর্ষজীবী, বপন কালের ওপর ভিত্তি করে ৪-৫ মাস মাঠে থাকে। আগাম বপন করলে অপরিনত বয়সে ফুল আসে।
২. কান্ড	নলাকার, গাঢ় সবুজ থেকে গাঢ় লালের মাঝামাঝি বিভিন্ন মাত্রার রং বিশিষ্ট হয়। পরিপক্কতার বিভিন্ন পর্যায়ে কান্ডের গোড়ায় পেরিডার্মের বৃদ্ধি বিভিন্ন রকম হয়। কান্ড গোড়ার দিকে মোটা উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু।	নলাকার, কান্ডের বর্ণ সবুজ অথবা হালকা লাল থেকে গাঢ় লাল, বর্ণের শেডগুলো Capsularis অপেক্ষা কম; পেরিডার্ম অনুপস্থিত বা সুগঠিত নয়। পরবর্তি পর্যায়ে লেন্টিসেল দেখা যায়। কান্ডের গোড়া দেশী পাটের ন্যায় ততটা মোটা নয়।
৩. পাতা	পাতা তুলনাম লকভাবে ছোট, হালকা সবুজ বর্ণের, স্বাদে তিক্ত।	পাতা তুলনাম লকভাবে বড়, বর্ণ গাঢ় সবুজ এবং স্বাদে তিক্ত নয়।
৪. ফুল	ফুল ছোট, বৃতি হলুদ অথবা ফ্যাকাশে হলুদ, ডিম্বাশয় হলুদ অথবা ফ্যাকাশে হলুদ এবং গোলাকার।	তুলনাম লকভাবে বড়, বৃতি সবুজ, পাপড়ি হলুদ, ডিম্বাশয় লম্বাটে।
৫. ফল	গোলাকার, প্রতি দুই সারিতে ৮ থেকে ১০ টি করে বীজ থাকে।	লম্বাটে, প্রতি সারিতে ২৫ থেকে ৪০ টি বীজ থাকে।
৬. বীজ	ছোট, চকলেট বাদামী বর্ণের, ৩০০ টি বীজের ওজন প্রায় ১ গ্রাম।	তুলনাম লকভাবে বীজ ছোট, নীলাভ সবুজ থেকে ধ সর বর্ণ; তবে কখনো কখনো কাল বর্ণের হয়ে থাকে। ৫০০ টি বীজের ওজন ১ গ্রাম।

বাহ্যিক অবয়ব

পাট গুŽছমুলবিশিষ্ট, সর€ দন্ডকার, সাধারণত ডালপালাবিহীন, বর্ষজীবী উদ্ভিদ। দেশী পাট গাছ ৩.৫-৪ মিটার লম্বা হয়। জাতভেদে এর কান্ড লাল ও সবুজ রংয়ের হয়ে থাকে। এর পাতার রং হালকা সবুজ, দৈর্ঘ্য ৫-১৩ সেমি এবং প্রস্থ ৩.৫ সেমি। পাটের পাতায় তিক্ত গ−কোসাইড থাকার কারণে পাতা স্বাদে তিক্ত হয়। পক্ষান্তরে, তোষা পাট ৫.২৫-৫.৫ মিটার পর্যš লম্বা হয়ে থাকে এবং এর পাতা অপেক্ষাকৃত বড় ও স্বাদহীন।

পাটের জাত

বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনষ্টিটিউট (BJRI) দীর্ঘ গবেষনার মাধ্যমে দেশী পাট ও তোষা পাটের উপযোগী জাত উদ্ভাবন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক অনুমোদিত পাটের জাতগুলো নি¤œ দেওয়া হলো-

১। দেশী পাট

জমিতে বীজ বপন ও পাট কাটার সময় বিবেচনা করে দেশী পাটের জাতসম হকে নিুবর্ণিত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) আগাম দেশী পাটঃ এ জাতসমূহ অপেক্ষাকৃত আগে বোনা যায় এবং গাছ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বাড়ে। এ শ্রেণির বীজ ফাল্গুন মাস থেকে চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যায় এবং আষাঢ়ের প্রথমেই কর্তন করা যায়। যেমন- সি.সি- ৪৫ (জো পাট) সি.ভি.ই. ৩ (সাদা পাট) (খ) নাবী দেশী পাটঃ এ ধরনের পাট কাটার উপযুক্ত সময় হলো শ্রাবন মাসের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত । এ পাটের অনুমোদিত জাতসম হ হলো- সি.ভি. এল- ১ (সবুজ পাট), ডি - ১৫৪

এখানে উলে-খ্য যে, বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট এর বিজ্ঞানীগন ডি- ১৫৪ জাতের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর বংশগতিধারার স্থায়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত 'এটম পাট - ৩৮' উদ্ভাবন করেছে। এই পাটের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য সকল জাত অপেক্ষা অধিক।

২। তোষা পাট

বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক অনুমোদিত জাতসমুহ হলো:

ও- ৪, ও -৯৮৯৭ (ফাল্গুনী তোষা), সি. জি. (চিনসুরা গ্রীন)

উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে বিদ্যমান কৃষি ঋতুর ভিত্তিতে পাট উৎপাদনের জন্য খরিপ-১ ঋতু হচ্ছে উপযুক্ত সময় (মার্চ-এপ্রিল থেকে জুলাই-আগষ্ট পর্যন্ত)।

বাংলাদেশে বিদ্যমান কৃষি ঋতুর ভিত্তিতে পাট উৎপাদনের জন্য খরিপ-১ ঋতু হচ্ছে উপযুক্ত সময় (মার্চ-এপ্রিল থেকে জুলাই-আগষ্ট পর্যন্ত)। অর্থাৎ পাট উৎপাদনের জন্যে যে উচ্চ তাপমাত্রা, একান্তর রোদ বৃষ্টি, দীর্ঘদিন এবং তুলনাম লকভাবে পরিষ্কার আকাশ দরকার তা বাংলাদেশে মার্চ-জুলাই পর্যন্ত থাকে। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় যে, দেশী পাট সাধারণত ১৫ ই মার্চ থেকে ১৫ ই এপ্রিলের মধ্যে এবং তোষাপাট ১৫ ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত সময়ে বুনতে হয়। তবে কোন জমিতে বর্ষার পানি জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সে জমিতে পাট কিছুটা আগাম বপন করা উচিত।

পরিবেশগত চাহিদা

চব্বিশ থেকে সাতত্রিশ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা এবং ৫৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পাট ভাল জন্মে।

পাট হলো উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ার উপযোগী ফসল। খণার বচনে পাটের পরিবেশগত চাহিদা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে- দিনে রোদ রাতে জল, তাতে ভারী পাটের বল। চব্বিশ থেকে সাতত্রিশ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা এবং ৫৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পাট ভাল জন্মে। তবে পাটের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য বায় মন্ডলের সর্বোত্তম তাপমাত্রা হলো ৩৪^{o} সেঃ। সুষমভাবে বন্টিত বাৎসরিক ১৫০ সেমি বৃষ্টিপাত পাট চাষের জন্য উপযোগী। যার মধ্যে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ২৫ সেমি বৃষ্টিপাত সর্বোত্তম। একান্তর স র্যালোক এবং বৃষ্টিপাত পাট চাষের জন্যে উপযোগী। চারা অবস্থায় পাটগাছ জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। যদিও দেশী পাটগাছ বয়স্ক অবস্থায় কিছুটা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

পাটের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম আঁশ এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পাটের গুরুত্ব কম হবার কথা নয়। কেননা, বর্তমানে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটের বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- পাটের আঁশ থেকে যে থলে উৎপন্ন হয় তা বিভিন্ন প্রকার পণ্যের ধারক-বাহক হিসাবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং সমাদৃত। এ ধরনের থলে অনেক বেশি টেকসই, সহজে নষ্ট হয় না আবার

সহজে মেরামত করা যায়। উপরন্তু পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না। থলে প্রস্তুত করা ছাড়াও পাটের আঁশ আরও অনেক ভাবে ব্যবহার করা যায়- যেমন, দড়ি, কাছি, কাপড়, গদি, কৃত্রিম পশম, কার্পেট ইত্যাদি পাটের আঁশ থেকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও ঘরবাড়ি তৈরি এবং ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পাটকাঠি

দিয়ে বেশ সস্তায় উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, হার্ডবোর্ড, চট তৈরি করা যায় এবং একে অন্যান্য বিকল্প কাজে ব্যবহার করা যায়। পাটের কচি পাতা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই শাক হিসেবে খেয়ে থাকে। পাটের পাতা মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ করে। এজন্যে পাটের জমিতে ধানের ফলন ভাল হয়। ইদানিংকালে বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ রসায়ন শিল্পের সাথে সমন্বিত গবেষনার মাধ্যমে সবুজ পাট থেকে কাগজ-মন্ড উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, তুলার সাথে পাট একত্রে ব্যবহার করে, 'জুটন' (৭০% পাট + ৩০% তুলা) নামক একধরনের কাপড়

আবিস্কৃত হয়েছে যেটির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে কাগজ ও বস্ত্র শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

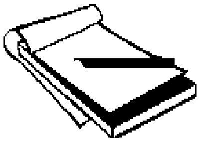

অনুশীলন (Activity): *দেশী পাট ও তোষা পাটের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। বর্তমানে পাটের গুরুত্বে কমে গেছে কেন এবং কীভাবে গুরুত্ব বাড়ানো যায় আলোচনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

১। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় কোন দেশে ?

(ক) বাংলাদেশ (খ) পাকিস্তান

(গ) ভারত (ঘ) মায়ানমার।

২। দেশী পাটের বৈশিষ্ট্য কোন্টি ?

(ক) পাতা তুলনাম লকভাবে বড়, (খ) ফল লম্বা

(গ) বীজ নীলাভ সবুজ, (ঘ) পাতা স্বাদে তিক্ত।

৩। আগাম দেশী পাটের জাত কোন্টি ?

(ক) সি.ভি.ই-৩, (খ) সি.ভি.এল-১,

(গ) সি.জি., (ঘ) ডি-১৫৪।

৪। তোষাপাট বোনার সঠিক সময় কোনটি?

(ক) ১ মার্চ - ১৫ এপ্রিল, (খ) ১ মার্চ - ৩০ এপ্রিল

(গ) ১৫ এপ্রিলের আগে, (ঘ) ১৫ এপ্রিলের পরে।

৫। পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম বন্টিত বৃষ্টিপাতের পরিমান কত?

(ক) ৩০০ সেমি, (খ) ১৫০ সেমি,

(গ) ৩০ সেমি, (ঘ) ১০০ সেমি

পাঠ ৬.৩ পাট চাষের জন্য জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ বপন, উপরি সারের প্রয়োগ

এ পাঠ শেষে আপনি

- পাট চাষের জন্য কী ধরনের জমি দরকার এবং কীভাবে বীজ বপনের জন্য জমি প্রস্তুত করবেন তা উলে-খ করতে পারবেন।
- পাট চাষে সারের পরিমান ও কীভাবে সার প্রয়োগ করবেন সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বীজের পরিমান, বপনের সময় ও বপন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কেন এতদঞ্চলে প্রচুর পাট চাষ হয়- এর উত্তরে উপযোগী জলবায় ও মাটির সাথে অবশ্যই আর একটি নিয়ামক আসে, তা হচ্ছে অত্র এলাকার মানুষের নিকট পাট চাষের যথাযথ কৌশল জানা আছে। পাট চাষে আগাছা দমন, গাছ পাতলাকরণ, ঔষধ ছিটানো থেকে শুরু করে পচা পানিতে দাঁড়িয়ে আঁশ ছাড়ানোর মত বিষয়গুলো পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশের মানুষ দ্বারা সম্ভব কিনা তা হয়তো ভাববার বিষয়। যাহোক, পাটের ফলন ও আঁশের গুণগত মান পাটচাষের জন্য জমি তৈরি থেকে শুর€ করে সার প্রয়োগ, বীজবপন, আন্ত ঃপরিচর্যা, কর্তন, সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। এদের যে কোন একটি ধাপে যথাযথ কার্য সম্পাদন না হলে পাটের ফলন ও গুণগত মান মারাত্তকভাবে হ্রাস পেতে পারে। তাই লাভজনক ফসল উৎপাদনে সামগ্রিক প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ বাঞ্চনীয়।

জমি তৈরি

> উর্বর দোআঁশ মাটি পাট চাষের অত্যন্ত উপযোগী, বিশেষ করে যে জমিতে বর্ষা মৌসুমের শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য সর্বোত্তম।

প্রথমে পাট চাষের জন্য উপযোগী মাটি নির্বাচন করতে হবে। এঁটেল ও বেলে মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ সম্ভব। তবে উর্বর দোআঁশ মাটি পাট চাষের অত্যন্ত উপযোগী, বিশেষ করে যে জমিতে বর্ষা মৌসুমের শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য সর্বোত্তম। মিঠা (তোষা) পাট উঁচু জমিতে এবং তিতা (দেশী) পাট উঁচু ও নিচু দু'ধরনের জমিতেই চাষ করা হয়।

পাটের বীজ ছোট এবং পাটের মূল ১ ফুট পর্যন্ত মাটির গভীরে যায় বিধায় উত্তমরূপে জমি চাষ আবশ্যক। পাঁচ-ছয় টি আড়াআড়ি চাষ-মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। প্রথাগতভাবে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির পর জো-অবস্থায় জমি চাষ করা হয়। পরবর্তি বৃষ্টিগুলোর পরও চাষ-মই দিয়ে ঘাস-আগাছা জমির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। বৃষ্টির সাথে পর্যায়ক্রমে চাষ-মই দেবার তাৎপর্য হচ্ছে প্রতি বৃষ্টির পর পরই আগাছার বীজগুলো অংকুরিত হয় এবং চাষ-মই এর দ্বারা বিনষ্ট হয়। এইভাবে চাষ করলে মাটির জলধারন ক্ষমতা বাড়ে এবং মাটির রস সংরক্ষিত থাকে। অন্যদিকে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসের শুষ্ক খরার মাঝে জমি চাষ করলে মাটির অত্যাধিক ক্ষয়সাধন হয়।

আলুর জমিতে পাট চাষ করলে জমি বেশি কর্ষনের প্রয়োজন নেই। চাষ-মই দিয়ে জমির উপরিভাগ সমতল করতে হবে যাতে বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়। জমির চারিদিকে ও মাঝে মাঝে পানি নিকাশের জন্য নালা করে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ

পাটের ভাল ফলনের জন্য সঠিক মাত্রায় ও যথাযথ সময়ে সার প্রয়োগ প্রয়োজন। সার প্রয়োগের সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হবে যেমন, পূর্ববর্তী ফসলে সার প্রয়োগের অবশিষ্ট প্রভাব, মাটির প্রকৃতি ও বুনট, মাটির ঢ়ঐ ইত্যাদি। আলুচাষের জমি হলে এবং যে জমিতে বর্ষার শেষে পলি পড়ে সে জমিতে সার কিছু কম প্রয়োগ করলেও চলবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউটের (১৯৯২) সুপারিশ অনুযায়ী পাটের সফল ফলনের জন্য সার প্রয়োগের পরিমান ও নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ

টেবিল ৬.৩কঃ পাটচাষে ব্যবহৃতব্য সারের পরিমান

সারের নাম	(ক) গোবর সার দিলে (কেজি/হেক্টর)	(খ) গোবর সার না দিলে (কেজি/হেক্টর)
গোবর	৩৭২০	০
ইউরিয়া	১২ + (১০০*)	১০০+(১০০*)
টিএসপি	১৭	৫০
এমপি	২২	৯০
জিপসাম	০	৪৫
জিংক সালফেট	০	১০

* উপরি প্রয়োগে ব্যবহৃতব্য।

গোবর সার দেবার সুযোগ থাকলে বীজ বপনের ২/৩ সপ্তাহ প র্বে সম্ҳ র্ণ গোবর সার জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে ভালমত মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

জমিতে বীজ বপনের প র্বে শেষ চাষে উলি-খিত ইউরিয়া সারের ১ম অংশসহ অন্যান্য সব সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। লক্ষনীয় যে, গোবর সার দিলে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার কম লাগবে এবং জিপসাম ও জিংক সালফেটের প্রয়োজনই হবে না।

জমির অ্লতা যদি বেশি হয় (ঢ়ঐ ৫.০ এর নীচে) তাহলে চুন, ডলোমাইট বা বেসিক পাগের গুঁড়ো দেওয়া উচিত (দাস, ১৯৯৩)। চুনের মাত্রা হেক্টরে ২.৫ কুইন্টালের মতো তবে সঠিক মাত্রা জানার জন্য মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

বীজ বপন

পাট একটি আলোক সংবেদনশীল উদ্ভিদ।

পাট একটি আলোক সংবেদনশীল উদ্ভিদ। তাই অধিক ফলন ও গুণগত মানের জন্য সঠিক সময়ে পাট বপন করা অত্যাবশ্যকীয়। কারন, সঠিক সময়ের আগে বা পরে বীজ বপন করলে আলোক সংবেদনশীলতার কারনে পাট গাছ সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে না, অসময়ে ফুল দেখা দেয় এবং পাটের ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়। নিম্নে পাট গবেষনা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রধান জাতগুলোর বপন সময় দেওয়া হলঃ

(র) জো পাট (সি.সি-৪৫)ঃ মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য এপ্রিল (তবে প্রয়োজনে এ জাতটি মধ্য জুন পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। কেননা, পাটের বিভিন্ন জাতের মধ্যে এটিই একমাত্র আলোক অসংবেদনশীল জাত)।

(রর) আগাম পাট (সি.ভি.ই-৩)ঃ মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ।

(ররর) ডি-১৫৪ঃ মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ।

(রা) সবুজ পাট (সি.ভি.এল-১)ঃ মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ।

(া) ফাল্গুনী তোষা (ও-৯৮৯৭)ঃ মধ্য মার্চ থেকে মে-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ।

(ার)   ও-৮ঃ এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মে-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ।

ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৬.২৫-৭.৫ কেজি এবং লাইনে ৩.৭৫-৫.০ কেজি বীজ লাগে। লাইনে বোনার ক্ষেত্রে সারির দুরত্ব ৩০ সেমি বা ১২ ইঞ্চি এবং সারিতে চারার দুরত্ব ৭-১০ সেমি বা ৩-৪ ইঞ্চি।

বোনার আগে বীজের অংকুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। কারন বেশি পুরানো বীজ ভাল গজায়না এবং গাছের তেজ বা বৃদ্ধি যথাযথ হয় না। খারাপ বীজ হলে ফসল বিপর্যের (উবধফ ংড়রিহম) সম্ভবনা থাকে । বোনার জন্য শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করা দরকার (দাস, ১৯৯৩)।

বোনার আগে বীজকে শোধন করে নেওয়া ভাল। প্রতি কেজি বীজের সাথে ৬ গ্রাম এগ্রোসান-জিএন বা সেরিসান অথবা ২ গ্রাম ক্যাপটান ৭৫% বা ব্যাভিস্টিন ৫০% ঔষধ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

ছিটিয়ে ও লাইনে দু'ভাবেই পাটের বীজ বপন করা গেলেও এ দেশের কৃষকরা সাধারণত ছিটিয়ে পাটের বীজ বপন করে। ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৬.২৫-৭.৫ কেজি এবং লাইনে ৩.৭৫-৫.০ কেজি বীজ লাগে। লাইনে বোনার ক্ষেত্রে সারির দুরত্ব ৩০ সেমি বা ১২ ইঞ্চি এবং সারিতে চারার দুরত্ব ৭-১০ সেমি বা ৩-৪ ইঞ্চি।

পরিমাণমত বীজ ব্যবহার পাট চাষের জন্য অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ। বেশি বীজ বোনা হলে বীজ খরচ বেশি ছাড়াও জমি থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে খরচ বেশি পড়ে। জমির আর্দ্রতা ও উর্বরতা দ্রূত নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কম বীজ বুনলে চারা প্রতি স্থান বেশি পাওয়ার কারণে গাছে শাখা-প্রশাখা (Branching) জন্মে। গাছের এ অবস্থা ফলন ও গুণগত মানের আঁশের জন্য কাম্য নয়। বীজ হার ও চারার সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে অন্ততঃ দুবার চারা পাতলা করা (Thinning) যায়ঃ

(১) চারা গজানোর ১৫-২০ দিনে একবার ঘন জায়গার দুর্বল চারাগুলো তুলে ফেলা প্রয়োজন।
(২) চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর আর একবার চারা পাতলাকরণ আবশ্যক।

এইভাবে গাছের শাখা হবার প্রবনতা রোধ করা যায় এবং হেক্টর প্রতি ৪,৪০,০০০ টি কাম্য চারা (Desired plant population) নিশ্চিত করা যায় (ইঔজও, ১৯৮৯)।

সার উপরি প্রয়োগ

গোবর সার ব্যবহৃত হোক বা না হোক বীজ বোনার ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ পর হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ফসল জমিতে থাকা অবস্থায় এ ধরনের সার দেওয়াকে উপরি প্রয়োগ বলে। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ইউরিয়া দানা কচি পাতায় লেগে না থাকে। তাহলে পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিকালে সার ছিটানো, বৃষ্টির সময় বা বৃষ্টির পর পরই সার না ছিটানো অথবা সারের সাথে শুকনো বালু বা মাটির গুঁড়ো মিশিয়ে প্রয়োগ ইত্যাদি এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

সার উপরি প্রয়োগের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

(১) সার উপরি প্রয়োগের সময় যেন ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। সার দেবার পর পরই নিড়ানীর সাহায্যে আগাছা দমন করলে সার মাটির সাথে মিশে যায়।

(২) মাটিতে যেন পর্যাপ্ত রস থাকে তা নাহলে সার উপরি প্রয়োগ করেও যথাযথ ফল পাওয়া যাবে না।

পাঠোত্তর প্রশ্নমালা

১। পাটের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাটি কোন্‌টি ?

(ক) বেলে মাটি (খ) উর্বর দোআঁশ মাটি

(গ) এঁটেল মাটি (ঘ) বেলে দোআঁশ মাটি।

২। পাট চাষের জমিতে কখন চুন প্রয়োগ করবেন ?

(ক) pH ৬ এর নীচে হলে (খ) pH ৮ এর নীচে হলে

(গ) pH ৪ এর নীচে হলে (ঘ) pH ৫ এর নীচে হলে।

৩। পাটের জমিতে চারা গজানোর পরে কখন প্রথম গাছ পাতলা করবেন ?

(ক) ৫-১০ দিন পর (খ) ৪০-৪৫ দিন পর

(গ) ১৫-২০ দিন পর (ঘ) ৩০-৩৫ দিন পর।

৪। পাট চাষে হেক্টর প্রতি কাম্য চারার সংখ্যা কত ?

(ক) ৪.৪ লক্ষ (খ) ৪.৯ লক্ষ,

(গ) ৪.১ লক্ষ, (ঘ) ৪.০ লক্ষ।

৫। পাট চাষে কী পরিমান ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করবেন ?

(ক) ২০০ কেজি, (খ) ৫০ কেজি,

(গ) ১০০ কেজি, (ঘ) ১৫০ কেজি।

পাঠ ৬.৪ পাট কাটা ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

এ পাঠ শেষে আপনি

- অধিক ফলন ও গুণগত মানের আঁশের জন্য পাট কাটার যথাযথ সময় উলে-খ করতে পারবেন।
- পাটের ফলন বলতে পারবেন।
- যথার্থ সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি গ্রহনের মাধ্যমে কীভাবে পাট আঁশের গুণগত মান পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

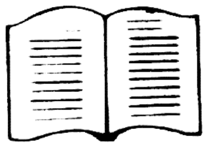

অধিক ফলন ও উন্নত মানের আঁশ নিশ্চিত করার জন্য বীজ বপন থেকে শুরু করে পাটের আঁশ সংগ্রহ ও শুকানো পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে সঠিক প্রযুক্তি গ্রহন করা আবশ্যক। কারণ, চাষাবাদকালীন সময়ে অনেক পরিশ্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানের আঁশ উৎপাদিত হলেও যথাসময়ে পাট না কাটা বা সঠিকভাবে সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি গ্রহণ করা না হলে পাট আঁশের মান দারুণভাবে ব্যহত হতে পারে। অতএব, সফল পাট উৎপাদনের জন্য পাট কাটার সঠিক সময় এবং সংগ্রহোত্তর অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা সমীচীন।

পাট কাটা

আঁশ উৎপাদনের লক্ষ্যে সাধারণত বোনার ৪-৫ মাসের মধ্যে পাট কাটা সম্পন্ন হয়। তবে পরবর্তী ফসল (যেমন ধান) কখন লাগাতে হবে সেই অনুসারে পাট কাটার প্রয়োজন হয়। আবার বর্ষার পানিতে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকলে বাধ্য হয়ে পাটকে সঠিক সময়ের আগেই কাটতে হতে পারে। ফলন ও গুণগত মানের নিরিখে পাটকে নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থায় কাটা যায়ঃ

(ক) ফুল ফোটার সময় (Flowering stage) ঃ এই অবস্থায় পাট কাটলে আঁশ খুবই উন্নত মানের হয়, তবে ফলন অত্যন্ত কমে যায়।

(খ) ফুল থেকে ফল ধরার সময় (Pod setting stage) ঃ ফলন আগের চেয়ে বেশি হয় এবং আঁশের মানও ভাল থাকে।

(গ) ফল পাকবার সময় (Pod ripening stage) ঃ এই অবস্থায় পাট কাটলে ফলন কিছুটা বেশি হয় তবে আঁশের মান কমে যায়। আঁশ কম মজবুত ও মোটা হয় এবং পাটের গোড়ার কাটিং এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

ফলন ও আঁশের মান এ দুটির সামঞ্জস্যতায় দেখা গেছে দ্বিতীয় (খ) অবস্থায়ই পাট কাটার সঠিক সময়। এ সময় পাট গাছের মাথা ফেটে ছোট ছোট ডাল বের হয়ে সেই ডালে ফুল থেকে ফল ধরতে থাকে।

ফলন ও আঁশের মান এ দুটির সামঞ্জস্যতায় দেখা গেছে দ্বিতীয় (খ) অবস্থায়ই পাট কাটার সঠিক সময়। এ সময় পাট গাছের মাথা ফেটে ছোট ছোট ডাল বের হয়ে সেই ডালে ফুল থেকে ফল ধরতে থাকে।

সাধারণত কাস্তে বা হেঁসো দিয়ে পাটগাছ একেবারে গোড়া থেকে কেটে নেয়া হয়। অতঃপর পাতা ঝরাণোর জন্য কাটা পাটগুলো ৩/৪ দিন জমিতে গাদা করে রাখতে হয়। তারপর ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি ব্যাসের ছোট ছোট আটি বেঁধে পচাবার জন্য জলাশয়ে নেওয়া হয়।

ফলন

ফসল কাটার সময় কাঁচা অবস্থায় সবুজ পাটের ফলন একর প্রতি ৪০০-৫০০ মন হয়। প্রক্রিয়াজাত করে কাঁচা পাটের শতকরা ৫ ভাগ আঁশ এবং ১৫ ভাগ পাটকাঠি পাওয়া যায়।

ফসল কাটার সময় কাঁচা অবস্থায় সবুজ পাটের ফলন একর প্রতি ৪০০-৫০০ মন হয়। প্রক্রিয়াজাত করে কাঁচা পাটের শতকরা ৫ ভাগ আঁশ এবং ১৫ ভাগ পাটকাঠি পাওয়া যায়। দেশী পাটের ফলন তোষা পাটের চেয়ে সামান্য বেশি হয়। জাতের বিভিন্নতায় তোষা পাটের ফলন হেক্টর প্রতি ৪.০-৫.০ টন এবং দেশী পাটের ফলন ৪.৫ - ৫.২ টন পর্যন্ত হয়।

সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

পাট কাটার পর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আটি বেঁধে পচানোর ব্যবস্থা করলে গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বরং প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণ বাঞ্চনীয়। নিম্নে পাট কাটার পরবর্তী ধাপসম হ আলোচনা করা হলোঃ

(১) গাছ বাছাইকরণ ও আটি বাঁধা

একই জমিতে ছোট, বড়, চিকন, মোটা ইত্যাকার গাছ জন্মে। মোটা ও চিকন পাটের পচন হারের তারতম্য বিভিন্ন হয়; চিকন পাট দ্রুত পচে, মোটা পাট পচতে অনেক বেশি সময় নেয়। ফলে একই আটিতে চিকন-মোটা পাট একত্রে দিলে চিকন পাট বেশি পচে আঁশের মান নষ্ট হয়। অন্যদিকে মোটা পাট কম পচার কারণে আঁশ ছাড়াতে অসুবিধা হয় এবং শুকানোর পর আঁশে শক্ত ছালের পরিমাণ বাড়ে। তাই পাট কাটার পর গাছ বাছাই করে চিকন ও মোটা পাটগাছের আটি আলাদা আলাদা করে বাঁধতে হবে। বেশি মোটা আটিও পচতে সময় বেশি নেয়। সেজন্য ১৫-২০ সেমি ব্যাসের আটি করে বাঁধতে হবে।

(২) পাতা ঝরানো ও গোড়া ডুবানো

পচনকারী অনুজীবগুলো শক্ত কান্ডের চেয়ে নরম পাতা বেশি পছন্দ করে। ফলে আটিতে পাতা থাকলে পাট পচতে অসুবিধা হয়। এই কারণে জাক দেয়ার আগে পাট গাছের পাতা ঝরিয়ে ফেলা আবশ্যক। আটি বাঁধার আগে একগুচ্ছ পাট গাছ নিয়ে জমির উপর রেখে অপর গুচ্ছ গাছের গোড়াগুলো দিয়ে প্রথমোক্ত গাছের পাতাগুলোকে ঢেকে দিতে হবে এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সব পাট গাছগুলো ব্যবহার করতে হবে। তিন চার দিন পর পাটগাছগুলো তুলে সামান্য ঝাড়া দিলেই পাতা পড়ে যাবে।

পাট গাছের গোড়ার দিকটা মোটা ও শক্ত বিধায় মধ্য বা অগ্রভাগের তুলনায় তা দেরীতে পচে। এই অসুবিধা দুর করার জন্য জাক দেবার আগে আটিগুলোকে পানিতে খাড়া করে গোড়ার ৬০-৭০সেমি অংশ ৩/৪ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে জাক দেবার আগেই শক্ত গোড়ার অংশে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ফলে সামগ্রিকভাবে পাটগাছের আগা-গোড়া একই সাথে পচে। হাতুড়ির সাহায্যে গোড়ার এই অংশটি থেতলিয়ে নিলেও একই ফল পাওয়া সম্ভব।

(৩) জাক দেওয়া

> জাক দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জাকের উপরে কমপক্ষে ৩০ সেমি এবং নিচে কমপক্ষে ৬০ সেমি পানি থাকে।

পাট গাছ পচানোর জন্যে আটিগুলোকে সাজিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখাকে জাক দেওয়া বলে। সুষ্ঠুভাবে পাট জাক দেওয়ার জন্যে প্রথমে পানি নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিষ্কার এবং কমপক্ষে ১-১.২৫ মি পানির গভীরতা বিশিষ্ট জলাশয় নির্বাচন করাই শ্রেয়। জাক দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জাকের উপরে কমপক্ষে ৩০ সেমি এবং নিচে কমপক্ষে ৬০ সেমি পানি থাকে। এ ধরনের পানি সাধারণত খাল-বিল ও নদীতে পাওয়া যায়। এ ধরনের পানি পাওয়া না গেলে বদ্ধ পানিতেও পাট জাক দেওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ আটির জন্য ১ কেজি ইউরিয়া সার জাকের উপর ছিটিয়ে অথবা পানিতে গুলোয়ে ছিটিয়ে দিলে পাটের পচন ত্বরান্বিত হয় এবং আঁশের রং ভাল হয়। অতিরিক্ত পরিমাণ লৌহযুক্ত পানিতে পাট জাক দেওয়া উচিত নয়। কেননা, এতে লৌহ পাটের ট্যানিনের সাথে যুক্ত হয়ে পাটের আঁশের বর্ণ কালো করে দেয়। ফলে আঁশের গুণগত মান কমে যায়।

আমাদের দেশের কৃষকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাক দিয়ে থাকে। জাক দেওয়া স্থানের ওপর নির্ভর করে জাকের আকারও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণভাবে জাক দেওয়ার জন্যে প্রথমে জাকের আকার নির্দিষ্ট করে সে মোতাবেক এক প্রস্থ আটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দ্বিতীয় প্রস্থ আটি আড়াআড়িভাবে সাজানো হয়। এভাবে আটিগুলো সাজিয়ে পাশাপাশি গোড়া মাথা নিয়মে পাট গাছ দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়। এভাবে জাক তৈরি করে তারপর জাক পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক জাক ডুবাতে গিয়ে জাকের উপর কাদা, মাটি, কলাগাছ, ঝিগাগাছ প্রভৃতি ব্যবহার করে যা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে আঁশের রং কালো হয়ে যায়। জাক ডুবানোর জন্য বিজ্ঞান সম্মত উপায় হলো জাকের দুপার্শ্বে খুটি পুঁতে তাতে রশি বেঁধে জাক ডুবানো

হয়। এছাড়া জাক ডুবানোর জন্য পাথর বা কংক্রিটের চাক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কচুরিপানার সাহায্যেও পাটের জাক ডুবালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ছবি********************

(৪) পাট পচনের সমাপ্তি নির্ণয়

পাট পচানো মাত্রার ওপর আঁশের গুণাগুন অনেকাংশে নির্ভর করে, কেননা পচন কম হলে পাটের আঁশের সাথে ছাল থেকে যায় ফলে আঁশের গুণগত মান কমে যায়। পাট পচনের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যেন আঁশগুলো একটির সাথে অন্যটি লেগে না থাকে। জাক দেবার ১০-১২ দিন পর থেকে পচন পরীক্ষা করা উচিত। পচন পরীক্ষার জন্য ২/৩ টি পাট জাকের আটি থেকে বের করে তার মধ্যাংশ থেকে ২.৫ সেমি ছাল কেটে একটি ছোট শিশির ভিতর পানি দিয়ে ঝাকানোর পর শিশির পানি ফেলে আবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ঝাকিয়ে যদি দেখা যায় যে, আঁশ গুলো বেশ পৃথক হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে হবে পাটের পচন শেষ হয়েছে। সাধারণত শ্রাবন-ভাদ্র মাসে ১০-১৫ দিন এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে ২৫-৩৫ দিন পচনের সময় লাগে।

সাধারণত শ্রাবন-ভাদ্র মাসে ১০-১৫ দিন এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে ২৫-৩৫ দিন পচনের সময় লাগে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ স্বল্প পানি অঞ্চলে অর্থাৎ সেখানে কাঁচা অবস্থাতেই পাট থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেই ছাল অল্প পানিতে পঁচানোর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এটি পচানোর রিবন পদ্ধতি (Ribon retting) নামে পরিচিত। পদ্ধতিটি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

পাট থেকে পাতা ঝরানোর পর কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে গাছের গোড়া কিছু থেৎলে নিতে হয়। এরপর একটি বাঁশের খুটির মাথা চেছে ইংরেজী V অথবা U অক্ষরের মত তৈরি করে খুটিটি পুঁতে নিতে হয়। তারপর ছালসহ পাট কাঠিটি U এর মধ্যে রেখে ছাল দুদিকে টান দিলেই কাঠি থেকে পাটের ছাল সহজে পৃথক হয়ে আসে। পরে কয়েকটি গাছের ছাল একত্রে আটি বেঁধে একটি বড় চাড়ির পানির মধ্যে রেখে পচানো হয়। এক এক চাড়িতে প্রায় ৩০ কেজি পরিমাণ ছাল পঁচানো যায়।

ছবি************************

(৫) আঁশ ছাড়ানো ও ধৌতকরন

উপযুক্ত সময়ে আঁশ ছাড়ালে উচ্চমান সম্পন্ন আঁশ পাওয়া যায়। পাট গাছ থেকে আঁশ দুটি পদ্ধতিতে ছাড়ানো হয়-

ক) শুকনো স্থানে বসে একটি বা দুটি পচানো পাটগাছ থেকে একটু আঁশ ছাড়িয়ে পরে আঙ্গুল দ্বারা সম্পূর্ণ গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো হয়। এভাবে কয়েকটি পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়িয়ে ধৌত করে আটি বেঁধে রাখা হয়। এক্ষেত্রে পাটকাঠি ভাঙ্গা হয় না বিধায় আস্ত থাকে।

খ) হাটু থেকে কোমর পানিতে দাড়িয়ে পাটের আটির গোড়ার দিকের শক্ত অংশ কাঠের মুগুর দ্বারা পিটিয়ে আঁশ বের করা হয়। পচা আঁশসহ গাছগুলোর গোড়া থেকে প্রায় ৫০ সেমি দ রে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এবং ঝাকি দিয়ে ভাংগা অংশের পাট কাঠি আলাদা করা হয়। অতঃপর ছাড়ানো আঁশ হাতে পেচিয়ে পানির উপরি তলে কয়েক বার সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে পাটকাঠি থেকে আঁশ পৃথক করা হয়। এরপর আঁশ ধুয়ে আটি বাধা হয়।

(৬) পাটের আঁশ শুকানো

রৌদ্রযুক্ত স্থানে বাঁশের আড়া বানিয়ে তাতে পাট শুকানো হয়। আড়ায় পাট শুকানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভিজা আঁশ মাটি স্পর্শ না করে। ভালভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে একত্রে বেঁধে রাখা হয়। আঁশ বেশি শুকালে তা ভংগুর হয়ে যায় এবং গুণগত মান নষ্ট হয়। আবার কম শুকালে আঁশে পানি থাকে ও তাতে পচনক্রিয়া চলতে থাকে। এক্ষেত্রেও পাট অধিক পচে গুণগত মান ক্ষুণ্ন হয়।

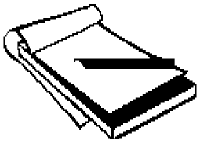

***অনুশীলন (Activity):** আমাদের দেশে সাধারনত কীভাবে পাটের আঁশ ছাড়ানো হয়? এর সাথে আধুনিক পদ্ধতির তুলনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। পাটের অধিক ফলন ও গুণাগত মান নিশ্চিত করার জন্য কী করবেন ?

(ক) ভাল বীজ বুনবেন
(খ) জমি ভাল চাষ করবেন
(গ) পাটচাষে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন
(ঘ) সঠিকভাবে পাট পচাবেন।

২। আঁশের ফলন ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে পাট কখন কাটবেন ?

(ক) গাছে ফল পাকবার সময়
(খ) ফুল ফোটার সময়
(গ) বীজ বোনার ৪ মাস পরে
(ঘ) ফুল থেকে ফল ধরার সময়।

৩। কাঁচা সবুজ পাটের শতকরা কত ভাগ আঁশ ও পাটকাঠি পাওয়া যায় ?

(ক) ১০ ও ১৫%
(খ) ৫ ও ২০%
(গ) ৫ ও ১৫%
(গ) ৫ ও ১০%

৪। গাছ বাছাই করার কারণ কী ?

(ক) লম্বা ও ভাল গাছগুলো আলাদা করে নেওয়া
(খ) দ্রুত পচানোর জন্য
(গ) জাক ডুবানো সহজ করার জন্য
(ঘ) পচনহারের তারতম্য দ র করার জন্য।

৫। জাক ডুবানোর উত্তম পদ্ধতি কোন্‌টি ?

(ক) কলাগাছ দিয়ে জাক ডুবানো
(খ) কাদা মাটি দিয়ে জাক ডুবানো
(গ) দুটি খুটি ও দড়ির সাহায্যে জাক ডুবানো
(ঘ) কাঠের গুড়ি দিয়ে জাক ডুবানো।

পাঠ ৬.৫ তুলা চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে তুলা চাষ বর্ণনা করতে পারবেন।
- তুলা সম্পর্কিত কিছু বিশেষ শব্দ (Terminolog) উলে-খ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের তুলার ফলন কী রকম তা বলতে পারবেন।

> পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ তুলা আসে *G. hirsutum* প্রজাতি হতে।

তুলা *Gossypium* গণের Malvaceae পরিবারের উদ্ভিদ। এই গণের ৩১ টি প্রজাতির মধ্যে আঁশ উৎপাদনের জন্য ৪টি প্রজাতি গুরুত্বপূর্ণ- *G. hirsutum, G. barbadense, G. arboreum* Ges *G. herbaceum.* পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ তুলা আসে *G. hirsutum* প্রজাতি হতে। *এ. যবৎনধপবঁস* হচ্ছে বাংলাদেশের প্রচলিত নামের Comilla cotton। এটি মোটা সুতা বিশিষ্ট, খাটো আঁশের নিু ফলনশীল প্রজাতি। বর্তমানে দেশের চাষকৃত সব তুলাই *G. hirsutum* প্রজাতির এবং এর জাতগুলো আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত।

তুলা বীজ হতে উৎপন্ন আঁশ। বীজের বহিঃত্বকের কিছু কোষের বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আঁশের জন্ম হয়। আঁশগুলো এককোষ বিশিষ্ট এবং দুধরনের- ছোটগুলো দফাজ' (Fuzz) ও বড়গুলো 'লিন্ট' (Lint) নামে পরিচিত। লিন্ট ও ফাজসহ বীজকে বীজ তুলা (Seed cotton) বলে। এটিই ফসল হিসেবে গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং শুকানোর পর বাজারে বিক্রি করা চলে। বয়নকাজের জন্য অবশ্য বীজ তুলাকে জিনিং (Ginning) করতে হয়। জিনিং অর্থ বয়নকাজে ব্যবহৃতব্য লিন্ট (Lint) কে বীজ তুলা থেকে আলাদা করা। সাধারনভাবে জাত ও মানের বিভিন্নতায় বীজ তুলা হতে ৩০-৪০% লিন্ট সংগৃহীত হয় এবং এই হারকে জিনিং শতাংশ (Ginning out turn-G.O.T) বলে। ফসল বপনের জন্য ব্যবহৃত বীজকে তুলাবীজ (Cotton seed) বলে যাতে লিন্ট থাকে না। তবে ফাজ বিদ্যামান থাকে।

জমি নির্বাচন

> দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি তুলা চাষের জন্য উৎকৃষ্ট। তুলা গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা।

প্রায় সব ধরনের মাটিতে তুলা জন্মে। তবে বেশি বেলে ও ঘন এঁটেল মাটি তুলা চাষের উপযোগী নয়। বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি তুলা চাষের জন্য উৎকৃষ্ট। তুলা গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা। সেজন্য যে মাটিতে বন্যার পানি ওঠে না বা দীর্ঘসময় বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এ ধরনের জমি তুলা চাষের উপযোগী।

জমি তৈরি

তুলা গভীরমুলী ফসল। তাই গভীরচাষ তুলা চাষের অধিক উপযোগী। 'জো' অবস্থায় প্রয়োজনীয় চাষ-মই দিয়ে (৩-৬ টি) মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় আনা সমীচীন, সেই সাথে আগাছা- আবর্জনা পরিষ্কার করে নিতে হয়। তবে জমির বেশি আর্দ্রতা ও বীজ বপনের সীমিত সময়ের কারণে জমি যথাযথ প্রস্তুত না করেও নিড়ানী বা হাত লাঙ্গল দিলে মাটি আলাদা করে বীজ বপন করা যায়। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে

কোদালের সাহায্যে আন্ ঃচাষ করলেও চলে।

সার প্রয়োগ

ভাল ফসল পেতে হলে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। রাসায়নিক সার ব্যবহার ছাড়াও সম্ভব হলে হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন পচা গোবর বা আবর্জনা সার ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে মাটির উর্বরতা বাড়ে, আনুপাতিক হারে রাসায়নিক সার কম লাগে এবং দস্তা, বোরন, ম্যাগনেশিয়াম জাতীয় অনুখাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় না।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৯৩) এর সুপারিশ অনুযায়ী তুলার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাত্রা নিম্নরূপঃ

টেবিল ৬.৫ কঃ তুলার জমিতে ব্যবহৃতব্য সারের মাত্রা

সার	মাত্রা	
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
১। ইউরিয়া	২০০-২৫০ কেজি	৮০-১০০ কেজি
২। টিএসপি	১৫০-১৭৫ ”	৬০-৭০ ”
৩। এমপি	১০০-১৫০ ”	৪০-৬০ ”
৪। জিপসাম	২৫-৩০ ”	১০-১২ ”
৫। চুন (অম্লযুক্ত লাল মাটির ক্ষেত্রে)	২ টন	২২ মণ

রশিদ প্রমুখের (১৯৮৭) মতে রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলে হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি এমপি সার কম দিলেও চলে।

ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ দিকে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের ১/৪ ভাগ বীজ বপনের পূর্বে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে বাকি ৩/৪ ভাগ ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে তুলা গাছের বয়স ২০-২৫ দিন, ৪০-৫০ দিন ও ৬০-৭০ দিন হলে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। এঁটেল-দোআঁশ বা লাল মাটির ক্ষেত্রে ঐ ৩/৪ ভাগ ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে গাছের বয়স ২০-২৫ দিন ও ৫০-৬০ দিন হলে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া পার্শ্ব প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সার বিপরীত সারিতে ৫-৬ সেমি গভীর নালায় প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

জাত নির্বাচন

আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত জাত ডেল্টাপাইন- ১৬ বহুদিন ধরে বাংলদেশে চাষ হয়ে আসছে। এ ছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯০ সনে আমেরিকা থেকে আরও ৮টি জাত এনে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিবি-১ (ডেল্টাপাইন -৯০), সিবি-২ (ডেল্টাপাইন-৬০), সিবি-৩ (ডেল্টাপাইন-৫০) এবং সিবি-৪ (ডেল্টাপাইন-৪১) নামের উচ্চফলনশীল জাতগুলো চাষীদের মাঝে বিতরণ করেছে। এর মধ্যে সিবি-১ বৃহত্তর যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলার জন্য, সিবি-২ বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার জন্য, এবং সিবি-৩ বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার জন্য চাষের উপযোগী। সিবি-৪ একটি শুয়াযুক্ত (civiate) জাত বিধায় জ্যাসিড নামক পোকার আক্রমন সহিষ্ণু।

বীজ বোনার সময়

পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায় খরিপ মৌসুমে তুলা চাষ হয়। তবে খরিপ মৌসুমে তুলা চাষ করলে তুলা সংগ্রহ করতে ১০-১১ মাস সময় লাগে। পোকা মাকড়ের উপদ্রব বেশি হয় এবং ফলন ও গুনগত মান কমে যায়। এজন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রধানত রবি মৌসুমে তুলা চাষ হয়। সময়মত বীজ বপন সার্থকভাবে তুলা চাষের জন্য একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। কারণ নাবী হলে ফলন দারুনভাবে কমে যায়। আগাম শীত এলাকায় যেমন- রংপুর, দিনাজপুরে শ্রাবন হতে ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্য বীজ বোনা শেষ করা বাঞ্চনীয়। অন্যান্য এলাকায় শ্রাবনের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। কোন জায়গাতেই ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহের পরে বীজ বোনা সমীচীন নয়।

আগাম শীত এলাকায় যেমন- রংপুর, দিনাজপুরে শ্রাবন হতে ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্য বীজ বোনা শেষ করা বাঞ্চনীয়। অন্যান্য এলাকায় শ্রাবনের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরন

তুলা বীজে ফাজ থাকার কারণে একাধিক বীজ একত্রে গায়ে গায়ে লেগে থাকে। সেজন্য বীজ বুনতে অসুবিধা হয়। বোনার আগে তুলা বীজকে ৩/৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সেগুলোকে মাটি ও শুকনো গোবর বা ছাই দিয়ে এমন ভাবে ঘসে নিতে হবে যাতে ছোট আঁশগুলো বীজের গায়ে লেগে যায় এবং প্রতিটি বীজ আলাদা আলাদা থাকে। এছাড়া সালফিউরিক এসিড দিয়েও বীজকে আঁশমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে বীজের গায়ে লেগে থাকা রোগজীবাণু ও পোকার ডিমও বিনষ্ট হয়।

বীজ হার ও বীজ বপন

হেক্টর প্রতি ১২- ১৫ কেজি বীজ প্রয়োজন।

উত্তর-দক্ষিণ লাইন করে সারিতে বীজ বপন বিধেয়। হেক্টর প্রতি ১২- ১৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। সিবি-১ এর জন্য সারির দুরত্ব ১০০সেমি ও গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৫০-৬০সেমি। অন্যান্য জাতগুলোর বেলায় সারির দুরত্ব ৯০-১০০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৪৫-৫০ সেমি।

হাত লাঙ্গল দিয়ে হালকা গভীর (১.২৫ -২.৫ সেমি) সারি টেনে নির্ধারিত দুরত্বে ৩/৪টি করে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। জমি আর্দ্রতা বেশি হলে ডিবলিং পদ্ধতিতে সারিতে বীজ বপন করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই অনুমোদিত সার বীজ বোনার আগে সারি/গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা পাতলাকরণ

হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ হাজার তুলা গাছ কাংখিত।

দু'বারে চারা পাতলা করে দিতে হয়। প্রথমে চারা গজানোর ১০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত দুরত্বে দুটি ভাল চারা রেখে বাকি চারাগুলো তুলে ফেলতে হবে। পরবর্তিতে ২০-২৫ দিনে একটি সবল চারা রেখে অবশিষ্ট চারা তুলে ফেলতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনে আগাছা সাফ করে ফেলতে হবে। কোন কারণে যদি গোছাতে একটি সুস্থ সবল চারা না থাকে তাহলে ঘন চারার জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় মাটিসহ চারা তুলে যেখানে চারা নেই সেখানে রোপন করতে হবে এবং গোছায় সামান্য পানি দিতে হবে। এটি চারা গজানোর এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ হাজার তুলা গাছ কাংখিত।

আন্তঃপরিচর্যা

যথেষ্ট পাতলা করে লাগানো হয় বলে তুলা ফসলে প্রচুর আগাছা জন্মে। সময় মতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগাছা দমন প্রয়োজন। আগাছার প্রকোপ অনুসারে ২-৩ বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়। সারির মাঝেখানে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিলে আগাছা উৎপাটন ও মাটি আলগা হয়। তুলার জমিতে যেন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রয়োজনে নালা কেটে বৃষ্টির পানি বের করে দিতে হবে।

রবি মৌসুমে তুলা চাষে সেচের প্রয়োজন হয়। মাটির আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে ২-৩ টি হালকা সেচ দিলে চলে।

তুলা গাছে বেশ কয়েকটি রোগের প্রদুর্ভাব হয়। এনথ্রাকনোজ্ (*Colletotricum gossypii*), নেতিয়ে পড়া (*Fusarium oxysporium, F. vasinfectum, Verticillium alboatrum*), চারা ধ্বসা (*Rhizoctonia sp.*) পাতা ঝলসানো (*Ascochyta gossypii*) ইত্যাদি। বীজ বাহিত রোগের জন্য বীজ শোধন এবং অন্যান্য রোগের জন্য ৫% কপার অক্সিক্লোরাইড, ২.৫% ডাইথেন এম ৪৫ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ধ্বসা রোগের প্রতিরোধের জন্য জমিতে পানি নিস্কাশন নিশ্চিত করেত হবে।

পোকা মাকড়ের মধ্যে বল ওয়ার্ম (Boll-worm) তুলার প্রধান শত্র।

পোকা মাকড়ের মধ্যে বল ওয়ার্ম (Boll-worm) তুলার প্রধান শত্র। গাছের বয়স ৩/৪ সপ্তাহ হলে এই পোকার কীড়া গাছের ডগা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ও ডগার কচি অংশ খেতে থাকে। ফলে ডগা নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং পরে শুকিয়ে যায়। পরবর্তিকালে এই পোকার কীড়া ফুলে ও ফলে আক্রমন করে এবং সেগুলো ঝরে পড়তে থাকে। এই পোকা দমনের জন্য হাত বাছাইয়ের পর হেক্টর প্রতি ৩০০ মিলি রিপকর্ড/সুমিসাইডিন/সিমবুশ/ডেনিস ২০-২৫ মেশিন পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রেয়ারের

সাহায্যে ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ভাল ফলের জন্য ১৫-২০ দিন পর পর আরো ৩/৪ বার এই ওষধ ছিটানো দরকার।

অন্যান্য পোকার মধ্যে জ্যাসিড, জাব পোকা ও তুলার পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ফসল আক্রান্ত হতে পারে। ফসল পর্যবেক্ষন করে এগুলোর আবির্ভাব দেখা দেওয়ার সাথে সাথে উপযুক্ত ঔষধ ছিটিয়ে (এজেড্রিন/নুভাক্রন) পোকা দমন করতে হবে।

তুলা সংগ্রহ

রবি মৌসুমে বীজ বপনের প্রায় ৫ মাস পর তুলার ফল (বল) পরিপক্কতা লাভ করে।

রবি মৌসুমে বীজ বপনের প্রায় ৫ মাস পর তুলার ফল (বল) পরিপক্কতা লাভ করে। বল ফেটে সাদা তুলা বের হয়। একটি গাছে বেশ কিছু দিন ধরে ফুল আসে তাই ফুল ফোটা ও বলের পরিপক্কতা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পাশাপাশি চলতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে সাধারনত তিন বারে ক্ষেতের বীজ তুলা উঠাতে হয়। প্রথম বারে ৫০% বল ফেটে গেলে তুলা উঠনো যায়। পরবর্তি ১৫-২০ দিনের ভিতরে যথাক্রমে ৩০ ও ২০% তুলা উঠানো সম্পন্ন হয়। তুলা উঠানো সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পরিষ্কার শুকনো দিনে তুলা উঠানো হয় । মরা পাতা ও পোকায় আক্রান্ত তুলা যেন একত্রে না উঠে আসে এবং অপরিস্কার কোন পাত্রে /ভান্ডে যেন তুলা না তোলা হয়। পোকা আক্রান্ত খারাপ ও অপুষ্ট তুলা আলাদা ভাবে তুলতে হবে। তুলা উঠানোর পর ৩/৪ বার ভাল করে রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে।

হেক্টর প্রতি ১২০০-১৫০০ কেজি বীজ তুলা পাওয়া যায়।

ফলন

হেক্টর প্রতি ১২০০-১৫০০ কেজি বীজ তুলা পাওয়া যায়। তবে, যথাযথ চাষ পদ্ধতি গ্রহণ ও উন্নত জাত চাষ করলে এ ফসল অনেকখানি বাড়ানো সম্ভব।

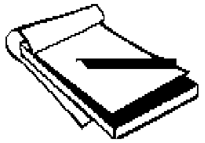

অনুশীলন (Activity) : *পাঠ ৬.৫ -এ তুলা সম্পর্কিত নতুন শব্দাবলী (Terminologies) আলোচনা করুন। কীভাবে তুলা সংগ্রহ করা হয় বর্ণনা করুন।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

১। সাধারণভাবে তুলার জিনিং শতাংশ কত?

(ক) ২০-৩০% (খ) ৩০-৪০%

(গ) ৪০-৫০% (ঘ) ৫০-৬০%।

২। বেলে দোআঁশ মাটিতে তুলা চাষে বাকি ইউরিয়া কত কিস্তিতে দেওয়া প্রয়োজন ?

(ক) দুই কিস্তিতে (খ) চার কিস্তিতে

(গ) তিন কিস্তিতে (ঘ) এক কিস্তিতে।

৩। নিম্নলিখিত কোন্ জাতটি বৃহত্তর যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলার জন্য অনুমোদিত ?

(ক) সিবি-৪ (খ) সিবি-৩

(গ) সিবি-১ (ঘ) সিবি-৩।

৪। বাংলাদেশে আগাম শীত এলাকায় তুলা বোনার উপযুক্ত সময় কোনটি?

(ক) শ্রাবনের শেষে (খ) ভাদ্রের শেষে

(গ) শ্রাবন হতে ভাদ্রের ১ম সপ্তাহের মধ্যে (ঘ)ভাদ্রের ৩য় সপ্তাহে।

৫। কতবারে তুলা সংগ্রহ করলে ফলন ভাল হয় ?

(ক) দুই বার (খ) তিন বার

(গ) একবার (ঘ) চার বার।

১। আঁশ ফসল বলতে কী বুঝায় ? আঁশ ফসলের গুরূত্ব বর্ণনা করুন।

২। আঁশ ফসল কী কী ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ? উদাহরণসহ আঁশ ফসলের ব্যবহারগত শ্রেণীবিন্যাস বর্ণনা করুন।

৩। বাংলাদেশে চাষকৃত আঁশ ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবার উল্লেখসহ পরিচয় দিন।

৪। পাটের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

৫। পাতা, কান্ড, ফুল ও বীজ দেখে কীভাবে দেশী ও তোষা জাতের পাটের পার্থক্য নিরুপণ করবেন?

৬। বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত দেশী ও তোষা পাটের জাতগুলোর নাম লিখুন।

৭। পাট মানুষের কী কী কাজে লাগে ? পাটের সম্ভাবনাময় দিকগুলো উল্লেখ করুন।

৮। কীভাবে পাট চাষের জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি করবেন ?

৯। পাট চাষে কী কী সার ব্যবহার করবেন ? জৈব ও অজৈব সারগুলোর পরিমান ও ব্যবহার বিধি লিখুন।

১০। সঠিক সময়ে পাট বীজ বোনার কী প্রয়োজন আছে ? পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রধান জাতগুলোর বপনের সঠিক সময় লিখুন।

১১। পাটের বীজহার কত ? পরিমানমত বীজ বোনার আবশ্যকতা কী ?

১২। সার উপরি প্রয়োগ কী ? পাট চাষে সার উপরি প্রয়োগ কীভাবে করা হয় ?

১৩। আঁশ উৎপাদনের জন্য পাট গাছের পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্য লিখুন। কোন্ অবস্থায় পাটকাটা সঙ্গত বলে আপনি মনে করেন এবং কেন ?

১৪। পাটের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বলতে কী বুঝায় ? গাছ বাছাই, আটিবাধাঁ, পাতা ঝরাণো এবং গোড়া ডোবানোর মধ্যে প্রযুক্তিগত দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।

১৫। 'জাক' কী ? কীভাবে পাটের জাক দেওয়া হয় এবং পচনের সমাপ্তি নির্ণয় করা যায় তা লিখুন।

১৬। যে অঞ্চলে জলাশয়ের দুষ্প্রাপ্যতা আছে সেখানে কীভাবে পাট পচাবেন ? আঁশ ছাড়ানো ও শুকানোর মধ্যে কী কী বিষয়ে নজর রাখবেন ?

১৭। প্রধান প্রধান তুলা উৎপাদনকারী প্রজাতিগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

১৮। লিন্ট, ফাজ, তুলাবীজ ও বীজতুলা বলতে কি বুঝায়?

১৯। তুলার জন্য জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ কীভাবে করবেন লিখুন।

২০। বাংলাদেশে চাষকৃত তুলার জাত কী কী? বোনার আগে কীভাবে তুলাবীজ প্রক্রিয়াজাত করবেন?

২১। তুলা চাষের আন্তঃপরিচর্যা আলোচনা করুন।

২২। কীভাবে তুলা সংগ্রহ করবেন ? বাংলাদেশে তুলার ফলন কত ?

উত্তরমালা

পাঠ ১

১। গ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ঘ।

পাঠ ২

১। গ,২। ঘ, ৩। ক, ৪। ঘ, ৫। খ ।

পাঠ ৩

১। খ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। ক, ৫। গ।

পাঠ ৪

১। গ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। গ।

পাঠ ৫

১। খ, ২। গ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। খ।

এই পাঠ শেষে আপনি

- ◆ পাট চাষে জমি তৈরির গুরুত্ব জানবেন।
- ◆ পাটের জন্য জমি তৈরি করতে পারবেন।
- ◆ পাটের বীজ শোধন করতে পারবেন।
- ◆ পাটের বীজ বুনতে পারবেন।

উত্তমরূপে জমি চাষ, সঠিক সময়ে বীজ বপন এবং যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে পাটের কাংখিত ফসল পাওয়া যায়। পাট একটি গভীরম লী ফসল বিধায় পাটের জমি গভীরভাবে চাষ করতে হয়। এর বীজ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অঙ্কুর ধান বা গমের তুলনায় নরম (Tender) বলে জমি চাষ করে ভাল কর্ষিত অবস্থায় আনা প্রয়োজন। জমির উপরিভাগ চাষের পর সমতল অবস্থায় আনতে হবে, প্রয়োজনে পানি নিকাশের জন্য নালার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজের ধারা

জমি নির্বাচন

এঁটেল বা বেলে মাটি ছাড়া আর যে কোন ধরনের মাটিতে সফলভাবে পাট চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশী পাট উঁচু-নীচু দুধরনের জমিতেই চাষ করা চলে। পাট চাষের জন্য জমি তৈরির প র্বে জমির মাটি গুনাগুন ভালভাবে জেনে নিন।

জমি তৈরি

পাটের জন্য পরিস্কার চাষ (Clean cultivation) দরকার। বোনার আগে জমির মাটি যেন ঝুরঝুরে অবস্থায় আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। রবিশস্য সংগ্রহের পর পাটের জমিতে চাষ দেবার জন্য অপেক্ষা করুন। মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে ‘জো’ আসলে প্রথম লাঙ্গল চাষ দিন। পরবর্তী বৃষ্টিগুলোর পরেও চাষ-মই দিয়ে জমি প্রস্তুতি অব্যাহত রাখুন। আগাছাগুলো পরিস্কার করুন অথবা জমির সাথে মিশিয়ে দিন। বৃষ্টির পর অনেক আগাছা অঙ্কুরিত হয় এবং চাষে বিনষ্ট হয়। এভাবে ৫-৬ টি চাষ-মই দিয়ে মাটি মোটামুটি একটি কর্ষিত অবস্থায় এনে জমিতে বীজ বোনার আগে একটি মাঝারী বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করুন।

সার প্রয়োগ

গোবর বা জৈব সার দ্বিতীয় বা তৃতীয় চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করুন যাতে এ সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশে যায়। প্রয়োজনীয় অন্যান্য সার (ইউরিয়া ব্যতীত) শেষ চাষের আগে মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে চাষ-মই দিন।

বীজ শোধন

এই ফসলে তিনটি বীজবাহিত (Seed borne) রোগ হয়। কাল পট্টি (Block band), কান্ড পচা (Stem rot), এবং এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)। বীজ শোধন করলে এই রোগগুলোর আক্রমণ কমে এবং শোধিত বীজ থেকে উৎপন্ন চারা অন্যান্য সংক্রমনের হাত থেকেও রেহাই পেতে পারে। বীজ শোধনের জন্য নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতির যে কোনটি গ্রহন করতে পারেন-

ক) গরম পানি পদ্ধতি- পরিস্কার পানি একটি পাত্রে নিয়ে ৫০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় গরম করুন। পরিমানমত বীজকে ৫-১০ মিনিট ঐ পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। এর পর বীজকে হালকা শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বপন করুন।

খ) বীজে ছত্রাক নাশক প্রয়োগ- প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ক্যাপ্টান/ ৬ গ্রাম গ্রানোসান এম বা এগ্রোসান জি এন বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। রোটারী ড্রাম সীড ট্রিটারে বীজ ও গুঁড়া ঔষধ নিয়ে ঘর্ষণের মাধ্যমে ভালভাবে মিশানো যায়। একটি কাঁচের বয়মের মাধ্যমেও এ কাজ সম্পন্ন করা যায়।

বীজহার

পাটের বীজের অঙ্কুরোদম ক্ষমতা ৯০-৯৫% হলে ভাল। পুরাতন বীজ (এক বছরের অধিক হলে) অত্যন্ত নিম্নমানের হয় এবং এটি ব্যবহার করা নিষেধ। BJRI (১৯৯০) -এর সুপারিশ অনুযায়ী পাটের বীজহার নিম্নরূপঃ

পদ্ধতি	দেশী পাট	তোষা পাট
ক) সারি	৬-৭ কেজি / হেক্টর	৩.৫-৪.৫ কেজি / হেক্টর
খ) ছিটিয়ে	৮-১০ কেজি / হেক্টর	৬-৮ কেজি / হেক্টর

ছিটিয়ে বপন অপেক্ষা সারিতে বুনলে কম বীজ লাগে। অন্যাদিকে সারিতে বুনলে আঁশের ফলন ও গুণগতমাণ বৃদ্ধি পায়। আন্ত পরিচর্যা বিশেষ করে নিড়ানী ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ সহজতর হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি

আমাদের দেশে সাধারণত ছিটিয়ে পাটের বীজ বপন করা হয়। এক্ষেত্রে শেষ চাষ দেবার পর বীজ ছিটিয়ে দিন এবং মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিন। জমিতে যদি বড় বড় ঢেলা দেখা যায় তাহলে বোনার পর পরই মুগুর দিয়ে তা ভেঙ্গে দিন। সারিতে বপন করার সুবিধাজনক প্রযুক্তি হচ্ছে বপন যন্ত্রের ব্যবহার করা (চিত্রঃ ৬.৬ ক)। এর সাহায্যে সারি থেকে সারির দুরত্ব এবং বীজ থেকে বীজের দুরত্ব সহজে বজায় রাখা যায়। দেশি পাটের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দুরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং তোষা পাটের জন্য ২৫-৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দুরত্ব উভয় পাটের ক্ষেত্রে ৫-৭ সেমি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন ঃ

১। পাটের জন্য জমি নির্বাচন ও জমি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। পাটের জমি কীভাবে চাষ করবেন ?

৩। পাটের বীজ কীভাবে শোধন করা যায় বর্ণনা করুন।

৪। পাটের বীজ ছিটিয়ে বোনা ও সারিতে বোনার সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।

আ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণ- আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুণ)।

১। পাটের জন্য কী ধরনের জমি চাষ দরকার ?

ক) Coarse tilth
খ) Medium tilth
গ) Fine tilth
ঘ) Very fine tilth

২। দেশী পাট চাষের জন্য কী ধরনের জমি দরকার ?

ক) নিচু জমি
খ) মাঝারী নিচু জমি
গ) খুব নিচু জমি
ঘ) উঁচু-নিচু দু'ধরনের জমি।

৩। পাটের জমিতে গোবর সার কখন দিতে হয় ?

ক) জমি চাষের আগে
খ) বীজ বোনার সময়
গ) বীজ বোনার পরে
ঘ) ১ম বা ২য় চাষের সময়।

৪। গরম পানি দিয়ে বীজ শোধনের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা কোন্‌টি ?

ক) ৪০ ক্ক সে.
খ) ৮০ক্ক সে.
গ) ৫০ক্ক সে.
ঘ) ১০০ক্ক সে.।

৫। পাট চাষে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব কত ?

ক) ১০-১২ সেমি.
খ) ৩-১০ সেমি.
গ) ৫-৭ সেমি.
ঘ) ৬-১২ সেমি.

সঠিক উত্তর ঃ আ. ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ

ইউনিট ৭ চিনি ফসলের চাষ

ইউনিট ৭ চিনি ফসলের চাষ

চিনি (Sucrose) আমাদের নিকট অত্যন্ত পরিচিত এজন্য যে, এটি একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য। চাউল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্যের তুলনায় মানুষ চিনি খুব কম পরিমাণে আহার করে। কারন, মানুষ চিনি সরাসরি গ্রহণ করে না। বিভিন্ন দ্রবসামগ্রী যেমন বেকারী শিল্প, মিষ্টান্ন, নানা রকম পানীয়, শিশু খাদ্য, চকলেট, রোগীর পথ্য, ঔষধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্পসহ নানা কাজে চিনি ব্যবহৃত হয়। চিনি মানবদেহে শক্তি যোগায় এবং শরীরে সহজে আত্নীয়করণ হয়ে যায় এজন্য এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী খাদ্য উপকরণ। কিছু সংখ্যক চাষকৃত উদ্ভিদ থেকে বাণিজ্যিক ভাবে চিনি সংগ্রহ করা হয়। আখ, সুগার বীট, ভূট্টা ইত্যাদি চিনি উৎপাদকারী ফসলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি চিনি ফসলের পরিচিতি ও আখচাষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

এ ইউনিটের ৫টি তত্ত্বীয় পাঠে চিনি ফসলের পরিচিতি, বাংলাদেশের প্রধান চিনি ফসল আখের বিস্তারিত উৎপাদন পদ্ধতি, আখ কর্তন ও মাড়াই প্রভৃতি বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি ব্যবহারিক পাঠে আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ এবং জমিতে আখের বীজখন্ড রোপন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

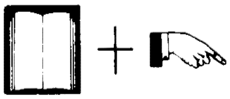

পাঠ ৭.১ চিনি ফসলের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি

- চিনি কী এবং উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ থেকে চিনি পাওয়া যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পৃথিবীর প্রধান চিনি ফসলগুলোর নাম ও পরিচয় বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের চিনি ফসলগুলোর নাম ও উৎপাদনগত অবস্থান বর্ণনা করতে পারবেন।

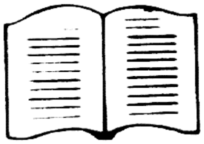

সমস্ত উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে গ্লুকোজ চিনি (Glucose) প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রায় সকল উদ্ভিদই শ্বসনের মাধ্যমে সেই চিনি নিঃশেষ করে ফেলে। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা প্রস্তুতকৃত এই চিনিকে সুক্রোজ চিনি হিসেবে নিজ দেহের বিভিন্ন অংশে জমা করে রাখে। ফলে এ সকল উদ্ভিদ থেকে মানুষের খাবার উপযোগী চিনি সংগ্রহ করা যায়। বাণিজ্যিক-ভাবে চিনি সংগ্রহের সহজলভ্য উৎস হচ্ছে আখ, সুগার বীট, সাগো, ভূট্টা ইত্যাদি উদ্ভিদ। কাজেই মানুষের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য চিনি সরবরাহকারী এ সমস্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা আবশ্যক।

চিনি উৎপাদনকরাী ফসলসমুহের পরিচিতি

যে সমস্ত উদ্ভিদ থেকে চিনি সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে চিনি উৎপাদনকারী ফসল বলে। চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলো তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে সুক্রোজ জমা করে রাখে। যেমন- আখ, খেজুর, সুগার, ম্যাপল, ভূট্টা, সরগম, সাগো প্রভৃতি উদ্ভিদ এদের কান্ডে চিনি জমা করে রাখে। এদের মধ্যে সাগো ব্যাতীত অন্যগুলোর ক্ষেত্রে কান্ডের কোষকলার ভিতর রস (Cell sap) হিসেবে চিনি বিদ্যমান থাকে। সাগোর ক্ষেত্রে পূর্নবয়স্ক গাছে পিথের (Pith) উপরিভাগে কান্ডাংশের মাঝে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রানিউল (Granule) আকারে দানাদার সুক্রোজ অবস্থান করে। সুগার বীট ও গাজরের মূলে সুক্রোজ থাকে। নারিকেল ও তাল গাছের ফুল থেকে সুক্রোজ পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু কিছু উদ্ভিদ তাদের ফলে সুক্রোজ সঞ্চয় করে রাখে। উল্লিখিত উদ্ভিদগুলোর মধ্যে বিশ্বে চিনি উৎপাদনের বিবেচনায় আখ এবং সুগোর বীট হচ্ছে অন্যতম। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত চিনির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আখ থেকে এবং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ সুগার বীট থেকে উৎপন্ন হয় (দাস, ১৯৯৩)। নিম্নে বিশ্বের চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর তালিকা দেওয়া হলোঃ

> পৃথিবীর মোট উৎপাদিত চিনির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আখ থেকে এবং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ সুগার বীট থেকে উৎপন্ন হয়।

টেবিল ৭.১ কঃ চিনি উৎপাদনকারী ফসলের তালিকা

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিবার
আখ	*Saccharum officinarum*	Gramineae
সুগার বীট	*Beta vulgaris*	Chenopodiaceae
সুগার ম্যাপল	*Acer saccharum*	
ভূট্টা	*Zea mays*	Gramineae
সরগম	*Sorghum vulgare*	Gramineae
গাজর	*Daucus carota*	Umbelliferae
নারিকেল	*Cocos nucifera*	Palmaceae
খেজুর	*Phoneix sylvestris*	Palmaccae
তাল	*Caryota urens*	Palmaceae
সাগো	*Borassus flabellifer*	
	Metroxylon sago	Palmaceae

বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর পরিচিতি

আখই হচ্ছে বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, খেজুর ও তাল থেকে গুড় উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে সুগার বীট চাষের দু'একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হলেও ব্যাপক ভাবে এই ফসলটির চাষ এবং বাণিজ্যিকভাবে এটি থেকে চিনি উৎপাদন এখনো সম্ভব

> প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয় এবং মোট আখ উৎপাদন প্রায় ৭০ লক্ষ টন।

হয়নি। আখ থেকে এদেশে মিল এলাকাতে চিনি তৈরি হলেও মিল এলাকার বাইরে প্রচুর পরিমাণে গুড় উৎপাদিত হয়। দেশের মোট আবাদি জমির মধ্যে আখের জমির পরিমান বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয় এবং মোট আখ উৎপাদন প্রায় ৭০ লক্ষ টন। দেশের ১৪ টি চিনি কলে প্রায় ১.৫ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়। যদিও এই উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এদেশে চিনি উৎপাদনকারী ফসলের মধ্যে আখের পরেই খেজুরের স্থান। খেজুর এখানে চাষ করা হয় না, প্রাকৃতিক ভাবেই জন্মায়। খেজুর থেকে গুড় উৎপাদন করা হয় এবং খেজুরের গুড় স্বাদে গন্ধে জনপ্রিয়। ১৯৮১-৮২ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে প্রায় ১০.৮ হাজার হেক্টর জমিতে ৩.৮ লক্ষ টন খেজুর রস উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে খেজুর গুড় উৎপাদকারী জেলাগুলোর মধ্যে কুষ্টিয়া, যশোহর ,রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল উল্লেখযোগ্য। শীতের প্রথম দিকে এ সকল অঞ্চলে খেজুরের রস একটি উপাদেয় পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তাল থেকেও কিছু পরিমাণ চিনি এদেশে তৈরি হয়। তবে তাল থেকে এখানে 'তাড়ি' নামক একটি মৃদু নেশাকর পানীয়ই বেশি তৈরি করা হয়। সামান্য কিছু রস দিয়ে তালমিশ্রি (চিনি) করা হয়। খেজুরের তুলনায় তালের আবাদি এলাকা অনেক কম, ২.০ হাজার হেক্টর মাত্র। ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ তাল গাছের পুষ্প মঞ্জুরীতে টেপিং করে রস সংগ্রহ করা হয়। একটি তালগাছ থেকে এক মৌসুমে ৫-১০ মন রস সংগ্রহ করা যায় (কুদ্দুস, ১৯৮৫)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাণিজ্যিক চিনি বলতে কোন্ রাসায়নিক উপাদানটি বুঝানো হয় ?

(ক) গ্লুকোজ (খ) ফ্রুক্টোজ

(গ) সরবিটোল (ঘ) সুক্রোজ।

২। পৃথিবীর প্রধানতম চিনি ফসল কোন্‌টি?

(ক) বীট (খ) খেজুর

(গ) আখ (ঘ) ভুট্টা।

৩। নিচের কোন্ ফসলের ফুল থেকে চিনি সংগৃহীত হয়?

(ক) আখ (খ) তাল

(গ) গাজর (ঘ) সাগো।

৪। প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো চিনি ফসল কোন্‌টি?

(ক) আখ (খ) বীট

(গ) তাল (ঘ) ভুট্টা।

৫। খেজুর থেকে যে চিনি তৈরি হয় তাকে কী বলে?

(ক) চিনি (খ) গুড়

(গ) মিশ্রি (ঘ) মধু ।

পাঠ ৭.২ আখের পরিচিতি ও গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের আখ ফসলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আখের প্রজাতি, শ্রেনী বিন্যাস এবং বাংলাদেশে অনুমোদিত জাতগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আখের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের পরেই আখের স্থান। তবে এদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চাষীদের কাছে আখ হচ্ছে প্রধান অর্থকরী ফসল। প্রতি বছর এদেশে যে পরিমাণ আখ উৎপন্ন হয় সেটি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ১৯৯২-৯৩ সালে বাংলাদেশে আখ চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল ৪,৫৬,০০০ একর এবং উৎপাদন ছিল ৭৫,০৭,০০০ টন (বি.বি.এস., ১৯৯৪)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সুপারিশ অনুসারে জন প্রতি সুস্থ মানুষের বার্ষিক কমপক্ষে ১৩ কেজি চিনি বা ১৭ কেজি গুড়ের দরকার। অথচ এদেশে মাথাপিছু চিনি ও গুড়ের মোট লভ্যতা ৬ কেজিরও কম (এফ. এ. ও., ১৯৯০)। তাই চিনি/গুড়ের ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রতি বছর ১.৫-১.৭ লক্ষ টন চিনি আমদানি করতে হয়। সুতরাং গুড় এবং চিনিতে স্বয়ংসম্ফর্ণতা অর্জনের জন্য নুতন নুতন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আখের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কেননা, এদেশে হেক্টর প্রতি আখের গড় ফলন ৪২ টন এবং চিনি আহরণের শতকরা হার মাত্র ৮.০ ভাগ, যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন (আলী ও সহযোগীবৃন্দ, ১৯৮৯)। জাভায় আখের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮৯ টন এবং হাওয়াইয়ে ১৬০ টন। অথচ বিশেষজ্ঞগনের মতে বাংলাদেশে আবহাওয়া ও মাটি আখ চাষের জন্য খুবই উপযোগী (ইউয়ার্ট, ১৯৬৫)। কাজেই আখের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আখ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে।

আখের উৎপত্তি ও বিস্তার

আখের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। Barber (১৯৩১) এর মতে ভারতের উত্তরাঞ্চলে কাশ (*Saccharum spontaneum*) এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদ থেকে *S. sinensis* এবং *S. barberi* এর উদ্ভব হয়েছে যা একত্রে ভারতীয় আখ নামে পরিচিত। Brandes (১৯৫৬) এর মতে আদর্শ আখ (*S. officinarum*) এর উৎপত্তিস্থল হলো নিউগিনি, যেখানে অতি প্রাচীনকাল থেকেই লম্বা মোটা আখ জন্মে থাকে। আখ গ্রীস্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফসল বলে আখের চাষাবাদ পৃথিবীর ৩৫° উত্তর থেকে ৩৫° দক্ষিন অক্ষাংশ এলাকার আশে পাশে কেন্দ্রিভূত। বর্তমানে পৃথিবীর আখ উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ভারত, কিউবা, ব্রাজিল,মেক্সিকো, পাকিস্তান, চায়না, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, এবং অস্ট্রেলিয়া।

> আখ গ্রীস্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফসল বলে আখের চাষাবাদ পৃথিবীর ৩৫° উত্তর থেকে ৩৫° দক্ষিন অক্ষাংশ এলাকার আশে পাশে কেন্দ্রিভূত।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি ও শ্রেনিবিন্যাস

> আখ 'গ্রামিনী' পরিবারের অনার্তভূক্ত গাছ। এর দন্ডাকৃতি কান্ড (Culm) প্রায় ৯.৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। সাধারণ আখ কান্ড উচ্চতায় ১.৮৫-৩.৭২ মিটার হয় (কুদ্দুস, ১৯৮৫)।

আখ 'গ্রামিনী' পরিবারের অর্ন্তভূক্ত গাছ। এর দন্ডাকৃতি কান্ড (Culm) প্রায় ৯.৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। সাধারণ আখ কান্ড উচ্চতায় ১.৮৫-৩.৭২ মিটার হয় (কুদ্দুস, ১৯৮৫)। কান্ডটি গোলাকার গীটযুক্ত, সুস্পষ্ট পর্বসন্ধি (Node) এবং পর্ব (Internode) এর সমন্বয়ে গঠিত। ম ল গুচ্ছাকৃতি, চারিদিকে ছড়ানো এবং অধিকাংশই ২৫-৩০ সেমি মাটির গভীরে প্রবেশ করে। পাতা ঘাসের মত, তরবারি আকৃতি, একান্ত রভাবে দুই সারিতে সাজানো, শুয়া (cilia) থাকে এবং পত্রখোল কচি অবস্থায় কান্ডকে বেষ্টন করে রাখে। কোন কোন আখের জাতে ফুল হয়। পুস্পমুঞ্জুরীকে অৎৎড়ি বলে, যা সাদা কাশ ফুলের ন্যায়। প্রায় ৩০ সেমি বা তার চেয়েও লম্বা। বীজ কেরিওপ্সিস্ জাতীয়, কচি অবস্থায় সাদা এবং পরিপক্ক হলে বাদামি রং এর হয়।

আখের জেনাস হচ্ছে *Saccharum*, যার অনেকগুলো প্রজাতি থাকলেও নিম্নলিখিত ৩টি আবাদযোগ্য প্রজাতির অন্যতমঃ

(ক) *S. officinarum*- মোটা, রসালো এবং ত্বক (Rind) কোমল বিধায় চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী। এই প্রজাতির আখের মধ্যে চিনির পরিমান বেশি এবং আঁশের পরিমান কম। এটি Smut রোগ প্রতিরোধী তবে লালপচা (Red rot) এবং মোজাইক রোগের প্রতি সংবেদনশীল। ট্রপিক্যাল অঞ্চলে এদের চাষ সীমাবদ্ধ।

(খ) *S. sinensis*- এই প্রজাতির আখ চিকন, লম্বা এবং চওড়া পাতাবিশিষ্ট। এতে চিনির পরিমাণ মাঝারি থেকে কম। এই আখ তাড়াতাড়ি পরিপক্কতা লাভ করে। এদের Internode গুলো বেশ লম্বা আঁকাবাঁকা প্রকৃতির এবং ঘড়ফব গুলো বেশ স্পষ্ট।

(গ) *S. barberi*- শীত প্রধান দেশের উপযোগী এই আখের কান্ড ছোট ও চিকন এবং পাতা অপেক্ষাকৃত সরু। চিনির পরিমাণ মাঝারি থেকে কম। এই আখে ছোবড়ার পরিমান বেশি তবে এটি তাড়াতাড়ি পরিপকতা লাভ করে।

আখের জাত

ঈযবরিহম ঃুঢ়ব এর মধ্যে অন্ততঃ চারটি গুরুত্বপূর্ণ জাত এদেশের প্রচলিত আছে। সেগুলো হচ্ছে (১) ঢাকাই গ্যান্ডারী, (২) টেনারা, (৩) কাজলা এবং (৪) সুন্দরী।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে আখের চাষ হয়ে আসছে বিধায় এদেশের চাষীদের হাতে অনেকগুলো আখের জাত আছে। আখের এই জাতগুলোকে (ক) Chewing type এবং (খ) Commercial type হিসেবে প্রাথমিকভাবে ভাগ করা যায়। Chewing type এর মধ্যে অন্ততঃ চারটি গুরুত্বপূর্ণ জাত এদেশের প্রচলিত আছে। সেগুলো হচ্ছে (১) ঢাকাই গ্যান্ডারী, (২) টেনারা, (৩) কাজলা এবং (৪) সুন্দরী।

ব্যাপকভাবে আখ চাষের জন্য Commercial জাতগুলো ব্যবহৃত হয়। এই টাইপগুলো দুটি উৎস হতে এসেছে- (ক) আঞ্চলিক (Local) ও (খ) বিদেশী (Exotic)। অনেকগুলো আঞ্চলিক জাত কৃষকদের হাতে আছে , যদিও সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। লাল জাভা সি এবং নগরবাড়ী এই আখজাত দুটো উত্তরাঞ্চলে মিল এলাকায় আখ চাষীদের মাঝে বেশ সমাদৃত।

বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত Exotic আখগুলোর কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, ভারত বিভক্তির পূর্বে ঢাকাতে Coimbatore Breeding Station এর একটি Sub-station ছিল। সেই হিসেবে ঢাকাতে বেশ কিছু Coimbatore (CO) আখজাত আসে, যার অনেকগুলোই এখনও বাংলাদেশে চাষের জন্য অনুমোদিত আছে। যেমন-

CO 975	CO997	CO527
CO 1148	CO421	CO617
CO 1158	CO419	CO636

এছাড়াও, ভারত বিভক্তির পূর্বে কিছু জাত আসে Bihar-Orrissa (BO), Quinsland (Q), Pro-ost-Java (POJ), Ges Canal point (CP) থেকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো Q-69, BO-3, BO-17, BO-70, BO-71 ইত্যাদি।

অতঃপর ঈশ্বরদিতে বাংলাদেশ সুগারকেন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত (১৯৭৩) হবার পর এখানকার বিজ্ঞানীগন আখের নুতন নুতন জাত উদ্ভাবনসহ আখচাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এখান থেকে উদ্ভাবিত জাতগুলো সাধারণত ISD-, ঈশ্বরদি-, C- ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই জাতগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এগুলো বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক চাষের জন্য, বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এবং অধিক ফলন ও অধিক হারে চিনি আহরণের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। ঈশ্বরদি আখ গবেষনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ ISD-1/53, ISD-2/54, ISD-5/55, ISD-9/57, ISD-16, ISD-17, ISD-18, ISD-19, ISD-20, ISD-21, লতারি জবা সি, ভি, এস- ৯৬ ইত্যাদি।

আখের গুরুত্ব

আখ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথকরী ফসল। খরা ও বন্যাসহিষ্ণু বিধায় বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর চাষ কম ঝুঁকিপূর্ণ। দেশের উত্তরাঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকায় চাষীদের কাছে আখই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস। দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনের উৎসই হচ্ছে আখ। এর ওপর ভিত্তি করেই দেশে চিনিকল ও চিনিশিল্প গড়ে উঠেছে। ফলতঃ আখচাষ ও চিনি শিল্পে এদেশে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। চিনিকলে আখ মাড়াই এর পর বাই-প্রোডাক্ট (উপজাত) হিসেবে যে ব্যাগাস (bagasse) পাওয়া যায় তা থেকে কাগজ ও ঝোলাগুড় তৈরি হয়। ঝোলাগুড় স্প্রিরিট ও এ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চিনি কলের প্রেস মাড (গাদ) একটি উত্তম জৈবসার। কুড়িটির বেশি শিল্পে পন্য আখের উপজাতদ্রব্য থেকে পাওয়া যায় (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)। আখের সবুজ পাতা গোখাদ্য এবং শুকনো পাতা জ্বালানি ও কুড়ে ঘরে ছাউনী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আখ চাষের আর একটি উলে-খযোগ্য দিক হচ্ছে আখ চাষের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে সাথী ফসল হিসেবে অন্তত প্রায় ডজন খানেক শীত-কালীন ফসলের যে কোন একটি লাভ জনক ভাবে চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

আখ চাষের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আখ চাষের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে সাথী ফসল হিসেবে অন্তত প্রায় ডজন খানেক শীত-কালীন ফসলের যে কোন একটি লাভ জনক ভাবে চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

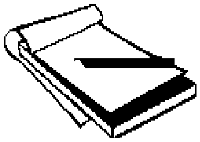

অনুশীলন (Activity): *আখের Chewing type এবং Commercial type -এর জাতগুলোর পরিচিতি দিন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অর্থকরী ফসল হিসেবে বাংলাদেশে আখের স্থান কোথায়?

(ক) ২য়	(খ) ৩ য়
(গ) ১ম	(ঘ) ৪র্থ।

২। বাংলাদেশে আখের হেক্টর প্রতি গড় ফলন কত?

(ক) ৩২ টন	(খ) ৪২ টন
(গ) ৬২ টন	(ঘ) ৮২ টন।

৩। আখের উৎপত্তিস্থল কোন্ দুটি দেশের সাথে জড়িত?

(ক) ভারত-পাকিস্তান	(খ) ভারত-বাংলাদেশ
(গ) ভারত- আমেরিকা	(ঘ) ভারত- নিউগিনি।

৪। নিম্নলিখিত কোন্ আখটি ট্রপিক্যাল অঞ্চলে চাষ করা হয়?

(ক) *S. sinensis*	(খ) *S. officinarum*
(গ) *S. robusta*	(ঘ) *S. barberi*

৫। নিম্নলিখিত আখের জাতগুলোর মধ্যে কোন্টি ঈযবরিহম ঃঁঢ়ব এর অন্তর্ভূক্ত?

(ক) লাল জাভা সি	(খ) BO-3
(গ) C- 16	(ঘ) কাজলা।

পাঠ ৭.৩ আখ চাষের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, আখ রোপনের সময় নির্ধারন

এ পাঠে শেষে আপনি

- আখ চাষের জন্য যথাযথ জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- আখ চাষের জন্য জমি তৈরি করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আখ রোপনের সময় উলে-খ করতে করবেন।

যে কোন ফসল চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জমি তৈরি ও রোপনের সময় কৃষিতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আখ চাষের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম নেই। আখ গুচ্ছমন্ডলী হলেও গভীরমন্ডলী ফসল এবং মাঠ ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফলন দান করে থাকে। সে কারনে সাধারণাবেই বলা যায় আখফসল মাটি থেকে প্রচুর রস ও খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। আবার আখ খরা সহিষ্ণু হলেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা। সুতরাং আখের জন্য মাটি নির্বাচন ও জমি তৈরি করার সময় এ সব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্য দিকে, রোপন সময় আখের ফলনের ও চিনি আহরণের শতকরা হারের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

জমি নির্বাচন

বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫০ সেমি এর চেয়ে অধিক বিধায় সন্তোষজনক। তবে আখ অতি বৃষ্টিপাত, বিশেষ করে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫০ সেমি এর চেয়ে অধিক বিধায় সন্তোষজনক। তবে আখ অতি বৃষ্টিপাত, বিশেষ করে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বৃষ্টি বা বন্যার পানি এক মাসের বেশি দাঁড়িয়ে থাকে এমন জমি আখচাষের উপযোগী নয়। উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি যেখানে বন্যার বা বৃষ্টির পানি দ্রুত নেমে যায় এমন জমি আখ চাষের উপযোগী। কিছু কিছু চর বা নিচু এলাকায় বন্যায় পানি দাঁড়িয়ে থাকে না তবে প্রবাহমান থাকে, সেখানে আখ চাষ করা সম্ভব হলেও আখের ক্ষেতে লাল পাতা ও উইল্‌ট রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। আখের জন্য সাধারণত ভারী মাটি (heavy soil) নির্বাচন করা হয়। দোআঁশ থেকে এঁটেল- দোআঁশ মাটিতে অত্যন্ত সফলভাবে আখ চাষ করা যায়। কেবলমাত্র বেলে মাটি ছাড়া আর সব মাটিতেই আখ চাষ সম্ভব। তবে হালকা মাটি (light soils)-তে আখের চাষ করলে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ সংযোগ করার প্রয়োজন পড়ে। জমি নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিটি সমান (levelled) থাকে এবং একদিকে সামান্য ঢালু (elevated) হলে ভাল হয়। নদীর তীরবর্তী সুনিষ্কাশিত পলিপড়া জমিতে আখের ফলন অত্যন্ত ভাল হয়। মাটির পি এইচ ৬.০-৮.০ এর মধ্যে থাকা দরকার। বাংলাদেশের গাঙ্গেয় পলিবাহিত মাটি আখ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

জমি তৈরি

আখের শিকড় ২৫-৩০ সেমি মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং প্রচুর রস ও খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় শিকড় পার্শ্বে অবাধ বিস্তার লাভ করে। তাই আখের জমিতে গভীরভাবে চাষ এবং উত্তম কর্ষণ প্রয়োজন।

আখের শিকড় ২৫-৩০ সেমি মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং প্রচুর রস ও খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় শিকড় পার্শ্বে অবাধ বিস্তার লাভ করে। তাই আখের জমিতে গভীরভাবে চাষ এবং উত্তম কর্ষণ প্রয়োজন।

উত্তম কর্ষণের জন্য জমি তৈরির সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থায়ই ভিজা জমি চাষ করা উচিত নয়। জমিতে 'জো' আসলে চাষ শুরু করা বাঞ্চনীয়। আখের জমি কমপক্ষে ২০ সেমি গভীরতা পর্যন্ত চাষ করা প্রয়োজন যা দেশী লাঙ্গল দিয়ে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে জমি চাষ করা যেতে পারে (রহমান ও সাত্তার ১৯৯১)ঃ

* দেশী লাঙ্গল দিয়েঃ বাংলাদেশের প্রচলিত পদ্ধতি, তবে চাষের গভীরতা যথাযথ হয় না।
* কোদালের সাহায্যেঃ ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। লাঙ্গল চাষের পর প্রয়োজনীয় পরিখা তৈরি (Trench making)- করা যায়।
* মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল দিয়েঃ পশু চালিত উন্নত এ লাঙ্গল দিয়ে প্রায় ২০ সেমি গভীরতায় চাষ সম্ভব।

*   ট্রাক্টর লাঙ্গল দিয়েঃ যথাযথ গভীরতায় চাষ (৩০ সেমি পর্যন্ত) সম্ভব। বিশেষ করে বড় মাপের জমির জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

বাংলাদেশে তিনটি পদ্ধতিতে আখ লাগানো (Planting) হয় - ১। সমতল জমির উপর বীচন লাগানো (Flat method of planting) ২। নালায় বীচন লাগানো (Furrow method of planting) এবং ৩। গভীর নালায় বীচন লাগানো (Trench method of planting)। কিন্তু যে পদ্ধতিতেই আখের চাষ করা হোক না কেন প্রাথমিক পর্যায়ের জমি প্রস্তুতি পর্ব একই মানের। জমির কর্ষিত অবস্থা হওয়া উচিত ছোট ছোট ঢিল ও গুঁড়া মাটির সংমিশ্রন। ঢিলগুলোর ব্যাস ৩ সেমি এর বেশি হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ক'টি চাষ দেওয়া প্রয়োজন তা নির্ভর করে মাটির ধরন, চাষের সময় মাটিতে রসের পরিমান ও আবহাওয়ার উপর (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)। বেলে দো-আঁশ মাটিতে দো-আঁশ মাটির চেয়ে চাষ কম লাগে। একটি আদর্শ জমি তৈরির জন্য ৫/৬ টি চাষ মই (গরু লাঙ্গল দিয়ে) প্রয়োজন হয়। চিনিকল সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাক্টর দ্বারা চাষ দিলে বেলে দো-আঁশ জমির জন্য ১টি চাষ (Mould board ploughing) ও ১টি মই (harrowing) এবং এটেল দো-আঁশ মাটির জন্য ১টি চাষ ও ২টি মইয়ের প্রয়োজন।

আখের রোপনের সময় নির্ধারণ

আখ উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের ফসল বিধায় মোটামুটি উষ্ণ আবহাওয়া আখ চাষের উপযোগী। গাছের পরিপক্কতার জন্য বেশ কিছুটা তাপ এককের প্রয়োজন হয়। ফলে দেখা যায় শীত প্রধান অঞ্চলে আখ পরিপক্ক হতে দীর্ঘ সময় নেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাপমাত্রার সাথে আখের বৃদ্ধির সম্পর্ক নিচে দেখানো হল (শামসুদ্দিন, ১৯৮৯)ঃ

52°dv	65°dv	68°dv	78°dv	88°dv
।	।	।	।	।
চোখের ক্ষতি	বৃদ্ধি	বৃদ্ধি	সুষ্ঠু	বৃদ্ধি
(sub injury)	বন্ধ	শুরু	বৃদ্ধি	বন্ধ

পৌষ মাস (১৫ ডিসেম্বর- ১৫ জানুয়ারী) ব্যতীত বাংলাদেশে অক্টোবর থেকে ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে আখের চারা রোপন (Planting of sett) করা যায়।

তাপমাত্রা ও আখের বৃদ্ধির উপরোক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌষ মাস (১৫ ডিসেম্বর- ১৫ জানুয়ারী) ব্যতীত বাংলাদেশে অক্টোবর থেকে ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে আখের চারা রোপন (Planting of sett) করা যায়। পৌষের প্রচন্ড শীতে আখ রোপন করলে বীচনের চোখের ক্ষতি (Bud injury) হয়, আখ প্রায়শঃ গজায় না এবং বৃদ্ধি ব্যহত হয়। আখের এই দীর্ঘ রোপন সময় থাকলেও আগাম মৌসুমে রোপনের অংকুরোদগম হার, অঙ্গজ বৃদ্ধি , ফলন ও চিনি আহরণের শতকরা হার ইত্যাদি সবকিছু ভাল হয়। এছাড়াও আগাম আখ ফসলের সাথে শীতকালীন বিভিন্ন ফসল সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষনা ইনষ্টিটিউট যে রোপা আখ চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে তাতে দেখা যায় যে, এক চোখ বিশিষ্ট বেড চারা উৎপাদনের প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস। ব্যাগ চারা (Polybag setling) উৎপাদনের সর্বোকৃষ্ট সময় আগষ্ট-সেপ্টেম্বর। এবং চারা লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। মাঠ ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফলন দেয় কোন্ ফসলটি?

(ক) আখ (খ) পাট

(গ) ধান (ঘ) গম

২। আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সমবন্টিত গড় বৃষ্টিপাত কত?

(ক) ১২০ সেমি (খ) ১৫০ সেমি

(গ) ১০০সেমি (ঘ) ২০০ সেমি।

৩। আখের জন্য কোন্ pH রেঞ্জ ভাল ?

(ক) ৪.০-৫.০ (খ) ৬.০-৮.০

(গ) ৭.০-৯.০ (ঘ) ৩.০-৫.০ ।

৪। আখ চাষের জন্য কী ধরনের কর্ষণ উপযোগী?

(ক) মধ্যম কর্ষণ ও গভীর কর্ষণ (খ) হাল্কা কর্ষণ ও গভীর কর্ষণ

(গ) উত্তম কর্ষণ ও মধ্যম গভীর কর্ষণ (ঘ) উত্তম কর্ষণ ও গভীর কর্ষণ ।

৫। আখের ব্যাগ চারা মূল জমিতে লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট সময় কখন?

(ক) মধ্য অক্টোবর- মধ্য ডিসেম্বর (খ) মধ্য ডিসেম্বর - মধ্য জানুয়ারী

(গ) মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য ডিসেম্বর (ঘ) মধ্য নভেম্বর - মধ্য ডিসেম্বর।

পাঠ ৭.৪ আখের জন্য সার প্রয়োগ এবং অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমান উল্লেখ করতে পারবেন।
- জমিতে কখন ও কীভাবে সার দিতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আখ চাষের অন্তর্বর্তী পরিচর্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আখ মাটি থেকে অধিক মাত্রায় খাদ্যোপাদান শোষনকারী একটি ফসল। Singh (১৯৮৯) এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, হেক্টর প্রতি ৮০ টন আখ উৎপাদনের জন্য মাটি থেকে প্রায় ৯০-১১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮০ ৩০০ কেজি ফসফরিক অ্যাসিড, ৬০-১৮০ কেজি পটাশ এবং ৮০-৯০ কেজি ক্যালসিয়াম অপসারিত হয়ে থাকে। এই তথ্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য আখের জমিতে সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়। আবার সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হলেও অন্যান্য অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা যদি যথাযথভাবে করা না হয়, তাহলেও আখের ফলন ও চিনি আহরণের শতকরা হার দুটোই মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। কাজেই, সাফল্যজনকভাবে আখ উৎপাদনের জন্যে আখের জমিতে সার প্রয়োগ এবং তার অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন।

সারের মাত্রা

বাংলাদেশের সয়েল ফার্টিলিটি সার্ভের কৃষি রসায়নবিদগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ দেশে আখের জন্য একর প্রতি ১০০-৬০-৪০ সের $N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে (শামসুদ্দিন, ১৯৮৯)। তবে তার প্রায় ৫০% দিতে হবে জৈবসার থেকে যেমন পচা গোবর/কম্পোস্ট এবং খৈল থেকে। বাকি অর্ধেক রাসায়নিক সার থেকে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

নিম্নে এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আখ চাষের জন্য সারের সুপারিশ প্রদান করা হলো (শামসুদ্দিন, ১৯৮৯)ঃ

টেবিল ৭.৪ কঃ সয়েল ফার্টিলিটি সার্ভের সুপারিশ অনুযায়ী আখচাষে সারের মাত্রা

ক্রমিক নং	সার	খাদ্যোপাদান (সের/একর)		
		ঘ	চ২ঙ৫	ক২ঙ
(ক)	গোবর মন/একর (০.৩৫-০.২৫-০.১৫%$N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$)	২৮	২০	১২
(খ)	সরিষার খৈল (৫.৫-২.৫-১.৫% $N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$)	২২	১০	০৬
(গ)	ইউরিয়া- ১ মন ১৪ সের	৫০	-	-
*(ঘ)	টি এস পি- ৩২ সের	-	৩০	-
(ঙ)	এম পি- ২০ সের	-	-	২২
	মোট সার (সের/একর)	১০০ -	৬০ -	৪০

* হাড়ের গুঁড়া (bone meal) পাওয়া গেলে ব্যবহার করা ভাল, তবে সেই অনুযায়ী টিএসপি সারের মাত্রা কম লাগবে।

ইউরিয়া ব্যতীত আর সব জৈব-অজৈব সার বীচন লাগানোর আগে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করতে হবে। বীচন লাগানোর ২ সপ্তাহ পর ১/৩ অংশ ইউরিয়া দিতে হবে এবং ইউরিয়া সারের বাকি অংশ সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরিয়া ব্যতীত আর সব জৈব-অজৈব সার বীচন লাগানোর আগে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করতে হবে। বীচন লাগানোর ২ সপ্তাহ পর ১/৩ অংশ ইউরিয়া দিতে হবে এবং ইউরিয়া সারের বাকি অংশ সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা কাউন্সিল ও কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর (১৯৯১) আখ চাষে প্রায় ৫ প্রকার রাসায়নিক সার যথা ইউরিয়া, টিএসপি,এমপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। তারা প্রচলিত পদ্ধতি ও রোপা আখ চাষ পদ্ধতির মাঝে সার প্রয়োগের মাত্রার সামান্যই

তারতম্য দেখিয়েছেন। অঞ্চল ভিত্তিক তাদের এই সারের অনুমোদিত মাত্রা নিুরূপ (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)ঃ

টেবিল ৭.৪ খঃ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (১৯৯১) কর্তৃক আখচাষে সুপারিশকৃত সারের মাত্রা

মৃত্তিকা অঞ্চল	ইক্ষু উৎপাদন এলাকাসম হ	একর প্রতি সারের পরিমান (কেজি)				
		ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
১। পুরাতন হিমালয় এলাকার সমভূমি অঞ্চল	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা	১১২-১৫০	১১২	১৫০	৭৫	-
২। তিস্তা, যমুনা ও ব্রক্ষপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল	বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জ ।	১১২-১৫০	৭৫	১১২	৭৫	-
৩। বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকার লালমাটি অঞ্চল।	বগুড়া, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার অংশ বিশেষ।	১১২-১৫০	১১২	১১২	৭৫	-
৪। গংগাবিধৌত সমভূমি অঞ্চল ।	বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোহর, পাবনা এবং ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ।	১১২-১৫০	১১২	১১২	-	১৪

* ইউরিয়ার দুটি মাত্রার মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য ১১২ কেজি এবং রোপা আখ চাষের জন্য ১৫০ কেজি ব্যবহার করতে হবে। নাবি আখের ক্ষেতে ১১২ কেজি মাত্র ইউরিয়া দিতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতির বেলায় $^{১}/_{২}$ ইউরিয়া, $^{১}/_{২}$ এমপি এবং সমস্ত টিএসপি সার বীচন লাগানোর সময় নালায় প্রয়োগ করতে হবে। বীচন লাগানোর আগে রোপনের জন্য তৈরি নালায় সারগুলো একত্রে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং হালকা করে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট জমি তৈরির শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে দুই কিস্তিতে কুশী বের হওয়াকালীন সময়ে (আখ লাগানোর ৪ মাসের মধ্যে) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপা আখ চাষের বেলায় জিপসাম ও জিংক সালফেট আগের মত জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত টিএসপি এবং $^{১}/_{৩}$ এমপি সার চারা রোপনের পূর্বে নালার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপনের দুই সপ্তাহ পর চারার চারদিকের মাটিতে $^{১}/_{৩}$ ইউরিয়া স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের সময় চারার গোড়ার মাটি নিড়ানী বা খুরপি দিয়ে আলগা করে দিলে ভাল হয়। অবশিষ্ট ২/৩ ইউরিয়া ও এমপি সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে দুই কিস্তিতে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি

প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ৩/৪ টি কুশি বের হলে এবং দ্বিতীয় কিস্তি কুশি গজানের শেষ পর্যায়ে (চৈত্র-বৈশাখ মাসে) প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

বীজ লাগানোর পর থেকে ফসল কাটার আগ পর্যন্ত ফসল গাছের যত্ন নেবার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয় সেগুলোকে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা বলে। আখের ক্ষেত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং সময়মত প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা ভাল ফসল তথা উচ্চ ফলনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আখের অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সমূহ নিন্মরূপ ঃ

ক) শুন্যস্থান পূরণ (Gap filling)

জমিতে আখের বীজ/চারা রোপনের পর কোন কোন স্থানে বীজের সন্তোষজনক অংকুরোদগম হয় না অথবা রোপা চারা মারা যায়। কাজেই এ সকল স্থানে সুস্থ সবল চারা রোপন করা আবশ্যক। এ কাজটি চারা রোপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা ভাল। চারাগুলো সমবয়সী এবং একই জাতের হতে হবে। মাটিতে যদি রস না থাকে তা হলে জীবনী সেচ (Live irrigation) দিতে হবে নতুবা বৃষ্টির পর গ্যাপ ফিলিং করতে হবে।

খ) মাটি আলগাকরন

আখের শিকড় মাটির বেশ গভীরে প্রবেশ করে বিধায় গাছ পর্যাপ্ত পরিমানে পানি এবং খাদ্যোপাদান গ্রহন করতে পারে। তাই আখ চাষের জন্য নরম এবং ঝুরঝুরা মাটি প্রয়োজন যার অভ্যন্তরে অনায়াসে বাতাস প্রবেশ ও চলাচল করতে পারে। ভারী বৃষ্টিপাত অথবা সেচের পর জমির উপরিভাবে মাটি বেশ শক্ত হয়ে আখের শিকড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে গাছ পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্যেপাদান নিতে পারে না। তখন স্বাভাবিকভাবেই আখের ফলন অনেক কমে যায়। তাই বৃষ্টি অথবা সেচের পর পর আখের জমিতে মাটি আলগা করে দিতে হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঝুরঝুরে মাটি চারার গোড়ায় পড়ে নালা ভর্তি হয়ে না যায়। চারার গোড়ায় বেশী মাটি চাপা পড়ে গেলে কুশির উৎপাদন কমে যায় এবং বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

গ) আগাছা দমন

আগাছার প্রকোপ অনুসারে আখের জমিতে বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ৩-৪ বার আগাছা দমন করা আবশ্যক এবং আগাছা দমনের উপযুক্ত সময় সাধারণত আগাছার বৃদ্ধি, জমির অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্ধারণ করা ভাল। তবে আখের জমিতে সাধারণত মাটি আলগাকরণ এবং আগাছা দমন একসাথে করা যেতে পারে।

> আখ গাছের গোড়ায় সাধারণত দুবার মাটি তুলে দেওয়া দরকার। প্রথমবার কুশি বের হওয়া শেষ এবং দ্বিতীয়বার প্রথমবারের প্রায় একমাস পর আখের গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

ঘ) আখের গোড়ায় মাটি দেওয়া (Earthing up)

আখ গাছের গোড়ায় সাধারণত দুবার মাটি তুলে দেওয়া দরকার। প্রথমবার কুশি বের হওয়া শেষ এবং দ্বিতীয়বার প্রথমবারের প্রায় একমাস পর আখের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। আখের গোড়ায় মাটি দেবার উদ্দেশ্য হলো-

- ঝড় বাতাস যাতে গাছের ক্ষতি করতে না পারে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুশি যাতে বের হতে না পারে।
- বৃষ্টিপাতের কারণে জমিতে পানি জমে গেলেও যেন আখের গোড়া কিছুটা জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পায়।

ঙ) শুকনা পাতা পরিষ্কারকরণ

আখের পাতা শুকিয়ে যাওয়ার পর তা ঝরে না পড়ে গাছের সাথেই থেকে যায়। যে কারণে আখের শুকনো পাতা পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তপরিচর্যা। কারণ এ শুকনো পাতা যদি গাছে থেকে যায় তা হলে আখ চাষকে বিভিন্ন ভাবে ব্যহত করে। যেমন-

- শুকনো পাতায় আখের বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকামাকড় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে সুস্থ গাছকে আক্রমণ করে।
- পাতার খোল এবং পর্বের সংযোগস্থলে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। ফলে উক্ত পর্ব থেকে নতুন কুঁড়ি অংকুরিত হয় যা আখের চিনির পরিমান কমিয়ে দেয়।
- গাছে শুকনো পাতা থাকলে সে গাছ বাতাসে হেলে পড়ে যাবাার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কাজেই আখ চাষের সময় পাতা শুকিয়ে যাওয়া শুরু হবার পর থেকেই ধারালো কাঁচি দ্বারা এ সমস্ত শুকনা পাতা কেটে পরিষ্করা করা প্রয়োজন।

চ) আখ বেঁধে দেওয়া

আখ চাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গাছকে খাড়া অবস্থায় রাখা কেননা গাছ যদি হেলে পড়ে তাহলে-

- কান্ডের বৃদ্ধি কমে যায়।
- পার্শ্বকুশি গজায়।
- আখের ওজন হ্রাস পায় এবং চিনির পরিমাণ কমে যায়।
- কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ মরে যায়।
- বীজ হিসেবে আখের গুণাগুণ কমে যায়।

কাজেই আখ গাছ যাতে হেলে পড়তে না পারে সেজন্য হেলে পড়ার সম্ভবনা দেখা দেওয়া মাত্রই গাছ বেধে দিতে হবে। এজন্য প্রথমেই প্রতিটি ঝাড় শুকনো ও অর্ধশুকনো আখের পাতা দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বাধতে হবে। পরবর্তীতে পাশাপাশি দুসারির ৩/৪ টি ঝাড় আবার একত্রে বেঁধে দিতে হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আখের ডগাগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে না যায়। আখের গাছ এভাবে পাতা দিয়ে জড়িয়ে দিলে শিয়ালের আক্রমনও কম হয়।

ছ) ঠেস দেওয়া

আখের গাছ বেধে দেওয়া হলেও যে সমস্ত এলাকায় বেশ ঝড় হয় সেখানে গাছ হেলে পড়ে যাবার বেশি সম্ভবনা থাকে। তাই ঐ সমস্ত এলাকায় আখের গাছকে হেলে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে বাঁশের সাহায্যে ঠেস দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) সেচ ও পানি নিকাশ

উত্তম ফলনের জন্য আখের জমিতে সেচ প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। কেননা, আখ হচ্ছে একটি দীর্ঘজীবী ফসল এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো কখনো অনাবৃষ্টির কারণে জমির রস কমে যায়। ফলে আখের বৃদ্ধিসহ পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য কমে যায় । তাই আখের জমিতে বীজ বপন এবং চারার প্রাথমিক বৃদ্ধিকালীন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সময়ে যদি জমিতে রস শুকিয়ে যায় তা হলে সময়মত সেচ দিতে হবে ।

পক্ষান্তরে, জলাবদ্ধতায় আখের ফলন এবং চিনির পরিমাণ কমে যায় বলে বর্ষাকালে জমিতে পানি জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সময়মত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। আখ ক্ষেতের ভিতরে ও চারিদিকে গভীর নালা কেটে পানি নিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

> জলাবদ্ধতায় আখের ফলন এবং চিনির পরিমাণ কমে যায় বলে বর্ষাকালে জমিতে পানি জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সময়মত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঞ) রোগ এবং কীটপতংগ দমন

আখে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন- লাল পচা, নেতিয়ে পড়া, ক্লোরোসিস, লাল রেখা ইত্যাদি এবং বিভিন্ন পোকামাকড় যেমন- উইপোকা, ডগার মাজরা পোকা, কান্ডের মাজরা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সময়মত উপযুক্ত পদ্ধতিতে এ সব রোগ এবং পোকা মাকড় দমন করা আবশ্যক।

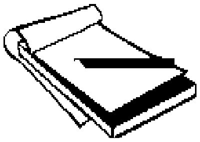

***অনুশীলন (Activity) :** আখ চাষে অন্তর্বর্তী পরিচর্যাসমূহ এবং এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। আখগাছ মাটি থেকে সবচেয়ে বেশি কোন খাদ্যোপদান গ্রহণ করে ?

ক) নাইট্রোজেন খ) ফসফরাস

গ) পটাশ ঘ) সালফার।

২। আখ চাষে নিম্নলিখিত কোন খাদ্যোপাদন সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করতে হয় ?

ক) নাইট্রোজেন খ) ফসফরাস

গ) পটাশ ঘ) সালফার।

৩। নিম্নলিখিত কোন অঞ্চলে জিংক সার ব্যবহার করা প্রয়োজন ?

ক) পুরাতন হিমালয় সমভূমি অঞ্চল খ) গংগাবিধৌত সমভুমি অঞ্চল

গ) তিস্তা-যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রবিধৌত সমভূমি অঞ্চল ঘ) বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকার পলিমাটি অঞ্চল।

৪। আখচাষে নিম্নলিখিত কোন্ সার দুটির উপরি প্রয়োগ করতে হয় ?

ক) ইউরিয়া ও টিএসপি খ) ইউরিয়া ও এমপি

গ) ইউরিয়া ও জিপসাম ঘ) ইউরিয়া ও জিংক সার ।

৫। আখ গাছের শুকনো পাতা নিম্নলিখিত কোন্ কারণের জন্য পরিস্কার করা হয় ?

ক) ক্ষেতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খ) মরা পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য

গ) মরা পাতা গাছ থেকে যাতে খাদ্য না নিতে পারে

ঘ) পর্বের পোড়ায় পানি জমে যে শিকড় সৃষ্টি হতে পারে তা বন্ধের জন্য।

পাঠ ৭.৫ আখ কর্তন ও মাড়াই

এ পাঠ শেষে আপনি

- ◆ আখ কাটার সময়ের সাথে ফলনের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।
- ◆ আখের পরিপক্কতার লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ আখ মাড়াই এর পর কীভাবে চিনি ও গুড় উৎপাদন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আখের ফলন ও তার গুনগত মান সঠিক সময়ে এবং সঠিক ভাবে আখ কাটার উপর নির্ভর করে। কেননা, উপযুক্ত বয়সের পূর্বে আখ কাটা হলে পরিপক্কতা কম থাকার কারণে আখে চিনির পরিমাণ কম হয়। অন্যদিকে, উপযুক্ত বয়সের পরে আখ কাটলে গাছে জমাকৃত চিনি বিয়োজিত হয়ে যায় বলে এতেও চিনির পরিমাণ কমে যায়। আবার আখ মাড়াই পদ্ধতির উপরও চিনি আহরণের হার নির্ভর করে। যেমন- কিউবাতে যেখানে মিলে চিনি আহরণের হার ১৭-১৮%, আমাদের দেশে চিনিকলগুলোতে এ হার মাত্র ৭-৮% (কুদ্দুস, ১৯৯৫), কাজেই এমতবস্থায় আখের উচ্চ ফলন এবং তা থেকে সার্থকভাবে চিনি উৎপাদনের জন্যে আখ কাটা ও মাড়াই সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আখ কর্তন

বাংলাদেশে আখ কাটার মৌসুম বেশ বিস্তীর্ণ—মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে শুর€ হয়ে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চাষীরা চড়াদামে আখ বিক্রয় করার জন্য সেপ্টেম্বরের আগেও কিছু কিছু আখ কাটা শুরু করে। আখ কাটার সময় হয়েছে কিনা তা বাহ্যিকভাবে দেখে তেমন একটা বুঝা যায় না। তবে মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণসমুহ দেখা গেলে বুঝতে হবে যে আখ পরিপক্ক হয়েছে-

- ০ কোন একটি আখ কেটে সমান তিন খন্ডে বিভক্ত করে চিবিয়ে খেতে সব খন্ডই প্রায় সমান মিষ্টি মনে হ'লে।
- ০ গাছের বয়স ১২-১৪ মাস হলে।
- ০ কান্ডের বৃদ্ধি কমে গেলে এবং উপরের দিকের পর্বমধ্য ছোট হয়ে আসলে।
- ০ আখের কান্ডের দু মাথা ধরে বাকালে যদি মাঝখানে মট করে ভেঙে যায়।
- ০ পাতা আকারে ছোট এবং হলুদ হয়ে আসলে।
- ০ আখের কান্ডে ছুরি বা কাস্তে দ্বারা আঘাত করলে যদি ধাতব পদার্থের ন্যায় শব্দ হয়।

> পরিপক্ক আখে কঠিন পদার্থের পরিমান (যা Brix নামে পরিচিত) ২০-২২% এবং সুক্রোজের পরিমাণ কঠিন পদার্থের ৮৫-৯৫% হবে (গাফ্ফার, ১৯৮৯)।

তবে আখে চিনির পরিমাণই আখের পরিপক্কতা এবং আখ কাটার সঠিক সময় নির্ধারণের মাপকাঠি। পরীক্ষাগারে রিফ্রাক্টোমিটার (Refractometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে আখের পরিপক্কতা নির্ধারণ করা যায় । সাধারণত কান্ডের উপরের পরিপক্ক অংশ থেকে রস সংগ্রহ করে উপরোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রসে মোট কঠিন পদার্থের পরিমান নির্ধারণ করা হয়। পরিপক্ক আখে কঠিন পদার্থের পরিমান (যা Brix নামে পরিচিত) ২০-২২% এবং সুক্রোজের পরিমাণ কঠিন পদার্থের ৮৫-৯৫% হবে (গাফ্ফার, ১৯৮৯)।

আখের পরিপক্কতা নির্ধারণ করার পর ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে অথবা সম্ভব হলে মাটির একটু গভীরেই আখের গোড়া কেটে নেওয়া উচিত। কোন সময়েই দা বা হাসুয়া দিয়ে আখ কাটা উচিত নয়। কেননা, এতে আখের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) মাটিতে থেকে যায়।

আখ মাড়াই

আখ কাটার পর মাড়াই যোগ্য আখ থেকে চিনি বা গুড় উৎপাদন করা যায়। চিনি উৎপাদন করার জন্যে আখকে চিনি কলে এবং গুড় উৎপাদন করার জন্যে আখকে হস্ত চালিত/বলদ চালিত/বিদ্যুৎ চালিত মাড়াই কলে মাড়াই করা হয়। আমাদের দেশে উৎপাদিত আখের শতকরা প্রায় ৫০ভাগ গুড়

তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিচে চিনি ও গুড় তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)।

ক) আখ থেকে চিনি তৈরি

চিনি তৈরি করার জন্যে আখ কাটার পর এগুলোকে পাতা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করে চিনিকলে নেওয়া হয় এবং চিনিকলের ঘূর্নায়মান ছুরির মাধ্যমে কেটে ছোট ছোট টুকরায় পরিনত করা হয়। এ টুকরাগুলোকে প্রেষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিষে রস বের করা হয় এবং ছাকনির সাহায্যে রসে বিদ্যমান অপদ্রব্য দূর করা হয়। এ অবস্থায় আখের রস কিছুটা অম্লস্বাদযুক্ত থাকে এবং রসে দ্রবনীয় কিছু অপদ্রব্য থেকে যায় যা দূর করার জন্যে রসের সাথে গন্ধক, চুন ও টিএসপি সার যোগ করা হয়। তারপর সিরাপ টাওয়ারে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা এবং চাপে পরিষ্কার রস তাপ দিয়ে ঘন করা হয় এবং কড়াইতে (Pan) জ্বাল দিয়ে আরো ঘন করা হয়। এর ফলে 'মিসিকিউট' নামক চিনির দানা ও ঝোলা গুড়ের মিশ্রণ পাওয়া যায় যাকে পরবর্তীতে সেন্ট্রিফিউজ করে চিনির দানা আলাদা করে নেওয়া হয়।

খ) আখ থেকে গুড় তৈর

আখের শোধিত বা অশোধিত রস থেকে উৎপাদিত ঘনীভূত তরল বা কঠিন পদার্থই গুড় হিসাবে পরিচিত।

আখের শোধিত বা অশোধিত রস থেকে উৎপাদিত ঘনীভূত তরল বা কঠিন পদার্থই গুড় হিসাবে পরিচিত। গুড়ের গুণগতমান আখের রসের মিশ্রন, রস জ্বাল দেওয়ার পদ্ধতি এবং ব্যবহৃত পরিষ্কারকের ধরনের উপর নির্ভর করে। সাধারণত আখ থেকে গুড় উৎপাদন তিনটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয়-

- রস নিষ্কাশন
- রস ঘনীভূতকরণ
- রস পরিষ্কারকরণ

রস নিষ্কাশন

এর মাধ্যমে মোট রসের শতকরা মাত্র ৪৫-৫০ ভাগ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক তিন রোলার বিশিষ্ট হস্ত বা গরু-মহিষ চালিত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে আখ পিষে রস নিষ্কাশন করে থাকে। এর মাধ্যমে মোট রসের শতকরা মাত্র ৪৫-৫০ ভাগ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। তবে কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যুৎ চালিত মাড়াই কলের সাহায্যেও আখের রস নিষ্কাশন করা হয় যেখানে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ রস নিষ্কাশন করা সম্ভব।

রস পরিষ্কারকরণ

আখ থেকে রস নিষ্কাশন করার পর তা থেকে যতদূর সম্ভব অনাকাংখিত ও অনভিপ্রেত দ্রব্যসমূহ অপসারন করার জন্য এবং রস ফুটানোর সময় অচিনিজাত দ্রব্যসমূহের সমাহার বন্ধ করার জন্য রস পরিষ্কার করা হয়। রস পরিষ্কার করার জন্যে সাধারণত জৈব ও অজৈব ধরনের পরিষ্কারক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জৈব পরিষ্কারকসমুহ যেমন-ঢেঁড়স গাছের কান্ডের নিম্নাংশের সবুজ অংশসহ শিকড় গুঁড়ো পানিতে মিশিয়ে বিজল ও বর্ণহীন পদার্থ (১.২৫ কেজি কান্ড শিকড় চূর্ণ + ২০ লিটার পানি) তৈরি হয় এবং সেটি ফুটন্ত আখের রসের সাথে মিশিয়ে রস পরিষ্কার করা যেতে পারে। এছাড়া, মান্দার ও শিমুল গাছের বাকল পানিতে কচলিয়ে কিংবা রেড়ি ও চীনাবাদামের বীজ গুঁড়া করে পানিতে কচলিয়ে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাও জৈব পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন অজৈব পরিষ্কারক সমূহের মধ্যে চুনের পানি, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, হাইড্রোজ, ফিটকিরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন অজৈব পরিষ্কারক সমূহের মধ্যে চুনের পানি, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, হাইড্রোজ, ফিটকিরি ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। তবে আমাদের দেশে গুড় প্রস্তুত অঞ্চলে সাধারণত হাইড্রোজের ব্যবহার ব্যাপক। এর ব্যবহারে গুড়ের রং উজ্জল হয়। অজৈব ও জৈব

পরিষ্কারসম হের মধ্যে জৈব পরিষ্কারক ভাল হলেও এর প্রাপ্যতা ও খরচের নিরীখে অজৈব পরিষ্কারকসম হ আমাদের দেশে ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

রস ঘনীভূতকরণ

রস পরিষ্কার করার পর এটি কিছুটা অম্লস্বাদ যুক্ত থাকে বলে এতে কিছুটা চুন মিশিয়ে রস নিরপেক্ষ করা হয়। এছাড়া, চুন মিশানোর ফলে আখের রসে দ্রুত তলানী পড়ে বিধায় বর্জ্য পদার্থসম হ সহজেই গাদ হিসাবে পৃথক করা যায়। তারপর রসকে ১১০-১১৫^{O} সে. তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ঘন সিরাপ তৈরি করা হয়। এ অবস্থায় রসের ঝলকানো সিরাপ ফেটে যাওয়া এবং কড়াইয়ে লেগে যাওয়া রোধ করার জন্য সিরাপের সাথে সামান্য নারিকেল তেল মিশানো হয় এবং সিরাপকে ঘন ঘন নাড়তে হয়। ঘনীভূত সিরাপের অবস্থা যদি এমন হয় যে, এটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না, আবার কাঁচের ন্যায় শক্ত দানাও হয় না তখন সিরাপ ভর্তি কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে কাঠের হাতলের সাহায্যে সিরাপকে ঘন ঘন নেড়ে তা ঠান্ডা করতে হয়। ঠান্ডা হওয়ার পর ঘণীভূত এ সিরাপ কাংক্ষিত আকারের মাটির বা কাঠের পাত্রে ঢেলে আরও ঠান্ডা করা হয়। তারপর এটি ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেলে গুড় হিসাবে বাজারজাত করা হয়।

আখ, রস ও গুড়ের অনুপাত মোটামুটি ১০০ঃ৬০ঃ১০।

আখ, রস ও গুড়ের অনুপাত মোটামুটি ১০০ঃ৬০ঃ১০। অর্থাৎ ১০০কেজি আখ থেকে ৬০ লি. রস ও ১০কেজি. গুড় পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাংলাদেশের মিলের চিনি আহরনের শতকরা হার কত ?

(ক) ৫-৬%　　(খ) ১৫-১৮%

(গ) ১২-১৫%　　(ঘ) ৭-%৮।

২। রিফ্র্যাক্টোমিটারের সুক্রোজের কোন্ রিডিংটির সাথে আখ পরিপক্কতার লক্ষণ সামঞ্জস্যপ র্ণ থাকতে পারে ?

(ক) ৫০-৬৫%　　(খ) ৭০-৮৫%

(গ) ৪০-৫৫%　　(ঘ) ৮০-৯৫%।

৩। চিনির দানা ও গুড়ের মিশ্রণ থেকে কিভাবে চিনি আলাদা করা হয় ?

(ক) সেন্ট্রিফিউজ করে　　(খ) পরিষ্কারক মিশিয়ে

(গ) প্রেষণ যন্ত্র দিয়ে　　(ঘ) ঘনীভূত করে।

৪। গরু-মহিষ চালিত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে শতকরা কতভাগ রস নিষ্কাশন করা যায় ?

(ক) ৩০-৪০ ভাগ　　(খ) ৪০-৫০ ভাগ

(গ) ৫০-৫৫ ভাগ　　(ঘ) ৬০-৬৫ ভাগ।

৫। নিম্নলিখিত কোন অজৈব পরিষ্কারকটি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) চুনের পানি　　(খ) হাইড্রোজ

(গ) ফিটকিরি　　(ঘ) সোডিয়াম কার্বনেট।

1| চিনি কী? এটি কীভাবে উদ্ভিদ দেহে থাকে তা বুঝিয়ে বলুন।

2| পৃথিবীতে প্রধান দুটি চিনি ফসল কী কী? নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবারসহ ৭ টি চিনি ফসলের উল্লেখ করুন।

3| বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর ওপর একটি সমীক্ষা লিখুন।

4| আখের উৎপত্তিস্থল বর্ননা করুন এবং কোন্ কোন্ দেশে আখ উৎপন্ন হয় লিখুন।

5| আখের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় দিন এবং আখের প্রজাতিগুলোর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

6| বাংলাদেশে প্রচলিত আখের জাতগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

7| বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আখের গুরুত্ব বর্ননা করুন।

8| আখ চাষের জন্য কী ধরনের জমি নির্বাচন করবেন?

9| আখ চাষের জন্য কীভাবে জমি তৈরি করবেন?

10| তাপমাত্রা ও আখের বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক রেখে বাংলাদেশে কখন আখ রোপন করতে হবে?

11| আখের জমিতে সার দেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লিখুন।

12| আখ চাষের জন্য বাংলাদেশ সয়েল ফার্টিলিটি সার্ভের 'ফার্টিলাইজার প্রোগ্রাম' ব্যাখ্যাসহ লিখুন।

13| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী আখচাষে সারের প্রয়োগমাত্রা লিখুন।

14| প্রচলিত পদ্ধতি ও রোপা আখচাষ পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের নিয়মাবলী বুঝিয়ে লিখুন।

15| আখের প্রধান অন্তবর্তী পরিচর্যা কী কী ? ধান বা গম চাষে ব্যবহার হয়না অথচ আখচাষে প্রয়োজন এমন দুটি বিশেষ অন্ বর্তী পরিচর্যা বর্ণনা করুন।

16| আখ পরিপক্ক হবার আগে বা পরে কাটলে কী ক্ষতি হয় ?

17| আখ পরিপক্কতার লক্ষণ কী কী ? এদেশে আখ কাটার মৌসুম কোন্টি এবং কীভাবে আখ কাটা উচিত ?

18| আখ থেকে কীভাবে চিনি তৈরি হয় তা বুঝিয়ে বলুন।

19| আখ থেকে গুড় তৈরির ধাপ কী কী ? ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

20| গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য জৈব ও অজৈব পরিষ্কারকের ব্যবহার বুঝিয়ে বলুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১

১। ঘ ২। গ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। খ

পাঠ ২

১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। ঘ, ৫। খ

পাঠ ৩

১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। গ

পাঠ ৪

১। খ, ২। ক, ৩। খ, ৪। খ, ৫। ঘ,

পাঠ ৫

১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। খ, ৫। খ

এই পাঠ শেষে আপনি

- ◆ কিভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করা হয় তা উলে-খ করতে পরবেন।
- ◆ আখ চাষের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ বীজ আখ সংগ্রহ ও আখ রোপন কিভাবে হাতে-কলমে করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে আখের ফলন ও চিনি আহরনের শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যেসর্ব নিু। আলী এবং তার সহযোগীদের (১৯৮৯) মতে প্রচলিত পদ্ধতিতে যথাযথ অঙ্কুরোদগম না হবার ফলে জমিতে শতকরা ৩১ ভাগ স্থান ফাঁকা (Gap) থেকে যায়। এর ফলে মাড়াই যোগ্য (Millable) আখ কম উৎপাদন হয়

এবং ফলন কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণ এ দেশে আখের ফলন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলো-

- আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ
- আখ চাষে রোপা পদ্ধতি অনুসরণ।

আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ

ভাল অঙ্কুরোদ্গম, গাছের বৃদ্ধি ও উচ্চ ফলন নিশ্চিত করার জন্য সুস্থ, সবল এবং রোগ ও পোকা-মাকড়মুক্ত আখ বীজ ব্যবহার করুন। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো উন্নত পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্টঃ

ক) বীজ আখের চাষ- আখের বীজ নির্বাচনের কাজ বীজ সংগ্রহের প্রায় এক বছর আগেই শুর€ হয়।

যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বীজ চাষ কর€ন, যেখান থেকে পরবর্তীতে আখ বীজ সংগ্রহ করা হয়। এভাবে আবাদকৃত প্রত্যায়িত আখ বীজ ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করাই বিজ্ঞানসম্মত।

খ) প্রি ফার্টিলাইজড্ বীজ আখ - বীজ আখ কাটার ৪-৬ সপ্তাহ আগে বীজ আখের জমিতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫-৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে পারবেন। বীজ আখকে জোরালো ও সতেজ রাখাই এই বাড়তি সার প্রয়োগের কাজ। প্রি ফার্টলাইজড্ বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। চারার শিকড় দ্রুত গজায় এবং চারার বৃদ্ধি জোরালো হয়। সার দেবার আগে মাটিতে যেন রস থাকে সেটি নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে সেচ দিয়ে সার প্রয়োগ করতে পারবেন।

গ) বীজ আখ নির্বাচন- বীজের জন্য আলাদাভাবে উৎপাদিত আখের জমি থেকে আখ বীজ সংগ্রহ

কর€ন। পোকামাকড় ও রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না। বীজ আখ গাছের বয়স ৮-৯ মাস হলে ভাল হয়। গাছের যে অংশে শিকড় থাকে তা বীজের জন্য বাদ দিন। সম্ভব হলে নীচের ১/৩ অংশ বাদ দিয়ে আখ বীজ সংগ্রহ করুন। কারণ, নিচের ১/৩ অংশে চিনির ভাগ বেশি থাকে ও চোখগুলো শক্ত থাকে বলে ভাল গজায় না।

গ) বীচন তৈরি- ক্ষেত হতে আখ কাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। যে 'দা' বা 'হাসুয়া' ব্যবহার করা হবে তাকে আগুনে ঝলসিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিন। উত্তপ্ত দা/হাসুয়ার গায়ে ২/৩ ফোটা পানি

দিলে যদি সাথে সাথে শব্দ করে শুকিয়ে যায় তাহলে অস্ত্র জীবাণুমুক্ত হয়েছে মনে করতে হবে। এছাড়া ৫% 'লাইসল' দ্রবনে দা/হাসুয়া ডুবিয়ে নিয়েও জীবাণুমুক্ত করা যায়।

আখ গাছ যদি বহন করে দুরের জমিতে নিতে হয় তাহলে শুকনো পাতা গাছের গায়ে লেগে থাকা অবস্থায় করুন। এতে আখের চোখ কম নষ্ট হয়। এরপর আখকে একটি উঁচু খুটির উপর রেখে দা/হাসুয়ার সাহায্যে সাজোরে সামান্য কাত করে কাটুন যেম কোন অবস্থাতেই কান্ড থেৎলে বা ফেটে না যায়। এই ছোট ছোট টুকরোই আখের বীচন যা এক/দুই বা তিন চোখবিশিষ্ট হতে পারে। চোখ

বলতে আখের গীট (Node) কে বুঝায়। এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের বেলায় চোখের উপরের দিকে ২.৫ সেমি ও নীচের দিকে ৫-৭.৫ সেমি. কান্ড রেখে কাটুন। বীচন কাটার সময় নজর রাখুন যাতে আখের চোখ উপরে বা পাশে থাকে অর্থাৎ যেন আঘাত না পায়। এছাড়া, আখ গাছটি খন্ড করার সময় তা উপর থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নিচের দিকে কাটুন। এক, দুই ও তিন চোখ বিশিষ্ট কাটা আখের বীচনের ছবি নিচে দেখানো হলো (চিত্র ৭.৬ ক)ঃ

ছবি

ঘ) বীচন শোধন- মাটি বাহিত রোগজীবাণু থেকে আখকে রক্ষা করার জন্য রোপণের আগে বীচনকে শোধন করুন। বীচনগুলোকে ০.১% এরিটান দ্রবনে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিলেই চলে। এছাড়া, টেক্টো বা ব্যাভিষ্টিন নামক ছত্রাক নাশক দ্বারা বীচন শোধন করতে পারবেন।

জমিতে বীজ আখ রোপন

প্রচলিত পদ্ধতি এবং রোপা পদ্ধতি- এই দুই ভাবেই বাংলাদেশে বর্তমানে আখ চাষ করা হয়ে থাকে।

উন্নত হওয়া সত্বেও রোপা পদ্ধতির বিস্ তার আমাদের দেশে এখনো তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। নিম্নে এ পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি (Flat method)
২। ভাওড় পদ্ধতি (Ridge method)
৩। নালা পদ্ধতি (Trench method)

খ) রোপা পদ্ধতি ।

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি- বীজ আখ রোপন করার পরও জমি সমতল দেখায় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা ৫-৬ সেমি নালা তৈরি করা হয়। তারপর নালায় বীজ আখ রোপন করে ৫-৬ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

২। ভাওড় পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে সমতলী পদ্ধতির চেয়ে কিছুটা গভীর নালা (প্রায় ১৫ সেমি) তৈরি করার পর নালায় বীজ আখ স্থাপন করে ৮-১০ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

৩। নালা পদ্ধতি- প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নালা পদ্ধতি উত্তম বলে বর্তমানে বাংলাদেশে নালা পদ্ধতিতে অধিকাংশ কৃষক চাষ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ৩০ সেমি গভীর নালা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে নালার উপরের দিকে প্রায় ৪০ সেমি এবং নিচের দিকে প্রায় ৩০ সেমি চওড়া থাকে। তারপর নালার নিচের দিকে ৫-৭ সেমি.স্থান খুঁড়ে নরম করে বীজ আখ রোপন করা হয় এবং বীজ আখ ৫-৭ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। এক নালার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অন্যটির কেন্দ্রবিন্দু ৯০-১০০ সেমি দুরত্ব হয় (চিত্রঃ ৭.৬ খ)।

খ) রোপা পদ্ধতি

বাংলাদেশে ১৯৬৯ সনে প্রথম রোপা পদ্ধতিতে আখ চাষ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীতে, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট ১৯৭৬ সালে এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে ১৯৭৯ সনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয় যে, নিম্মোক্ত দুটি কারণে বাংলাদেশে রোপা আখের চাষ প্রচলিত আখচাষের চেয়ে বেশি সম্ভবনাময়-

- প্রচলিত আখচাষ পদ্ধতিতে যেখানে একর প্রতি বীজের পরিমাণ ১.৮৭ টন, রোপা পদ্ধতিতে বীজ লাগে মাত্র ০.৪৫ টন।
- প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে রোপা পদ্ধতিতে আখ এবং চিনি উভয় ক্ষেত্রেই ফলন বেশি পাওয়া যায়।

এছাড়া, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ এম শাহজাহান ১৯৮১ সালে উল্লেখ করেন যে, চিনিকল এলাকার ১.৯০ লক্ষ একর জমিতে রোপা আখ চাষ করা হলে ১২.২৫ কোটি টাকা

মূল্যের বীজ আখের আশ্রয় হবে। এই পরিমাণ আখ মিলে সরবরাহ করলে ২৪২০৭ টন অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হবে (Ali *et al*., ১৯৮৯) ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আখ চাষের ক্ষেত্রে রোপা পদ্ধতি বা Spaced Transplanting (STP) একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। নিম্নে এ পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

রোপা আখ চাষকে চারা উৎপাদন পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত দুভাগে ভাগ করা যায়-

১. সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি
২. পলিব্যাগ পদ্ধতি

সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজন মোতাবেক ৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট যে কোন দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরি করতে পারবেন। তবে আন্ত পরিচর্যা ও চলাফেরার সুবিধার্থে ৪ × ২৪ ফুট বীজতলা তৈরি করা ভাল। বীজতলার মাটি ভালভাবে চাষ করে ও কুপিয়ে ঝুরঝুরা করে নিন। বীজতলার মাটিতে ২ মন পচা গোবর/ কম্পোষ্ট, ৮ ছটাক ইউরিয়া, ৮ ছটাক টিএসপি এবং ৪ ছটাক এমপি প্রয়োগ করে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। তারপর দুই চোখ বিশিষ্ট বীজখন্ডের চোখ পাশে রেখে মাটির সমান্তরালে পাশাপাশি স্থাপন করে বীজ খন্ডগুলোকে প্রায় ১ সেমি মাটির স্তর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ খন্ডগুলো সামান্য দেখা যায়। বীজতলাটি খড় অথবা আখের শুকনা পাতা দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষার্থে মাঝে মধ্যে সেচ দিন। এভাবে উৎপন্ন চারা ৪ পাতা বিশিষ্ট হলেই তুলে নিয়ে ম ল জমিতে ৬-৯ ইঞ্চি গভীর নালায় রোপন করে ১-১.৫ ইঞ্চি মাটি দ্বারা ঢেকে দিন (চিত্রঃ ৭.৬ গ)।

পলিব্যাগ পদ্ধতি

পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা না থাকলে পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে রোপা আখ চাষ করা উত্তম। এক্ষেত্রে প্রথমে ৫ × ৪ ইঞ্চি মাপের পলিথিন ব্যাগ নিয়ে ব্যাগের ৩/৪ অংশ ৫০ ভাগ বেলে দোঁআশ মাটি এবং ৫০ ভাগ গোবর বা কম্পোস্ট এর মিশ্রন দিয়ে পুরণ কর€ন। এরপর এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের চোখ উপরের দিকে রেখে খাড়া করে ব্যাগের মাটির মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন কর€ন বীজ খন্ডের অগ্রভাগ ব্যাগের উপর থেকে আধ ইঞ্চি নিচে থাকে। ব্যাগটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে মাটি একটু চেপে দিন। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখুন যেন বীজ খন্ডের অগ্রভাগ মাটির বাইরে বেরিয়ে না থাকে। ব্যাগের নিচের দিকে ১/২ টি ছিদ্র করে দিন যেন বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি ব্যাগে জমে না থাকে।

ব্যাগসম হ আঙ্গিনায় বা সুবিধাযুক্ত অন্য কোথাও সারিবদ্ধভাবে রেখে কিছু খড় বা আখের শুকনা পাতা দ্বারা ঢেকে দিন। উৎপন্ন চারাগুলো চার পাতা বিশিষ্ট হলে এগুলো রোপন উপযোগী হয়। রোপন করার পূর্বেই অর্ধেক অংশ অবশ্যই ছেটে দিন। রোপন করার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে পলিব্যাগগুলো পানি ভর্তি বালতিতে চুবিয়ে নিন। ব্লেডের সাহায্যে পলিব্যাগগুলো কেটে মাটিসহ চারা ব্যাগ থেকে আলাদা করে জমিতে গর্ত করে রোপন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

অ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্নঃ

১। আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করবেন ?

২। নালা পদ্ধতি ও রোপা আখ চাষ পদ্ধতির মধ্যে তূলনাম লক সুবিধা-অসুবিধা কী কী ?

৩। সাধারণ বীজতলা পদ্ধতিতে কিভাবে রোপনের জন্য চারা তৈরি করবেন ?

৪। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে আখের চারা তৈরির বর্ণনা দিন।

আ. বহু নির্বাচনীমূলক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন

১। আখের উচ্চ ফলনের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ বিষয়টি অগ্রগণ্য ?

ক) আখ গাছের উচ্চতা — খ) উৎপন্ন আখের কান্ডের ব্যাস
গ) আখ কাটার সময় — ঘ) হেক্টর প্রতি মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা।

২। বীজের গুণগত মানের জন্য আখ গাছের কোন্ অংশটি বেশি গ্রহনযোগ্য ?

ক) নীচের ১/৩ অংশ — খ) উপরের ১/৩ অংশ
গ) মাঝের ১/৩ অংশ — ঘ) সমগ্র গাছটি।

৩। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে কোন্ ধরনের বীজখন্ড ব্যবহার করা হয় ?

ক) এক চোখ বিশিষ্ট আখখন্ড — খ) দুই চোখ বিশিষ্ট আখখন্ড
গ) তিন চোখ বিশিষ্ট আখখন্ড — ঘ) গোটা আখ গাছখন্ড।

৪। কোন্ পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আখচাষ হয় ?

ক) পলিব্যাগ পদ্ধতি — খ) ভাওড় পদ্ধতি।
গ) নালা পদ্ধতি — ঘ) সমতলী পদ্ধতি

৫। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে উৎপন্ন চারা কখন রোপন উপযোগী হয় ?

ক) চারা ৬ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন হলে — খ) চারা চার পাতাবিশিষ্ট হলে
গ) চারা ১২ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন হলে — ঘ) চারা দুই পাতাবিশিষ্ট হলে।

সঠিক উত্তরঃ আ. ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ